বাংলার বাউল
সুফি সাধনা ও সংগীত

ড. আবদুল ওয়াহাব

রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন • কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
কবিপক্ষ, মে, ১৯৯৯

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪১-৮১২১

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ
প্রথম প্রচ্ছদের ছবি—শ্রীপ্রকাশ কর্মকার,
'প্রতিক্ষণ'-এর শ্রী প্রিয়ব্রত দেবের সৌজন্যে
চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি— শ্রী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়,
শ্রী সমীর সেনগুপ্ত'র সৌজন্যে

প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

মুদ্রণে
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

শামসুজ্জামান খান
বিশিষ্ট পণ্ডিত, ফোকলোরবিদ
পুরোধা সাংস্কৃতিক সংগঠক
বাঙালি জাতীয়তাবাদে চেতনাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব
বঙ্গবন্ধুর চিন্তাদর্শে নিবেদিতপ্রাণ দেশব্রতী
আমার ফোকলোর চিন্তার অন্যতম আদর্শ

এবং

শিল্পী হাশেম খান
বঙ্গবন্ধুপ্রাণ
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীপ্ত
মানবহিতৈষী চিত্রশিল্পী
বাঙালি জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সাধক
আমার প্রিয় মানুষ

ভূমিকা

বাঙলার সুফি বাঙলার বৈষ্ণব ও বাঙলার বাউল এই প্রপঞ্চত্রয় নিয়ে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরিকল্পনা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এ তিনের সংমিশ্রণে-সংশ্লেষে বাঙলা ভাষায় রচিত সংগীতরাজি এবং এইসব সংগীতে প্রতিফলিত/প্রতিবিম্বিত বাঙালির জীবনাদর্শের অনুসন্ধান। এই প্রপঞ্চত্রয়ের প্রণোদনায়-প্ররোচনায় লিখিত হয়েছে হাজার প্রকৃতির লোকগীতি, বাউল-জারি-সারি গান। এছাড়া আধুনিক কবি-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-রাজনৈতিক রূপকারও সুফি-বৈষ্ণব-বাউলের উদারতাজাত প্রেরণা লাভ করেই সামনের কাতারে পা রেখেছেন। বাঙলার সুফি-বৈষ্ণব-বাউলের সমন্বয়ধর্মী সমাজ চেতনা, অহিংসা ও মানবপ্রেম/দেশপ্রেমের পেছনে রয়েছে আমাদের হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ভারতবর্ষের শ্রেয়োচেতনা ও নৈতিকতার উজ্জ্বল দলিল উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত বিশেষ করে গীতা, ভক্তিবাদ, গুরুবাদ, সাংখ্য, চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন, জৈন-বৌদ্ধ ধর্মমত, নাথযোগী এবং বহুরমসধ মানবতন্ত্রী চেতনাজাত সুফি দর্শন। চৈতন্য প্রবর্তিত বাঙলার বৈষ্ণব, এসবের নির্যাসে তৈরি আরোধিক মানবতন্ত্রী চেতনা লালিত বাঙলার বাউল বাঙালির জীবনবাদী দর্শনের অকাট্য নিদর্শন। আমরা ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্যের কথা এখানে আলোচনায় আনতে পারি। কেননা, ষোল শতক এবং উনিশ শতকের বাঙলার যে জাগরণ তাকে দেখতে হবে বা বিবেচনায় নিতে হবে ভারতবর্ষীয় জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে।

আমরা জানি বিশ্ব ইতিহাসে মানবসভ্যতা বিকাশের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা। ভারত সভ্যতার দুটি প্রধান ধারা, একটি আর্যপূর্ব—অপরটি আর্য পরবর্তী। আর্য নামক ভাষাগোষ্ঠীর একদল সশস্ত্র আগন্তুক খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ কিংবা ১৫০০-এর দিকে ধাতুনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরে সদলবলে অনুপ্রবেশ করে। ইতোপূর্বে যেসব আদিবাসী বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে বসবাস করছে

সেসব ট্রাইবাল বা টোটেমিক সমাজ বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক সংহত সমাজ গড়ে তুলেছে এবং স্বনির্ভর গ্রাম সমাজ, গ্রাম সভ্যতা ও নগর সভ্যতার সূচনা করেছে। নৃতত্ত্বের নিরিখে তারাও সুদূর অতীতের আগন্তুক। কেননা ভারতে কোনো আদি মানবের উদ্ভব ঘটেনি বলেই মনে করা হয়। তবে অর্বাচীনকালের আর্য বলে কথিত এই আগন্তুকগোষ্ঠী যে অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত তাদের হাতে ছিল ধাতুনির্মিত অস্ত্র এবং তারা রপ্ত করেছিল অতি দ্রুত চলনশীল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়া এবং এই নিরীহ প্রাণীটির পিঠে চড়েই যুদ্ধ করা। ঠিক যুদ্ধ করা নয় বরং বলা চলে ভয়ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচার-নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর আদিবাসী সমাজের উপর। এভাবে তারা একটি রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনের সূচনা করে এবং তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

আর্যরা নিয়ে এসেছিল সাহিত্যের ভাষা। তারা এই ভাষার মাধ্যমে রচনা করতে থাকল তাদের আকুতি মিনতি, তারা যেসব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার এবং ইতোপূর্বে বসবাসরত আদিবাসীদেরকে করায়ত্ত করার অদম্য বাসনা চরিতার্থ করার মানসে প্রার্থনা হিসেবে রচিত হলো বেদসমূহ। এ প্রার্থনাগুলোর বিষয়বস্তুর মার্মিক অর্থ অদম্য প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করা, ধন-সম্পদ-খ্যাতি-যশ-ক্ষমতা অর্জন এবং ভারতবাসীর কাছ থেকে যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তা অতিক্রম করতে পারার আকুতি। বেদসমূহের ভাষার মর্মবাণীতে নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণের এবং নিজেদের মধ্যে সামাজিক সংহতি ও সাংগঠনিক শক্তিকে জোরদার করার বিষয় ধ্বনিত হয়েছে।

আর্যদের সফলতার আর এক প্রধান কারণ ছিল তাদের ভাষার সাংগঠনিক শক্তি। যেটা তৎকালের ভারতবাসীর ছিল না। বরং তারা ছিল বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত। সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে ভাষার সাংগঠনিক ক্ষমতা অপরিসীম। এর তিনটি প্রমাণ আমাদের একেবারে হাতের কাছে—১. চৌদ্দ শতক থেকে ষোলো শতক অবধি সংগঠিত যে কালপর্বকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উষাকাল বলা হয় ; ২. ব্রিটিশ রাজের চক্রান্তে সংঘটিত ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাজনকে প্রতিহত করা এবং ৩. ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সাথে পূর্ব-বাঙলার মানুষের সশস্ত্র সংগ্রাম। বাংলাদেশে যেসব সংগ্রাম, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার মধ্যমণি ছিল বাঙলাভাষা। এটা বাঙলাভাষার সাংগঠনিক শক্তির প্রমাণ।

এই সমৃদ্ধ বাঙলা ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে বাংলার লোকসংস্কৃতি তথা ফোকলোরের অন্যতম উপাদান বাঙলার লোকসাহিত্যে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন ছড়া, ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন, লোককাহিনী, গল্প-গাঁথা ইত্যাদির মধ্যে বাঙলার লোকগীতিই অধিক সমৃদ্ধ। এক সময় যে বাউল, ভাটিয়ালি, জারি, সারি গানের প্রবল আত্মপ্রকাশ ঘটে তারও মূলে বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের মানবপ্রীতি,

সাংখ্য, যোগ নাথ-তন্ত্র, সুফি-বৈষ্ণব বাউল দর্শনের জীবনমুখী চেতনাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাঙলায় আদিম কৌম সমাজভিত্তিক স্বনির্ভর গ্রামসমাজ ও গ্রাম্য সভ্যতা গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্চলভেদে যে ethnic বা গোষ্ঠীসমাজের বা জাতি বৈচিত্র্যের ভেদ সূচিত হয় সেই কালে জীবনসংগ্রামের বাঙ্ময়তা শিল্পমণ্ডিত রূপে লোকগীতিগুলোর উৎপত্তি ঘটে। আমরা যে আদি-অস্ত্রাল (অস্ট্রিক) বা কোল-মুণ্ডা নৃগোষ্ঠীর মানুষদের বাঙলাভাষী অঞ্চলের আদি বাসিন্দা বলে শনাক্ত করি, তাদেরই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বাংলার বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পণ্ডিতরা স্বীকার করেছেন যে রাঢ়, গৌড়, সুহ্ম, বঙ্গ পুণ্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলবিশেষের নাম জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় থেকে এসেছে। আমাদের লোকগীতিগুলোর উৎপত্তিকাল স্বনির্ভর ও সুসংহত গ্রামসমাজ গড়ে ওঠার সূচনাকাল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও বিপুল বিশাল পুথি সাহিত্য যে জীবন চেতনা নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেও সুফি ও বৈষ্ণব চেতনার ফলপ্রসূ প্রভাব পড়েছিল। আমরা এবার বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিন্যস্ত অধ্যায়গুলোর উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারি।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে বাঙলার সমাজ সংস্কৃতি জনপদ পরিচিতি, ভূ-সীমা, বাঙালির কর্ম-কীর্তি। ঐতরেয় আরণ্যকে বাঙালিদের বয়াংসি বা পাখিজাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে; আবার পুণ্ড্রদের বলা হয়েছে দস্য। বাঙলায় আর্যধর্ম প্রবর্তিত না থাকায় কোনো কারণে বাঙলায় আগমন করলে বৈধায়ধর্মসূত্রে তাকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয়া হয়েছে। এমনকি ঐসব শাস্ত্রে বঙ্গ-সুহ্ম-গৌড়-রাঢ়, শবর-পুলিন্দ প্রভৃতি ট্রাইব বা কোমের লোকজনকে দস্য, ম্লেচ্ছ, পাপ বা অসুর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে এদের ভাষাকে অসুর ভাষা বলা হয়েছে। শাস্ত্রোক্ত এসব বক্তব্য ঘৃণা ও হিংসার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে হয়। এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ভূ-সীমা, রাষ্ট্রকাঠামো ও বাঙালির কর্ম-কীর্তির তথ্য বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুফিবাদ কি এবং বাঙলায় সুফিবাদের বিস্তার নিয়ে সবিশেষ আলোচনা হয়েছে। বাঙলায় সুদীর্ঘকাল থেকে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং গ্রহণ-বর্জন চলেছে। কালে কালে কায়েমি স্বার্থবাদীরা এবং আগ্রাসনকারীরা এদেশের সংস্কৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। অনেক সময় বাঙালি রাজনৈতিক আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হলেও সে তার সংস্কৃতি ও মতাদর্শগতস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। এ জন্যই বাঙালি তার বাঙালিত্বকে এবং বাঙলাভাষাকে বিশ্বের দরবারে ঈর্ষণীয় পর্যায়ে বিকশিত করে চলেছে।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজির লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া বিজয় বাঙলায় সুফিদের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম করে। সুফিবাদের উৎস, বিশ্বব্যাপী সুফি দর্শনের বিস্তার ও বাঙলায় সুফিদের ব্যাপক প্রসারের ঐতিহাসিক ও বস্তুভিত্তি কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। বৌদ্ধ ধর্মের উদারমানবিকতার

কারণে বাঙলার সমাজমন ছিল বৌদ্ধউর্বর। এছাড়া নদীমাতৃকতার কারণে বাঙলার সমাজমানস ছিল পুরোমাত্রায় সমন্বয়ধর্মী। বাঙলায় আগত সুফিরা হিন্দুর যোগ-ভক্তি ও বৌদ্ধসহজিয়ার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসে। ফলে বাঙলায় সুফিরা উত্তর ভারতীয় সুফিদের তুলনায় অধিকতর উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। তারা জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, জঙ্গলাদি পরিষ্কার করে, কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করে। ফলে জবরদস্তি ছাড়াই ব্যাপক ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটে। উদাহরণসহ এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় বাউল মত ও বাউল গান। কেবল বাঙলায় নয় বিশ্বসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বাউল মতের উদ্ভব সর্বমানবতাবাদী ও মাঙ্গলিকতার পরিচয়বাহী। বাউল মত বাঙলার হাজার বছরের সমাজ-সমীক্ষা ও সমন্বিত চিন্ত াদর্শের এক লোকায়ত দর্শন। বাউলরা সাম্যপন্থি এবং মানবতাবাদী। বাউলদের সাধনা গুরুবাদী। কোনো প্রকার জাতিগত, সংস্কারগত, সম্প্রদায়গত অন্ধত্ব নেই তাদের চিন্তাদর্শে। বাউলরা ইহবাদী, সর্বপ্রকার ভাবাবেগ ও কূপমণ্ডূকতার ঊর্ধ্বে। জীবন্ত মানুষের সেবা অর্থাৎ 'মানুষ তত্ত্ব' বাউলদের সাধন-ভজনের প্রধান লক্ষ্য। বাউল মতে নারী-পুরুষ সমানাধিকারী। সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বাউলের প্রচণ্ড ঘৃণা; বাউলের চিন্তাদর্শে প্রস্ফুটিত হয় হিংসা-দ্বেষমুক্ত এক সমন্বিত বিশ্বসমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। বাউলমত উদ্ভবের উৎসসহ বাউল গানের উদ্ধৃতি দিয়ে এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে সুফি-বৈষ্ণব-বাউল চিন্তার প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের সুস্পষ্ট তিনটি ধারা সূচিত হয় : এক. পদাবলী ও জীবনচরিতমূলক সাহিত্য; দুই. পুথি, দোভাষী পুথি, সংস্কৃতি ও হিন্দি ভাষায় রচিত কাব্যসমূহের অনুবাদ, আরবি-ফার্সি রূপকথা ও কাহিনী কাব্যের ভাষান্তর এবং তিন. বাউল, মুর্শিদি, মারফতি, মাইজভাণ্ডারি গান ও উদারমানবতাবাদী আধুনিক সাহিত্য।

পঞ্চম অধ্যায়ে রবীন্দ্র জীবন চিন্তায় বাউল সাধনার প্রভাব বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর অনেক গানেই তিনি বাউল সুর গ্রহণ করেছেন এবং অনেক গানে বাউল শব্দ ও উপমা ব্যবহার করেছেন। নিজেকে তিনি রবি-বাউল নামে পরিচয় দিতে সর্বদা উৎসাহি ছিলেন। বাঙলার বাউল কবিদের সৃষ্টির এক অসাধারণ ঐশ্বর্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। বাঙলার খাঁটি নিজস্ব সম্পদ খুঁজতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর এই মুগ্ধতায় বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় নির্বাচিত কতিপয় লোককবি ও তাঁদের সংগীত। এইসব লোককবি সমাজ নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তা করেছেন নির্বাচিত গানের মধ্যে তার মর্মকথা বিধৃত রয়েছে। এসব কবিরা যে ইহবাদী ও বস্তুবাদী সমাজ চিন্তার পরিপোষক ছিলেন তারই ইংগিত মিলবে নির্বাচিত গানগুলোতে।

আমি যখন পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করি তখন মনে মনে স্থির করেছিলাম যে, সুফি-বাউল ও রবীন্দ্রনাথের বাউল ভাবনা নিয়ে এমন একটি পৃথক বই লিখবো। এ বইয়ের ধারণা এবং বহু উপাদান আমার পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ থেকে চয়ন করা হয়েছে। ইসলামের সর্বাধিক উদারনৈতিক ও মানবিক মতবাদ হচ্ছে সুফিমতবাদ। বাঙলার সমাজ আকাশে এই জীবনবাদী দর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছে আরোধিক মানবতাবাদী চিন্তা জৈন-বৌদ্ধ, সংখ্য-যোগ-তন্ত্র ও নাথতন্ত্র। নদী বিধৌত নদীমাতৃক বাঙলার সমাজ জৈনউর্বব, বৌদ্ধউর্বব, নাথউর্বর, বৈষ্ণবউর্বর নদীমাতৃক বাঙলা সমাজমন সমন্বয়বাদের ক্ষেত্রে অনন্যবৈশিষ্ট্যরঞ্জিত। একথা আমি বারবার নানাভাবে বলার চেষ্টা করেছি। এ বইটিও এ চিন্তারই পরিপূরক বলে আমি মনে করি। তবে অবশ্যই তার বিচারের ভার পাঠকের উপর রইল।

বইটি উৎসর্গ করেছি আমার শিক্ষকতুল্য মনীষী শ্রদ্ধেয় জনাব শামসুজ্জামান খান এবং আমার প্রিয় মানুষ শিল্পী হাশেম খানকে। ১৯৯৫ সালে যখন বাংলাদেশের লোকগীতি এই শিরোনামে আনন্দ সিরিজের জন্য কিশোর উপযোগী একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছি তখন শ্রদ্ধেয় শামসুজ্জামান খান আমাকে পরামর্শ দেন আমি যেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রণীত *লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা আসাম* নামক বইটি অবশ্যই পাঠ করি। আজ বলতে পারি তিনি আমাকে ফোকলোরবিদ্যা পাঠে উদ্দীপনা না জাগালে হয়ত এ জায়গায় পৌঁছাতে পারতাম না। তাঁর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

শিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায়। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও সত্যনিষ্ঠ, শিল্প চেতনাও তিনি একান্তভাবে সমাজবাদী ও মানবমুখী। তাঁর বহু শিল্পকর্মে মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

মনে পড়ে ভারত সরকারের (আই সি সি আর) বৃত্তি নিয়ে কলকাতা যাওয়া যখন ঠিকঠাক তখন স্ত্রী জেবুন নাহার জামাকাপড় থেকে শুরু করে টুকিটাকি সব গুছিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার মসলা গুড়া করে কৌটায় কৌটায় সাজিয়ে দিচ্ছে; যতই বলছি ওগুলো নিয়ে আমি কি করব। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া। এ জন্য মন ভারাক্রান্ত। তার মনে আরো কত রকমের ভয়-শঙ্কা। তবু নিপুণ হাতে সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিচ্ছে। সে আসলে সংসার গড়ার এক নিপুণ শিল্পী। সংসারও তার কাছে এক শিল্প। গার্হস্থ্য জীবনের বহুগুণের অধিকারী সে। সে মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী এবং একটি কলেজে অধ্যাপনা করছে। আমাদের সন্তান দু'টি আবু মোহাম্মদ জুবেরি জ্যোতি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের শেষ বর্ষের ছাত্র এবং নুজহাত জাহান জয়িতা নবম শ্রেণীর ছাত্রী। তারা আমার গবেষণাকর্মের নিরন্তর সহযোগী। লালনের গান, রবীন্দ্রনাথের গান, হাসন রাজার

গান, মানবতাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে সবাই আলোচনায় অংশ নেয় এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়। তাদের প্রতি রইল অশেষ প্রীতি ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

দাদি মা, আব্বা ও আম্মার কাছ থেকে পেয়েছিলাম মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্র। দাদি মা বলেছিলেন, তোমার খাবার প্লেট থেকে একটি ভাতও যদি মাটিতে পড়ে তবে আল্লার কাছে তার হিসাব তোমাকে দিতে হবে। বাবা শিখিয়েছিলেন প্রত্যেক কাজ শুরু করার প্রাক্কালে অবশ্যই বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম বলবে এবং সবসময় বড়দের সম্মান করবে। বাল্য-কৈশোর থেকেই তিনি আমাকে অহিংসা, মানবপ্রেম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধের শিক্ষা এবং মানুষ নির্বিশেষে ভালোবাসার দীক্ষা দিয়েছেন।

একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান, সবসময়ই সত্যপরায়ণ, ধর্মনিরপেক্ষ ও পরমতসহিষ্ণু হন এটা বাবার জীবনাচরণ-জীবনদর্শন থেকে আমি জানতে পেরেছি। মায়ের স্নেহ-আদর-ভালোবাসা এখনো জীবনের অমিয় সুধা। বাবা-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা আমি পেয়েছি অফুন্ত। তাঁরাই আমার সকল ভাল কাজের প্রেরণাদায়ী।

আমার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী। ভাষা শহীদের রক্তেগড়া এ প্রতিষ্ঠান বাঙালির মিলনকেন্দ্র, বাঙালির হাজার বছরের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গঠিত বাঙালি জাতিসত্তার এক অনন্য প্রতীক। এ প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে আমার শিক্ষালয় ও গার্ডিয়ান, আমার গুরুমহাশয়। আমি বাংলা একাডেমীর কাছে বহুভাবে ঋণী, এ ঋণ অপরিশোধ্য।

বইটির মধ্যে কিছু পুনরাবৃত্তি রয়ে গেল। একই বিষয়ের অবতারণা বারবার করার ফলে এরকমটি ঘটেছে। আশা করি পাঠক এগুলো ক্ষমার চোখে দেখবেন। এ বই রচনার মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মান্ধতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার পথ-সন্ধান। সেই ক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছি সেটাই মূল কথা। এর বিচারের ভার পাঠকের। সংগীতগুলো সংগ্রহের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে প্রীতিভাজন সাইমন জাকারিয়া, সুমন কুমার দাশ, আবু ইসহাক হোসেন ও মোঃ এনামুল হক। এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বইটি বাংলা, ফোকলোর, দর্শন, সংগীত, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে এবং কৌতূহলী সাধারণ পাঠককেও আগ্রহী করে তুলবে এই বিশ্বাস আমার আছে। সবার সুখ কামনায়।

ড. আবদুল ওয়াহাব

সূচিপত্র

কবি ও সংগীত সূচি

বাংলার জনপদ সমাজ সংস্কৃত

ভূমিকা

বাঙালি জাতি অধ্যুষিত এলাকা ভৌগোলিকভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। গঙ্গা, যমুনা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, হিমালয় থেকে উৎসারিত নদীসমূহের দ্বারা সৃষ্ট এ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। এখানকার মাটি খুবই উর্বর; আদিকাল থেকেই এখানে প্রচুর শস্য ফলে। এছাড়া বনে পশু-পাখি ও নদী-হাওড়-বিলে মাছের উৎপাদন ছিল অপরিসীম। পরিবেশের সাথে মানুষের জীবন-জীবিকা ও জৈবকতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাই কোনো দেশের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতিকে জানতে ও বুঝতে হলে সেই দেশের ভৌগোলিক পরিসীমা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন আবশ্যিক। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, কোনো একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, এর রাজনৈতিক জীবন গঠনে এবং এর অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে।[১] তবে ইতিহাসের উপকরণ ও উপাদানের অভাবে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিশদ বিবরণ সংগঠন করা দুরূহ কাজ। তার কারণ পৃথিবীর বৃহত্তম বঙ্গ ব-দ্বীপ অঞ্চল অসংখ্য ছোটো-বড়ো নদীর পলি দ্বারা গঠিত। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই নদীসমূহের গতিমুখের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে ঐতিহাসিক অঞ্চলের ও বাণিজ্যবন্দরসমূহের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। তবে সে কালের ভূমিদার সম্পর্কিত লিপিমালা ও সাহিত্যিক উৎস ইতিহাসভিত্তিক ভূগোল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং বাঙালি জাতির ইতিহাসের মৌল উপাদান হিসেবে জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারণা, আর্যীকরণ-প্রচেষ্টা, প্রাচীন লিপিমালা, লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান লোকশিল্পকলা, লোকগীতি, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককাহিনী, পুরাণ, সংস্কৃত ও পালিভাষার রচনাবলি, পুথিসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যসমূহ ইতিহাস সংগঠনে উপাদান জোগাচ্ছে।[২]

'বঙ্গ' নামটির উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় প্রাচীন 'ঐতরেয়আরণ্যক' গ্রন্থে; কিন্তু তা ভৌগোলিক অর্থে নয়, কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসেবে :

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যয় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চের পাদান্যান্যা অর্কমবিতো বিমিশ্র ইতি ॥

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহাভাষ্য-রচয়িতা পতঞ্জলি পূর্ব ভারতের তিনটি বিভাগের নাম করেছেন, সেগুলি হল : অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম। অঙ্গের বেশিরভাগ এখন বিহারে; কিছু অংশ মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম অঞ্চলে। গঙ্গা নদীর মোহনা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলময় স্থান বঙ্গ। 'বঙ্গ' কথার মূল অর্থ—জলাভূমি। রাঢ় অঞ্চলকে বলা হত সুহ্ম।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণকালে পূর্বভারতের দুটি বড়ো রাজ্য ছিল : ১. প্রাচী, ২. গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাঢ়ী। গ্রিকগণ 'প্রাচী'-কে 'প্রাসই' এবং 'গঙ্গারাঢ়'কে 'গঙ্গারিডই' (Gangaridai) উচ্চারণ করেছেন। অনেকের মতে, গঙ্গা নদীর যে-দুটি স্রোত ভাগীরথী ও পদ্মা নামে পরিচিত, তার মধ্যবর্তী প্রদেশ 'গঙ্গারাঢ়' নামে পরিচিত ছিল। 'গঙ্গারাঢ়'-এর পশ্চিম দিক ছিল 'প্রাচী'; তার রাজধানী ছিল পালিবোথরা বা পাটলিপুত্র।

বাল্মীকির রামায়ণে সুহ্ম ও বঙ্গের নাম পাওয়া যায় :

সুহ্মান মাল্যান বিদেহাংশ্চ মশয়ান কাশীকোশলা।
মগধান দম্ভ-কুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গাংস্তথৈচ ॥

মহাভারতের আদিপর্বেও উল্লেখ আছে :

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মঃশ্চতে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিকা ভুমি ॥

কথিত বলি রাজার স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে, দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ ছেলের জন্ম হয়। তাদের নাম থেকে পরবর্তীকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটি রাজ্য হয়। অঙ্গ ছিল মগধের পূর্বে। অঙ্গের পূর্বে সুহ্ম। সুহ্মের পূর্বে বঙ্গদেশ। সুহ্মের উত্তরে পুণ্ড্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গ। সুহ্ম হল রাঢ়দেশ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মত : 'সুহ্মাঃ রাঢ়া'।

প্রাচীন জৈনধর্ম গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্র'-এ 'লাঢ়' বা 'রাঢ়' দেশের কথা আছে। রাঢ় দেশের দুটি বিভাগ ছিল : ১. বজ্জ বা বজ্রভূমি, ২. সুহ্ম বা সুহ্মভূমি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠদশকে জৈন তীর্থংকর অরণ্যসংকুল রাঢ়দেশ ভ্রমণ করেছিলেন; তখন বজ্রভূমি-সুহ্মভূমির কিছু মানুষ চু-চু শব্দে তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে রূঢ় আচরণ দেখায়। মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় সুহ্ম ও কলিঙ্গ দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। দিগ্‌বিজয়ী রঘু নানাদেশ জয় করে সুহ্মদেশে এসেছিলেন। সুহ্মবাসীগণ বেতসপত্রের ন্যায় নত হয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল। মহারাজ রঘু কপিলা

(কাঁসাই) নদী পার হয়ে কলিঙ্গের পথে জয়যাত্রা করেন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে 'সুহ্ম' নামের পরিবর্তে 'রাঢ়' নামের প্রচলন হয়। রাঢ়দেশের জনগণ রূঢ় এবং কিছুটা আত্মগর্বী হিসাবে কারো কারো মনে হলেও কবি ধোয়ী 'রসোময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ' বলে গঙ্গালহরীমুখর পুণ্যভূমির প্রশংসা করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালির ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থে বলেছেন : ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পশ্চিমে বাংলার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, সিংভূম, ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূম এই পুরাভূমির অন্তর্গত; তাহারই পূর্বদিক ঘেঁষিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিক ভূমি। মালভূমি অংশ একান্তই পার্বত্য, বনময়, অজলা এবং অনুর্বর। এখনও এই অংশে গভীর শালবন, পার্বত্য আকর ও কয়লার খনি বিদ্যমান। প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের অনেক অংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরও কিয়দ-পশ্চিমাংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ-রাঢ়ের রানিগঞ্জ আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বন-বিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনী-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চল এই পুরাভূমিরই নিম্ন অংশ। এসব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী (শিলাই), কপিলা (কাঁসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে।

ঐতরেয় আরণ্যকে বাঙালিদের 'বয়াংসি' বা 'পাখিজাতীয়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে পুণ্ড্র বলেও আর এক জাতির কথা উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রদের বলা হয়েছে 'দস্যু'। বাংলাদেশে আর্যধর্ম প্রবর্তিত না থাকায় কোনো কারণে বাংলাদেশ গমন করলে বা ধর্মসূত্রে সেখানে গেলে 'বৈধায় ধর্মসূত্রে' পায়শ্চিত্তের বিধান দেয়া হয়েছে। বৈধায়ন ধর্মসূত্রানুযায়ী পুণ্ড্রদের আবাসস্থল ছিল উত্তর ও মধ্য-পূর্ববঙ্গে। বঙ্গ একটি কৌমগোষ্ঠীর নাম এবং প্রাচীন এই কৌমগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যরা যে পরিচিত ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কিন্তু বাংলা অঞ্চল ছিল তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে এবং তাদের আচার-আচরণ, জীবনদর্শন, জীবনযাপন বিশেষত ভাষা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এদেরকে বেদসমূহের শৃঙ্খলে আনার প্রয়াস সম্পূর্ণ বিফল হয়। এজন্য বাংলা অঞ্চলের অধিবাসীদের তারা বিরোধী শক্তি হিসেবেই শনাক্ত করেছিল। ভারতীয় পুরাণে 'অসুর' নামে এক ভয়ংকর মনুষ্যেতর জাতিকে চিত্রিত করা হয়েছে। আসলে এরা বৈদিক ধর্মে অবিশ্বাসী বেদবহির্ভূত অন্য সংস্কৃতির বাহক। প্রাচীন শাস্ত্রানুযায়ী বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম-রাঢ়,শবর-পুলিন্দ এবং মুতিব প্রভৃতি ট্রাইব বা কোমেরা দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ বা অসুর নামে চিহ্নিত হয়েছে। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে এদের ভাষাকে অসুর ভাষা বলা হয়েছে। অথচ ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে অসুর শব্দটি বিখ্যাত

দেবতাদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হত, পরে তার অর্থাবনতি ঘটে দেব বিরোধী অর্থ দাঁড়ায়। প্রাচীন ভারতে কিরাত নামে এক জনগোষ্ঠীকে খাটো চোখে দেখা হত। কিরাত দেশ বলতে ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এলাকা—পূর্ব নেপাল, ত্রিপুরা ও প্রাচীন বাংলার অনেক অংশকে বোঝাত। কিরাত অর্থ ব্যাধ, প্রাচীন ম্লেচ্ছ বা নিম্নশ্রেণির জাতিবিশেষ। কূর্মপুরাণে পূর্ব ভারতের সব অনার্য গোষ্ঠীই কিরাত বলে চিহ্নিত। মহাভারতের ভাষ্য অনযায়ী যবন, কম্বোজ, গান্ধার প্রভৃতি উত্তরাপথবাসী অনার্য পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কিরাতরাও কামরূপের অধিবাসী। টলেমি এদের বাসভূমি রূপে কিহাদাই-এর কথা বলেছেন, তা আসলে গাঙ্গেয় উপকূল থেকে সুদূর পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে বাঙালির সুবিশাল আবাসভূমি 'বঙ্গদেশ' প্রাচীনকালে বহু সংখ্যক কৌম্যগোষ্ঠীর আবাসস্থল বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। যেমন বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্তি, বারক, কঙ্কগ্রাম, বর্ধমান, জঙ্গল, দণ্ডভুক্তি, ঘাড়ি, নাব্য, বাজঙ্গনা, কোটিবর্ষ, শ্রাবস্তী, নবদ্বীপ, প্রাগজ্যোতিষ, পট্টিকেরা, গঙ্গাঋদ্ধি, প্রাসই, মগধ, গোরক্ষপুর, ত্রিপুরা, কামরূপ, লালমাই, উৎকল, চন্দ্র, মণিপুর, কম্বোজ ইত্যাদি। এসব জনপদের ভৌগোলিক সীমারেখা এক এক যুগে এক এক রকম ছিল। এক একটি কোমের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল এক একটি জনপদ।[৩] সাধারণত জনপদের নাম হয় কোমের নাম অনুসারে। এসব জনপদ কোথায় কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল তা বলা কঠিন। তবে প্রাচীন পুথি ও শিলালিপিতে যে সব উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে পুথি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রত্ন-সামগ্রী, লোকসাহিত্য থেকে এগুলোর অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। আমরা এসব তথ্যসূত্র থেকে জনপদগুলোর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় জানার চেষ্টা করতে পারি।

প্রাচীন বাংলার জনপদ পরিচিত

ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাংলাভাষা অঞ্চলে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতার একটি বিশেষ আঞ্চলিক সত্তা গড়ে ওঠে। আমরা যদি ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এ দেশের শিলা এবং মাটি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব বৃহৎ বাংলা একটি ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। এই ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রধান কয়টি জনপদের পরিচয় আমরা এখানে জানবার চেষ্টা করতে পারি। এই জনপদগুলো গড়ে উঠেছিল সুপ্রাচীন কালে বাংলায় বসবাসকারী ট্রাইবাল সমন্বয়ে গঠিত টোটেমিক সমাজ থেকে। এগুলো ঠিক গ্রিক নগর রাষ্ট্রের আদলে না হলেও প্রত্যেকটি জনপদে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠেছিল। তবে সেগুলোর সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় আজ আর সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয়শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী এসব জনপদের সীমানা কখনো বেড়েছে কখনও কমেছে। বিভিন্ন পুথিপত্র, সহিত্য ও দলিল-দস্তাবেজ থেকে পণ্ডিতরা নিম্নোক্তভাবে এগুলোর পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন।

বঙ্গ

বঙ্গ একটি সুপ্রাচীন জনপদ। মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় বঙ্গ রাজের উপস্থিতির কথা আছে। খুব পুরানো দুটি পুথিতে বঙ্গকে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। মহাভাতের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ।[৪] ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের দিকে সমগ্র বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই অন্তর্বিদ্রোহ ও হুন জাতির উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে সমগ্র গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই ফাঁকে বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান হয়। ইতোমধ্যে বঙ্গ রাজ্যের ৭টি তাম্রশাসন ও কতকগুলো স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। তাম্রশাসনে বঙ্গের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গেছে, তাঁরা হচ্ছেন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। এঁদের মধ্যে গোপচন্দ্রই সর্ব প্রাচীন ছিলেন, এবং অনুমান করা হয় তিনি ছয় শতকের দ্বিতীয় দশকে বঙ্গে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে অনুমান করা হয় গঙ্গা-ভাগীরথীই ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা। বৃহৎসংহিতায় 'উপবঙ্গ' নামে একটি জনপদের নাম পাওয়া যায়। ড. আহমদ শরিফ লিখেছেন :

> ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদির প্রমাণে মনে হয় খ্রিস্টপূর্ব হাজার বছরের গোড়ার দিকেই উত্তর ভারতীয় আর্য সমাজ এ-অঞ্চল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এবং দাক্ষিণাত্যের মতো এ অঞ্চলকেও অবজ্ঞা ও কিছুটা ঈর্ষার চোখে দেখত তারা। শতপথব্রাহ্মণে পূর্বাঞ্চলের মানুষকে বায়াংসি ভাষী অসুর (বিকৃত আর্যভাষী, 'সুর' দেব বিরোধী দল) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের দস্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, মগধ, কলিঙ্গ এবং কাত্যায়নও অঙ্গাঃ সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ-র উল্লেখ করেছেন। বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও (১/২/১৪) পুণ্ড্রের ও বঙ্গের অবজ্ঞার্থে উল্লেখ রয়েছে। পুরাণে পূর্বাঞ্চলের দেশ হিসেবে অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গও উল্লেখিত। রামায়ণে 'বঙ্গ'-এর এবং মহাভারতে বঙ্গ পুণ্ড্র, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তির এবং তারও আগের বন্দর Portalis বা পরস্থালী (সম্ভবত নদিয়ার কাছে) উল্লেখ পাই রোমান ঐতিহাসিক Plini-র লেখায়। আচারাঙ্গ সূত্র (আয়ারাঙ্গসূত্ত) নামের জৈনগ্রন্থে সুহ্মের নাম আছে। বৌদ্ধ 'মহাবর্গে' (মহাবগ্গো) রাঢ়-এর 'মিলিন্দ প্রশ্নে' বঙ্গের আর 'দিব্যাবদানে' পুণ্ড্রের উল্লেখ মেলে। তাছাড়া ললিতবিস্তারে ও মহাবস্তুতে (মহাবত্থু) বঙ্গ ও বঙ্গলিপির কথা আছে। গ্রিকসূত্রে প্রাপ্ত গঙ্গাহৃদি বা গঙ্গাহৃদয় (গঙ্গারিডই) সম্ভবত গৌড়ে পুণ্ড্রেই বিস্তৃত ছিল। ১৯৬২-৬৩ সনে অজয় নদের দক্ষিণে নানা স্থানে উৎখননের ফলে জানা যায় অনেক কিছু।[৫]

ষোল শতকে উপবঙ্গ বলতে যশোর ও তার আশপাশের জঙ্গলময় কয়েকটি অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন উৎসে 'প্রবঙ্গ' নামে আর একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এর অবস্থানের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এক দশকের শেষ দিকে বঙ্গের দুটি বিভাগ কল্পিত হয়েছিল একটি উত্তরাঞ্চল অপরটি দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের সীমা ছিল পদ্মা আর সমুদ্রতীরবর্তী খাল-নালা সমাকীর্ণ

অঞ্চলই দক্ষিণাঞ্চল। রাজা লক্ষ্মণ সেনের পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০) এবং কেশব সেন (১২২০-১২২৩)[৬]-এর আমলে বঙ্গের দুটি বিভাগ ছিল; একটি বিক্রমপুর ভাগ ও অপরটি নাব্যমণ্ডল। বর্তমানে বিক্রমপুর পরগনা ও সেই সঙ্গে ইদিলপুর পরগনার কিছুটা অংশ নিয়ে ছিল বিক্রমপুর ভাগ; বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত গোটা অঞ্চল নিয়ে ছিল নাব্যমণ্ডল।[৭] মেঘনার সংগম মুখও ছিল এই নাব্যমণ্ডলের অন্তর্গত।[৮] ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিনের 'তবাকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বখতিয়ার বিহার জয় করে নদিয়া আক্রমণ করেন। বখতিয়ার নদিয়ার উদ্দেশ্যে এমনি দ্রুদগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে মাত্র ১৭ জন সৈনিক তাঁর সঙ্গে ছিল এবং মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল। তাদেরকে অশ্ববিক্রেতা মনে করে নদিয়াতে অনুপ্রবেশে তাদের প্রতি কোনো সংশয় সৃষ্টি হয় নাই। এ সুযোগে তিনি সরাসরি রাজপ্রাসাদে গমন করে নিজ ভাবমূর্তি উন্মোচন করেন এবং আকস্মিক আক্রমণে প্রাসাদরক্ষীদের পরাস্ত করেন। তখন রাজা লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্ন আহারে রত ছিলেন। এ আকস্মিক ঘটনায় তিনি বিভ্রান্ত হয়ে রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে নগ্ন পায়ে বঙ্গ (পূর্ব) ও সমতটে পলায়ন করেন।[৯] দেখা যাচ্ছে তুর্কি বিজয়কালে 'বঙ্গ' নাম ব্যবহৃত হয়েছে। মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন : 'বখতিয়ার খলজির আক্রমণের আতঙ্ক বিহারে লক্ষনৌতিতে, বঙ্গ ও কামরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় লক্ষ্মণ সেনের ব্রাহ্মণ ও বেনে প্রজারা পালিয়ে বঙ্গে-কামরূপে আশ্রিত হয়েছিল। পরে লক্ষ্মণ সেনও তাঁর রাজ্যভুক্ত সন্তানশাসিত বঙ্গে আশ্রয় নেন।' নানা প্রসঙ্গে মিনহাজ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা বারবার 'বঙ্গ' রাজ্যের নাম উচ্চারণ করেছিলেন।

রণবঙ্গমল হরিকেল দেবের ১২২০ খ্রিস্টাব্দের তাম্রশাসন ও দামোদর দেবের ১২৩০ খ্রিস্টাব্দের তাম্রশাসন সূত্রে মনে হয় সমতট কুমিল্লাদি অঞ্চলই ছিল, কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যোক্ত গঙ্গার স্রোতের পূর্বাংশ বঙ্গ বলেই অনুমান করা হয়, যদিও কালিদাস গঙ্গার স্রোতের মধ্যবর্তী অংশকে 'বঙ্গ' নামে চিহ্নিত করেছেন। সতেরো শতকের অর্বচীন গ্রন্থ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে সাগর(বঙ্গোপসাগর) থেকে ব্রহ্মপুত্র অবধি অঞ্চলকে বঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের আমলে ফরিদপুর-ঢাকা-ময়মনসিংহই ছিল বঙ্গ। ইবনেবতুতাই প্রথম মধ্যযুগে 'বঙ্গালা' নাম উচ্চারণ করেন, বঙ্গবাসীই বঙ্গাল : 'বঙ্গালা পাইক' তাই বঙ্গবাসী বাঙালি পদাতিক সৈন্যই নির্দেশ করে। লখনৌতি, গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র (পরে বরেন্দ্র) অনেক কাল স্ব স্ব আঞ্চলিক নাম অক্ষুণ্ন রেখেছিল। 'সুবহে বাঙ্গলা'-ই শেষাবধি উক্ত সব অঞ্চলকে 'বঙ্গ' বা বাঙ্গলা নামের জয় ঘোষণা করে দেয়। চর্যাপদেও 'বঙ্গজ'কে 'বঙ্গালী' বলা হয়েছে—'আজ ভুসুক বাঙ্গালী ভইলি। নিয় ঘরনী চণ্ডালী লেলি।' এ সময়ে বঙ্গালী অবজ্ঞেয়; হয়তো অস্পৃশ্যজাত সংস্কৃতিহীন অর্থে আজো 'বাঙ্গাল' অবজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ। বাংলা ঘর, বাংলা কচু, বাংলা কলা আজো নিম্নমানজ্ঞাপক। গোড়ায় 'বঙ্গ'বাসীই ছিল বাঙালি। পরে বাংলা-ভাষীমাত্রই

হল বাঙালি এজন্যই পোর্তুগিজদের 'সিটি অব বেঙ্গলা' আলাদাভাবে খোঁজাখুঁ নিরর্থক। এটি হচ্ছে বাংলা রাজ্যের বন্দর নির্দেশক পরিভাষামাত্র।[১০]

অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে, বঙ্গজাতি থেকে দেশটির নাম বঙ্গ হয়ে থাকতে পারে। সুকুমার সেন বলেন,

> প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ দেশের নাম জাতির নাম থেকে এসেছে। অবশ্য 'বঙ্গ' শব্দটি চিনা তিব্বতীয় শব্দ এবং শব্দটির অং অংশের মূল অর্থ জলাভূমি বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ যারা জলাভূমির দেশে পুরুষানুক্রমিকভাবে বসবাস করে তাঁরা বঙ্গ এবং তাদের আবাসভূমি বঙ্গদেশ। কবি কালিদাস পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। আবার শাক্তসঙ্গম তন্ত্রের 'ষট পঞ্চাশদ্দেশবিভাগ' গ্রন্থে ব্রহ্মপুত্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সম্ভবত সুন্দরবনের পূর্বপ্রান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহিত স্রোতধারার মধ্যবর্তী ভূভাগই ছিল বঙ্গ। এ থেকে অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল অঞ্চল বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র বলেন, 'সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র ইহার সীমারেখা ছিল।'[১১]

আজকের বাংলাদেশ নামের কাছাকাছি 'বঙ্গালদেশ' নামে একটি জনপদের অস্তিত্ব খ্রিস্টীয় এগারো শতকের দিকে ছিল। রাজা ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র। বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে এর অবস্থান ছিল। ময়নামতী-গোপীচাঁদের প্রচলিত লোকগীতির কটি পঙ্‌ক্তিতে তা ধরা আছে : 'ভাটি হইতে আইলো বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি'। অনুমান করা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য যে ওই বঙ্গাল (দেশ) থেকে জাতিবাচক শব্দ বাঙ্গাল/বাঙাল হয়েছে।[১২] প্রাচীন 'বঙ্গ' জনপদ প্রসঙ্গে ড. নীহার রঞ্জন রায় বলেন :

> বাংলা বলতেই আমাদের চোখের সামনে বিরাট এক দেশের ছবি ভেসে ওঠে, যার শিয়রে উত্তুঙ্গ পাহাড় 'দু'পাশে কঠিন শিলাকীর্ণ ভূমি,পায়ের নীচে বিস্তীর্ণ সমুদ্র। প্রাচীন কালে কিন্তু বঙ্গ বা বঙ্গাল বলতে যে জায়গা বোঝাত তা আজকের বাংলার একটা অংশমাত্র। সে সময় বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। একেকটি কোমের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল একেকটি জনপদ। প্রায় ক্ষেত্রেই কোমের নামে জনপদের নাম হয়েছে— বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় নামের কোমের যে অঞ্চলে বাস করত পরে সেই অঞ্চলের নাম হয়েছে যথাক্রমে বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ়। এদের ছিল আলাদা আলাদা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের দাপট যেমন-যেমন বেড়েছে এবং কমেছে সঙ্গে সঙ্গে জনপদের সীমানাও তেমনি বেড়েছে এবং কমেছে। এই সব জনপদ ঠিক কোথায় কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল, তা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে যে সব উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে তাদের বিস্তার সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আঁচ পাওয়া যায়।[১৩]
>
> বঙ্গ খুব প্রাচীন দেশ। খুব পুরনো দুটি পুঁথিতে বঙ্গকে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। মহাভারতের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বঙ্গ পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। পরবর্তী অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় গঙ্গা-ভাগীরথীই ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা। বৃহৎ সংহিতায় উপবঙ্গ নামে একটি জনপদের কথা পাওয়া

যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে উপবঙ্গ বলতে যশোর ও তার আশপাশের জঙ্গলময় কয়েকটি অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। প্রবঙ্গ নামে যে জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা বঙ্গেরই একটি অংশ—কিন্তু ঠিক কোথায়, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। একাদশ শতকের শেষাশেষি বঙ্গের দুটি বিভাগ কল্পিত হয়েছিল। একটি বঙ্গের উত্তরাঞ্চল ও আরেকটি অনুত্তর বা বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্রতীরবর্তী খাল-নালা-সমাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল ছিল অনুত্তর বঙ্গ। কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলে বঙ্গের দুটি বিভাগ ছিল; একটি বিক্রমপুর ভাগ ও অন্যটি নাব্যমণ্ডল। বর্তমান বিক্রমপুর পরগনা ও সেই সঙ্গে ইদিলপুর পরগনার কিছুটা অংশ নিয়ে ছিল বিক্রমপুর ভাগ; বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত গোটা অঞ্চল নিয়ে ছিল নাব্যমণ্ডল।'

বঙ্গ জনপদের আর একটি অমোচনীয় দলিল হচ্ছে খ্রিস্টীয় তিন শতকে সৃষ্ট নাগার্জুনকুণ্ড মন্দিরের দেয়াললেখ। এ মন্দিরের গায়ে 'বঙ্গ' নামক স্থানের ভ্রাতৃতুল্য বৌদ্ধদের কথা উৎকীর্ণ হয়েছে। দিল্লির নিকটে খ্রিস্টীয় চার শতকে তৈরি মেহেরৌলি লৌহ স্তম্ভলেখ 'বঙ্গ অঞ্চলসমূহ' চন্দ্র নামক জনৈক রাজা দখল করেছিলেন বলে জানা যায়। সমতট, ডবাক আর পুষ্করণা-এর কথা চার শতকের গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে উৎকীর্ণ রয়েছে। স্মরণযোগ্য যে এখানে বঙ্গের নাম অনুল্লেখ থাকলেও ডবাককে ঢাকা বলে পণ্ডিত ফ্লিট মনে করেন। ঢাকা 'বঙ্গ' জনপদেরই একটি স্থান। এ ছাড়া আট শতকের দিকে 'শ্রীভঙ্গল মৃঙ্গকস্য' উপাধিযুক্ত দেব রাজবংশের রাজত্বের কথা জানা যায়; এই ভঙ্গল 'বাঙ্গাল'-এর অপভ্রংশ হওয়াই স্বাভাবিক। জিয়াউদ্দিন বারানি নদীবেষ্টিত 'বাঙ্গালার' কথা বলেছেন। শামস সিরাজ-ই আসিফ বাংলার স্বাধীন সুলতান সিকান্দার শাহকে 'শাহ-ই-বঙ্গালা' এবং শাহ-ই-বঙ্গালিয়ান' বলে অভিহিত করেছেন।[১৪]

পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্র

পুণ্ড্র জাতিবাজক শব্দ। পুণ্ড্র নামীয় জাতির ভিত্তিতে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে। পুণ্ড্র জনপদ ছিল মুদগগিরি বা মুঙ্গরের পূর্ব দিকে এবং কোশী নদীর তীরে। এ জনপদ ছিল অঙ্গ, বঙ্গ এবং সুহ্ম কোমদের জনপদের গায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কাছাকাছি যে পুন্দনগরের উল্লেখ পাওয়া যায় তা ছিল সে সময়কার পুণ্ড্রের রাজধানী বর্তমান বগুড়া জেলায় মহাস্থান, যার পাশ দিয়ে এখনও করতোয়ার ক্ষীণধারা বয়ে চলেছে। সমৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছে।[১৫]

বৈদিক সাহিত্যে পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ আছে। মহাভারতের গিগ্বিজয় পর্বে বলা হয়েছে, পুণ্ড্র জাতি আধুনিক মুঙ্গেরের পূর্বদিকে বাস করত, রাজত্ব করত কোশী নদীর উপকূলে। পরবর্তী কালে গুপ্তযুগের বিভিন্ন লিপি ও চিনা পরিব্রাজকদের লেখা থেকে বোঝা যায় পুণ্ড্র জাতির বাসস্থান পুণ্ড্রবর্ধন বগুড়া-দিনাজপুর ও রাজশাহী পাবনা জেলা জুড়ে। বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রমণ্ডল পুণ্ড্রবর্ধন জনপদের সর্বাপেক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এ এলাকার অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে বলা হয়েছে গঙ্গা আর করতোয়ার মধ্যে যে ভূখণ্ড বরেন্দ্রী ছিল তারই নাম। অনুমান করা যায় একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে আরম্ভ করে করতোয়া পর্যন্ত মোটামুটি গোটা উত্তরবঙ্গই সে সময় পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কজঙ্গল ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগই পুণ্ড্রবর্ধন। পরে রাষ্ট্রসীমা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। সে আমলে এর দক্ষিণ সীমা ২৪ পরগনা থেকে ঢাকা-বাখরগঞ্জের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৬] ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা লিখেছেন :

> ৪৩২ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী একশত বছরে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামক অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তি বিক্রয়ের বহু নজির আছে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সবটুকু নিয়েই গঠিত হয়েছিল এই অঞ্চল। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভূ-সম্পত্তি বা জমি বিক্রির বিশদ বিবরণ সমেত বহু তাম্র ফলক সংগৃহীত হয়েছে এখান থেকে। তাম্র ফলকগুলি থেকে বুঝতে পারা যায় ভূ-সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যম ছিল স্বর্ণমুদ্রা : ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দান করা জমির জন্য কোনো কর দিতে হত না। রাজন্যবর্গ, শ্রেষ্ঠী ও সমাজের বিত্তবান শ্রেণির মধ্যেই সাধারণত তখনকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, সে যুগে কৃষির সম্প্রসারণ কেমনভাবে ঘটেছিল, তাঁর উপরেও আলোকপাত করে তাম্র ফলকগুলি। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে যে সব জমি মঞ্জুর করা হত, সাধারণত সেগুলি হত অনুর্বর ও চাষের অযোগ্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই এগুলি থাকত করমুক্ত। আবাসনের উপযোগী বা চাষের যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের জমি দান করার রেওয়াজ ছিল।[১৭]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনের অবস্থান বলা হয়েছে। আর্যাবর্তের সীমান্ত, পুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় পূর্বদেশীয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। করতোয়া মহাত্ম্য গ্রন্থে করতোয়া নদীর প্রবল বিক্রমে পুণ্ড্রনগরের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার উল্লেখ আছে। সপ্তম শতকে চিনা ভ্রমণকারী য়ুয়ান চুয়াং-এর বর্ণনায় কজঙ্গল ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগকেই পুণ্ড্রবর্ধন বলা হয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত গ্রন্থে বরেন্দ্রকে পালদের পিতৃভূমি বলা হয়েছে এবং দক্ষিণে গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগকেই পুণ্ড্রবর্ধনের প্রধান নগর বরেন্দ্র ভূমির কথা উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে বরেন্দ্রভূমির অবস্থান ছিল।[১৮]

গৌড়

সুপ্রাচীন একটি জনপদের নাম গৌড়। এক সময় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী গৌড়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়। গৌড় যথেষ্ট প্রাচীন জনপদ হলেও গৌড় বলতে ঠিক কোন অঞ্চল বোঝাত এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। গৌড়ের নামকরণের বিষয়েও কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ব্যাকরণে গৌড় দেশ তৈরি বিভিন্ন জিনিসের উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে বাৎস্যায়নেও। ষষ্ঠ শতকে লেখা বরাহ-মিহিরের সংহিতায় দেখা যায় গৌড় পুণ্ড্র, বঙ্গ ও সমতট থেকে পৃথক একটি

জনপদ হিসেবে চিহ্নিত। ভবিষ্যৎ পুরাণে গৌড়ের স্থান নির্দেশ রয়েছে বর্ধমানের উত্তরে পদ্মার দক্ষিণে।[১৯] ঈশান-বর্মণের হড়হালিপিতে গৌড় জনপদ সমুদ্র তীরবর্তী বলে উল্লেখিত হয়েছে। সপ্তম শতকের লিপি ও তথ্যে শশাঙ্ক গৌড়-কর্ণসুবর্ণরাজ বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। পরিব্রাজক যুয়ান-চুয়াং শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের সম্রাট বলে অভিহিত করেছেন। বাণভট্টের হর্ষচরিত গ্রন্থে তাকে গৌড়াধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড় শশাঙ্কের অধীনে সম্ভবত অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। কারণ শশাঙ্কই প্রথমে গৌড়ের সম্রাট হিসেবে সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করেছিলেন।[২০] প্রধানত মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদের অবস্থান।[২১] নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,

> মুর্শিদাবাদ বীরভূমই গৌড়ের আদি কেন্দ্র; পরে মালদহ এবং সম্ভবত বর্ধমানও এই জনপদের সাথে যুক্ত হয়। বর্তমানের এই ক'টি জেলা নিয়েই প্রাচীন গৌড়। গৌড়ের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য কখনও কলিঙ্গ, কখনও ভূবনেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক যখন আসমুদ্রবিস্তৃত গৌড় রাষ্ট্রের রাজা, তখন তাঁর রাজধানী ছিল 'কর্ণসুবর্ণ'; কর্ণসুবর্ণ বর্তমান কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অঞ্চল। আমরা মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ বলতে যা বুঝি, অর্থাৎ মালদহ-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমানের কিছু অংশ তাই ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদ।[২২]

কালের ব্যবধানে এক সময় সমগ্র বাংলা গৌড় দেশ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। হর্যচরিত গ্রন্থে শশাঙ্ককে গৌড়রাজ বলে অভিহিত হতে দেখা যায়। লিপিমালা থেকে জানা যায় যে, সেন রাজগণ 'গৌড়েশ্বর ও গৌড়াধিপতি' নাম গ্রহণ করেছিলেন। ভাষিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ গৌড় প্রাচীন কালের রাজ-রাজড়ার যেমন আত্মগর্বের ঠিকানা হিসেবে স্বীকৃতি পায় তেমনি উনিশ শতক পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত থাকে। মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সরস্বতী বন্দনায় লেখেন, 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত...গৌড়জন যাহা আনন্দে করিবে গান সুধা নিরবধি।[২৩]

সমতট

একটি প্রাচীন জনপদ। প্রধানত এর অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কুমিল্লা নোয়াখালি অঞ্চল। বিভিন্ন সূত্রে কখনও কখনও এর বর্ধিত হবার এবং কখনও সীমা সংকোচনের সংবাদ পাওয়া যায়। চার শতকে গুপ্ত রাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে সমতট, ডবাক আর পুষ্করণার কথা আছে।[২৪] বৃহৎ সংহিতায় পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, বর্ধমান এবং বঙ্গের সঙ্গে 'সমতট' জনপদ উল্লেখ আছে। সপ্তম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ান চুয়াং এই অঞ্চলকে নাব্য, আর্দ্র ও সমুদ্রতীরবর্তী এবং কামরূপের (সিলেট) দক্ষিণে বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫] তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিদ্যমান অবস্থার যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'বৌদ্ধ বিহারেই' এসেছিলেন।

সাম্প্রতিক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননাবিষ্কারে বৌদ্ধ বিহারটি চিহ্নিত হয়েছে এবং বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির চিত্র উদঘাতি হয়েছে।[২৬] সপ্তম শতকের শেষার্ধে পরিব্রাজক ইৎসিং তাঁর বিবরণে শেংচি নামক শ্রমণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বর্ণনায় সমতট অঞ্চলে রাজভট ও খড়্গ রাজবংশ সম্ভূত রাজরাজভট এক ও অভিন্ন খড়্গ বংশ। তাদের রাজধানী কমাণ্ড (কুমিল্লা থেকে ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বড়োকামতা) থেকে শাসন করত বলে মনে করা হয়। কুমিল্লা শহরের ১৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কৈলান গ্রামে প্রাপ্ত শ্রধারণ রাতের তাম্রলিপিতে তাদেরকে 'সমতটেশ্বর' বলা হয়েছে। তাঁদের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল 'ক্ষীরোদা' নদীর তীরবর্তী দেব পর্বত।

খড়্গ পরবর্তী যুগে কুমিল্লা অঞ্চল শাসন করত 'দেব' রাজবংশ এবং তাঁদের লিপিতেও ক্ষীরোদা তীরবর্তী দেব পর্বতের উল্লেখ রয়েছে। এ অঞ্চলে পরবর্তী রাজবংশ 'চন্দ্র' দেব তাম্রলিপিতেও 'সমতট' ও দেবপর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং মেঘনা-পূর্ববর্তী কুমিল্লার 'লালমাই' এলাকাই যে সমতট বলে পরিচিত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে নির্দিষ্ট করে সমতটের সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়।[২৭] য়ুয়ান চুয়াং যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা থেকে দেখা যায় সমতট অঞ্চলটা আর্দ্র ও নিম্নভূমি। এর অবস্থান কামরূপের (সিলেটের) দক্ষিণে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা জেলা ছিল সমতটের অন্যতম অংশ। এক সময় এ জনপদের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগনার খাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে করা হয়। ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে শুরু করে মেঘনা মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী ভুখণ্ডকেই সমতট বলে শনাক্ত করা হয়েছে।[২৮] কালপ্রবাহে সমতটের প্রসারের কালে হয়তো কোনো সময় 'সমতট' ও 'বঙ্গ' সমার্থবোধক হয়েছে।[২৯] ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা লিখেছেন :

> 'ব্রহ্মপুত্র নদের কল্যাণে যে অংশটি ব-দ্বীপের আকার ধারণ করেছিল,—তা সমতট নামে অভিহিত হত এবং এখানে সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর প্রশাসন। এখানকার বেশ কিছু অঞ্চল জন-অধ্যুষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে সম্ভবত গুপ্ত সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিকদের অনুমান, এখানে কখনই ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ফলে সংস্কৃতের ব্যবহার বা বর্ণ ব্যবস্থা দুটির কোনটি জনপ্রিয়তা লাভ করেনি এখানে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে এই পার্থক্যটি বেশ লক্ষণীয়। ৫২৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে সমতট এবং তাঁর পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে এক সুসংবদ্ধ রাজত্ব গড়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্যের পাশাপাশি ঢাকা অঞ্চলে গড়ে ওঠে 'খড়্গ রাজ্য'।[৩০]

রাঢ় ও সুহ্ম

রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন পুথি আচারঙ্গসূত্রে।[৩১] খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকে জৈনধর্ম প্রবর্তক মহাবীর স্বয়ং ধর্মপ্রচারার্থে রাঢ় দেশে আগমন করেন।[৩২] শ্রীলঙ্কার

বৌদ্ধ ঐতিহ্য-সংবলিত গ্রন্থ 'দীপবংশ' ও 'মহাবংশ'-এ 'লাল' (রাঢ়–এর সিংহপুরের রাজা বিজয় কর্তৃক শ্রীলঙ্কায় উপনিবেশ স্থাপনের কথা আছে। বাংলার সেন রাজবংশের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্য থেকে এসে প্রথমে 'রাঢ়' অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং ভট্টভবদেবের ভূবনেশ্বর প্রশস্তিতে 'রাঢ়' অঞ্চলকে জনবিহীন শুষ্ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখনও বর্ধমান অঞ্চলে শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান। 'দিগ্বিজয়প্রকাশ' গ্রন্থে রাঢ় দেশকে 'দামোদরোত্তর ভাগে' এবং গৌড়ের পশ্চিমে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবাকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে 'রাল' (রাঢ়) গঙ্গা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত লাখনৌতি রাজ্যের বাম দিকের অংশ বল চিহ্নিত করা হয়েছে। উপরে উল্লেখিত তথ্যাদি থেকে একথা বোঝা যায় যে, 'রাঢ়' বর্তমানের বর্ধমান বিভাগের বিশাল ভূভাগকে নির্দেশ করত এবং ভগীরথীর পশ্চিমে এ ভূভাগ গৌড়েরও পশ্চিমে (দক্ষিণ-পশ্চিমও বলা যেতে পারে) অবস্থিত ছিল। জাও দ্য বারোসের নকশায় এ ভূভাগকেই 'রাঢ়' বলে দেখানো হয়েছে।[৩৩]

রাঢ় জাতিবাচক রাঢ়া শব্দ থেকে উৎপন্ন বলে অনেক পণ্ডিত মত প্রকাশ করলেও এর বলিষ্ঠ কোনো প্রমাণ আজও মেলেনি।[৩৪] নবম-দশম শতক থেকে বিভিন্ন লিপি বা সাহিত্যিক সূত্রে এ জনপদের দুটি অংশের উল্লেখ পাওয় যায় : উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়।[৩৩] রাঢ়ের দক্ষিণ অংশে ছিল সুহ্মভূমি যার দক্ষিণ রাঢ় এবং উত্তরতমঅংশ বজ্জভূমি যা উত্তর রাঢ় নামে পরিচিত হয়েছিল।

মহাকাব্য ও পুরাণসমূহে প্রাচ্যদেশে 'সুহ্ম'-এর নাম পাওয়া যয়। ভীম তাঁর পূর্বদেশ বিজয়াভিযানে 'বঙ্গ'দের পরাজিত করে একে একে তাম্রলিপ্তি, কার্বট, সুহ্ম রাজাকে পরাজিত করেন এবং সমুদ্রোপকূলের জনগোষ্ঠীকে পদানত করেন। এ উল্লেখ থেকে সুহ্মের অবস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব যে সুহ্ম সমুদ্রোপকূল ও তাম্রলিপ্তি বন্দরের নিকটবর্তী ছিল।[৩৬] সুহ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূভাগ ছিল রাঢ় যা জৈন সূত্রে 'লাঢ়' বলেও উল্লেখিত হয়েছে। চৈন আচারঙ্গ সুত্ত'-এ লাঢ় দেশে 'সুবঙভূমি' ও 'বজ্জভূমি নামে দুটি অংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সুবঙভূমি' সুহ্মভূমির রূপান্তর বলে অনুমান করা হয়েছে। তা যদি নির্ভুল হয় তাহলে 'সুহ্ম' রাঢ়েই অংশবিশেষ এবং সম্ভবত দক্ষিণাংশ যা পরবর্তীকালে 'দক্ষিণ রাঢ়' বলে অভিহিত হয়েছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় সুহ্ম ও রাঢ় অভিন্ন বলে মনে করেন। 'বঙগ' ভূম-কে রাঢ়ের উত্তরাংশ বল অনুমান করা হয়েছে।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সর্ব প্রথম সুহ্মের কথা উল্লেখিত হয়। সুহ্মের অন্তর্গত সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে দশকুমারচরিত গ্রন্থে তাম্রলিপ্তির কথা বলা হয়েছে। বৃহৎসংহিতায় সুহ্মের অবস্থান বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে বর্ণিত হয়েছে। এসব তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে পশ্চিম বাংলার সমুদ্র উপকুলবর্তী দক্ষিণ অঞ্চল সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল এবং তাম্রলিপ্তি এক একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।[৩৭]

বর্ধমানের দক্ষিণাংশে হুগলি জেলার বহুলাংশ ও হাওড়া প্রাচীন সুহ্ম জনপদ। পরবর্তীকালে এ অঞ্চল দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত হয়েছিল।[৩৮] দক্ষিণাত্যের চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের (১০১২-১০৪৪) তিরমুলাই লিপিতে তাঁর উত্তর ভারত অভিযানে উড়িয়্যা ও কোশলনাড়ু জয় করে দণ্ডভূক্তির (উড়িষ্যা ও বাংলা মধ্যবর্তী ভুভাগ মেদিনীপুর বালাশোরো অঞ্চল) মধ্য দিয়ে দক্ষিণ রাঢ়ে (তক্কন লাড়ন) আসে। দক্ষিণ রাঢ় থেকে অভিযান যায় 'বঙ্গালদেশ'-এ এবং এরপর উত্তর রাঢ়ে (উক্তির লাঢ়ম) এসে গঙ্গার তীরবর্তী হয়। লিপিসূত্রে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে এটুকু ধারণা করা সম্ভব যে,উত্তর রাঢ় মুর্শিদাবাদ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সম্ভবত অজয় নদী (যা বর্তমানে বর্ধমান জেলার উত্তর সীমা নির্দেশ করে) উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যে সীমা নির্দেশ করত। মোটামুটিভাবে একথা বলা যেতে পারে যে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্তই হয়তো বিস্তৃত ছিল 'রাঢ়' দেশ। 'সুহ্মোত্তর' বা 'ব্রহ্মোত্তর' নামক জনপদ হয়তো উত্তর-রাঢ়ের অংশবিশেষকে নির্দেশ করত।[৩৯]

হরিকেল

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং সপ্তম শতকে সিংহল থেকে জলপথে হরিকেল এসছিলেন এবং তিনি হরিকেলকে পূর্বভারতের পূর্বপ্রান্তবর্তী অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বর্ণনায় সমতটেরও উল্লেখ আছে। এ থেকে যুক্তিসংগতভাবে অনুমান করা যায় যে, হরিকেল রাজ্য সপ্তম শতকে বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থান ছিল। চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি এ অনুমানকে আরো দৃঢ় করে।[৪০] এছাড়া হরিকেল নামাঙ্কিত কিছু মুদ্রা চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এসব মুদ্রার লিপির সঙ্গে আরাকানি লিপির সাযুজ্য আছে। এছাড়া রাজশেখরের কর্পুর-মুঞ্জরী গ্রন্থে পূর্বদেশীয় হরিকেল জনপদের নারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। এসব তথ্য থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেন চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন জনপদই প্রাচীন হরিকেল।

আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট এবং হরিকেল তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলে উল্লেখিত হয়েছে। চন্দ্ররাজ বংশের ক্ষমতা সমতট-বঙ্গ এলাকায় বিস্তার লাভ করার ফলে হয়তো দশম একাদশ শতকে হরিকেল নামের পরিধি বিস্তার লাভ করেছিল এরূপ মনে করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।[৪১] সম্ভবত এ কারণেই ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল রাজ্যের ক্ষমতার আধার হয়েছিলেন। ডাকার্ণব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে সিলেটকে হরিকেল বলা হয়েছে। এ থেকে পণ্ডিতরা সিলেট পর্যন্ত হরিকেল জনপদ সম্প্রসারিত হবার ইঙ্গিত করেছেন।[৪২]

প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র

বাঙালির রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ মেলে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের গ্রিক, লাতিন ও মিশরীয় লেখকদের বিভিন্ন লেখায়। গ্রিক ও লাতিন লেখকরা আলেক-জান্ডারের ভারত অভিযান সম্পর্কে সুলিখিত সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এসব লেখাতেই আমরা পূর্বভারত সম্পর্কে আলোচনা পাই। তাঁরা বিপাশা নদীর পূর্বতীরে প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র (গঙ্গারাঢ়) নামে দুটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রে কথা আমাদের জানিয়েছেন। প্রাচ্যরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র এবং গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গা। ভূতত্ত্ববিদ টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় যে রাজধানী নগরী গঙ্গা সামুদ্রিক বাণিজ্যের বৃহৎ বন্দর ছিল। বন্দরটি সম্ভবত কুমার নদীতীরেই অবস্থিত ছিল।

প্রাচীন ইউরোপীয় লেখকদের বিবরণী থেকে জানা যায় গঙ্গারাষ্ট্রের অবস্থান ছিল গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীরে, আর প্রাচ্যরাষ্ট্র ছিল গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমদিকের সম্পূর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে। এই প্রাচ্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল এককালের বিখ্যাত তাম্রলিপ্তি বন্দর। এঁদের লেখা থেকে এ-ও জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক নাগাদ প্রাচ্য ও গঙ্গা এই দুই জনপদরাষ্ট্র এক রাজার অধীনে শাসিত হচ্ছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন ঔগ্রসৈন্য—উগ্রসেনের পুত্র। এঁরা নন্দবংশের রাজা। ইনি কাশী, মিথিলা, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য জয় করেছিলেন। শোনা যায়, তাঁর সময় নন্দবংশের রাজকোষ ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল; এবং এ সংবাদ আলেকজান্ডারের কানেও পৌঁছায়।

এ সময় ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে সর্বপ্রধান রাষ্ট্রশক্তি বা কেন্দ্র ছিল মগধ : বর্তমান মধ্য ও দক্ষিণ বিহার জুড়ে অবস্থিত এই রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান তার বাণিজ্যিক ও রণনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। মগধ ক্রমে ভারত-সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত ভারত সভ্যতার এক প্রবাহ পথকে মুক্ত করে স্ফূর্তি দিয়েছে মগধ। এবং ইতিহাসে এক পর্যায়ে দেখা যায় মগধ উত্তর বা পশ্চিম ভারতের চেয়ে প্রাচ্য ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। এটা বিশেষভাবে জোরদার হয় বৌদ্ধ ও জৈন—ভারতবর্ষের এই দুই মহান ধর্মদর্শনের উৎস ও পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্র হিসেবে। বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর আমলে না হলেও আমরা নিশ্চিত জানি যে অশোকের সময় এবং তার বহুকাল পরেও, অঙ্গ বঙ্গ-মগধ-পুণ্ড্রের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য বিরাজ করছিল।[৪২]

এসব জনপদ ছাড়া আরো কিছু উল্লেখযোগ্য জনপদের নাম ঐতিহাসিক কালের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন সমতটের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ভৌগোলিক অঞ্চল 'পট্টিকেরা'; বঙ্গের সঙ্গে 'বঙ্গাল'। এছাড়া রয়েছে 'চন্দ্রদ্বীপ' ও তাম্রলিপ্তি। মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ ছিল বর্তমান বরিশাল জেলার অংশবিশেষ। প্রাচীন বাংলার প্রসিদ্ধ জনপদ ও বাণিজ্যকেন্দ্র ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্তি অন্যান্য জনপদ থেকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন জনপদগুলোর সীমারেখা নির্দিষ্ট করা যেমন কঠিন; তেমনি তাঁর সীমার বিস্তার ও সংকোচনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। কোম বা জনের নাম থেকে এসেছে তাদের বসবাস কেন্দ্রের আঞ্চলিক নাম। জনকে কেন্দ্র করে এক একটি রাষ্ট্র বা রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। বস্তুত বাংলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই জনপদগুলোর বৈচিত্র্য নিরূপণ করত। বিশেষত নদীর প্রবাহকে কেন্দ্র করে জনপদগুলো স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠত। নদীসমূহের ভাঙা-গড়াও অনেক সময় কোনো কোনো জনপদের সংকোচন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করত। তবে সর্বাপেক্ষা প্রভাব ফেলে রাজনৈতিক ক্ষমতার উন্মেষ ও ক্রমাবনতিতে।

ভূ-সীমা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, কর্ম-কীর্তি

মহাভারত ও রামায়ণ প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ দুইটি মহাকাব্য। এ দুইটি মহাকাব্যের গল্প বা কাহিনী প্রায় তিন হাজার বছরের পুরানো। মহাভারতের দ্রৌপদী'র স্বয়ংবর সভায় বাংলার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের রাজাদের উপস্থিতির কথা আছে। প্রাচীন বাংলার রাজবংশের নাম রামায়ণেও পাওয়া যায়। ভারতে মহাকাব্য দুইটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়। পনেরো-ষোল শতকে কাব্য দুইটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে কাব্য দুইটি আবহ ও চরিত্রাবলি বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও চিন্তাদর্শের বিম্বিত রূপ। জৈনধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ আছে মহাবীর স্বয়ং ধর্মপ্রচারার্থে বাংলায় আগমন করেছিলেন (খ্রি. পূ. ৫০০)। জৈন আচারঙ্গসূত্তে বর্ণিত মহাবীরের প্রতি রাঢ় অঞ্চলের লোকের আচরণ এই প্রমাণ করে যে, হয়তো কৌম প্রধানের নেতৃত্বে তারা তখনও যৌথ জীবনযাপন করত। ফলে আর্যরা তাদের দস্যু ও পাখি বলে অবজ্ঞা করত; তাদের স্পর্শও আর্যদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। 'পাণ্ডববর্জিত' দেশ বলে এর নিন্দার মধ্যেই এর অস্তিত্বের প্রতি ঈর্ষার স্বাক্ষর মেলে। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মহাবীর স্বয়ং এবং জৈনবৌদ্ধ শ্রাবক শ্রমণ ভিক্ষুরাই প্রথম গৌড়ে-রাঢ়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে আগমন করেন।[৪৪] প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত ভাষাবিদ পাণিনির ব্যাকরণের ব্যাখ্যাকার পতঞ্জলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বঙ্গভূমির উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া বেদ, পুরাণ, লোককাহিনী ও বিভিন্ন লোকগাথায় বহুকাল পূর্ব থেকে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম বা রাঢ়ের কথা উল্লেখিত হয়ে আসছে।

গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আলেকজান্ডার গঙ্গারাষ্ট্রের (গঙ্গারাঢ়? গঙ্গাঋদ্ধি) অধিবাসীদের বীরত্বের কাহিনী শুনেছিলেন। গঙ্গারিডি নামক পরাক্রমশালী এ দেশ প্রাচীন বাংলার একটি অঙ্গরাজ্য। গঙ্গারিডির ছিল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। যে দেশের 'কেবল রণহস্তীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার'। অনুমান করা স্বাভাবিক যে এ সংবাদ আলেকজান্ডারের আগ্রাসন রোধ করতে সহায়ক হয়েছিল। টমেলি ২০০ খ্রি.

পূর্বাব্দে তার বই ইন্ডিকাতে তাম্রলিপ্তিকে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তমলুক) এক সমৃদ্ধ বন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। টমেলি ও প্লিনির বর্ণনা অনুযায়ী আলেকজান্ডারের সময় গঙ্গারিডি রাজ্যের উত্তর সীমা পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; আর আলেকজান্ডারের আস্তানা ছিল বিপাশা নদীর পশ্চিম তীর অবধি। 'মোটামুটিভাবে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানকালে (৩২৬ খ্রি. পূ.) গঙ্গাহৃদয় বা গঙ্গাহৃদ নামে গাঙ্গেয় বাংলা একটি রাজ্য ও প্রবল রাজশক্তি ছিল বলে গ্রিক সূত্রে সংবাদ মেলে। এ সময়কার বাংলা রাজের নৌশক্তি ও গজশক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। হয়তো পাটলিপুত্রের রাজারা তথা নন্দ মৌর্য-সুঙ্গ-কণ্ব বংশীয়রা রাঢ়-সুহ্ম-পুণ্ড্র শাসন করেছেন ৩১৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি।'[৪৫]

ওভিদ, দিয়োদোরাস, কার্টিয়াস, প্লুটাক,সলিনাস প্রমুখের লেখায় গাঙ্গেয়ভূমি ও রাঢ়ের স্বচ্ছন্দ উল্লেখ দেখে অনুমান করা স্বাভাবিক যে সময়কালে ওইসব দেশে বাংলার সুখ্যাতি ছিল। সুখ্যাতির প্রধান কারণ ছিল বাংলার শিল্পপণ্য। বিশেষত উন্নততর মসলিন কাপড়, মশলা ও মুক্তার জন্য।[৪৬]

চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৪০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত তাম্রলিপ্তির (বর্তমান ভারতের মেদিনীপুর জেলার তমলুক) বন্দর নগরে পৌছোন। তাঁর বর্ণনা মতে তাম্রলিপ্তি দেশের রাজধানী। তিনি এদেশে অনেক বৌদ্ধবিহার দেখতে পান। হিউ-এন-সাং রাজা শশাঙ্কের আমলে সাত শতকের প্রথমার্ধে (আনু ৬৩৮) বাংলাদেশে আসেন। তিনি কামরূপ এবং সমতটে(কুমিল্লা-নোয়াখালি) যান। তাঁর মতে সমতট সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্য এবং এটা ৬০০ মাইল দীর্ঘ। এ রাজ্যে ৩০টি বৌদ্ধবিহার এবং শতাধিক দেবমন্দির দেখতে পান। তাঁর বর্ণনা মতে জানা যায়, বুদ্ধদেব স্বয়ং সমতট রাজ্যে আগমন করেন এবং স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রচার করেন। এই পর্যটক সমতট থেকে ১৮০ মাইল পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি পৌছেন এবং তাম্রলিপ্তি থেকে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)। তাঁর বিবরণে জানা যায় বাংলাদেশ কজঙ্গল,পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চিনা পর্যটক ইৎসিং ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্তি বন্দরে উপস্থিত হন। তাঁর বর্ণনা মতে, এ বন্দর সমুদ্রের অতি নিকটে, একটি বিশাল নদী নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী মোহনা দিয়ে বড়ো বড়ো জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করত। অর্থাৎ খ্রিস্টীয় সাত শতকের দিকে যে তাম্রলিপ্তি একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এটা অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ।

পর্যটক ইবনেবতুতার, মেগাস্থিনিস,ফা-হিয়েন প্রমুখের লেখায় বাংলার শিল্পপণ্য ও বাণিজ্যসামগ্রীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ উল্লেখ দেখা যায়। বাংলার নৌবাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের কথাও এঁরা বারবার উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল। ভৌগোলিক সমীক্ষায় বগুড়া পর্যন্ত উপসাগরের সীমানা শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অসংখ্য নদ-নদী-হাওড়-বিল বেষ্টিত বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল বছরের অন্তত ছয় মাস জলমগ্ন ও প্লাবিত হয়ে

থাকত। নৌশিল্প এবং কৃষির জল ঠেকানো ও নিষ্কাশনের জন্য উন্নত প্রযুক্তির বাঁধ নির্মাণ ছিল জীবন সংগ্রামের অপরিহার্য করণীয়। 'আল' শব্দযোগে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা হয়েছে–আবুল ফজলের এ বক্তব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানেই। পর্যটকদের বর্ণনায় নৌশিল্প ও বাঁধ নির্মাণের প্রাযুক্তিক জ্ঞানের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গ ড. মমতাজুর রহমান তরফদার একটি যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন :

> 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো দেশ, সিংহল, পশ্চিম-ভারতীয় উপকূলের কুইলন ও মালদ্বীপ বাংলা থেকে সরবরাহ করা চালের উপর নির্ভরশীল ছিল। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যে ব্যাপক বাণিজ্য সম্ভব হয়েছিল। কৃষিকার্যের প্রক্রিয়ায় অথবা সেচ-ব্যবস্থায় উন্নত পর্যায়ের প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধানচালের পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন। ইবনবতুতা আল-নাহার উল-আজরাক বা নীল রঙের (মেঘনা অথবা সুরমা) নদীর উভয় পাড়ে জলচক্র (Water wheel) সক্রিয় অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যে শব্দটি বহুবচনে ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে 'অল-নওয়ায়ীর' যার একবচন 'আল-নওরা', ইংরেজি noria বা water wheel। এটি ছিল একটি পশুচালিত আবর্তমান চক্র যার প্রান্তভাগ জুড়ে কতকগুলি পাত্র বাঁধা থাকত। পূর্ব বঙ্গের কর্ষণযোগ্য সমতল অঞ্চলে যন্ত্রটি বোধ হয় সাফল্যের সঙ্গে জল সেচনের কাজে লাগত। জলচক্রের হিন্দি নাম 'রেহট', যা সংস্কৃত 'অরঘট্ট' শব্দসমষ্টি থেকে এসেছে। সাম্প্রতিক কালেও এই সেচযন্ত্রটিকে উত্তরবঙ্গে ও বিহারে সক্রিয় অবস্থায় দেখা গেছে। যন্ত্রটি ইরানি জলচক্র বা Persian wheel থেকে আলাদা। ইরানি জলচক্রে gearing mechanism বা বেগ সৃষ্টির জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে।[৪৭]

পর্যটকদের বর্ণনায় নৌশিল্প ও বাঁধ নির্মাণের প্রাযুক্তির জ্ঞানের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। এ সূত্রে আমরা দুটি প্রবাদের কথা স্মরণ করতে পারি : 'ধান-নদী-খাল এই তিনে বরিশাল' বা 'হাওড়-নদী-মোষের শিং এই তিনে ময়মনসিং'। বিশালকায় বরিশাল অঞ্চল নদী আর খালে ছিল পরিপূর্ণ। সেখানকার মানুষের নিত্যত্রাসের বিষয় ছিল জলের কুমির, ডাঙার বাঘ। ময়মনসিংহ এলাকা হাওড়-বিলের এলাকা। এই সেদিনেও পাবনার চলন বিল ছিল সমুদ্র সদৃশ্য। সমগ্র বাংলাদেশ–নদী, হাওড়, বিল ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নদীতে কুমির ও ডাঙায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ নানা প্রজাতির বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীকুলে ছিল ভরা। এরা ছিল বাংলার মানুষের নিত্য সাথী। এসব হিংস্র প্রাণীকুলের সাথে সংগ্রাম করে বাঙালিকে বাঁচতে হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহের একটি 'কৃষি সঙ্গীতের' (লোকগীতির) উদাহরণ নিতে পারি। কার্তিক ব্রত উপলক্ষ্যে সমস্ত রাত্রি জেগে গায়েনরা কৃষি গান গেয়ে থাকেন। রাত্রি যখন শেষ প্রহর তখন তারা হাতে তির-ধনুক নিয়ে শস্য খেতে বাঘ শিকার করার অভিনয় করে। সে উপলক্ষ্যে এ গান গাওয়া হয় :

সাজিল কামিনীকুল কানে দিল কন্নফুল,
মারে তীর হুমকা বাঘের গায়ে রে।

রেবতী আর চন্দ্রকলা, এক হাতে ধনু ছিলো,
আর হাতে বাইছা তুলে বাণ রে ॥

এখানে মাতৃতান্ত্রিক কোনো অরণ্যচারী জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কালে সে সমাজের মেয়েরাও বাঘ শিকার করত। 'এক হাতে ধনু ছিলো, আর হাতে বাইছা তুলে বাণ' এ দেশের নারী চরিত্রের এই গৌরবময় দিকটির কথা লোকসাহিত্যে ধারণ করে আছে। এগুলো আদিবাসী সমাজের চিত্র।[৪৮] বাংলাদেশে বিভিন্নকালে যেসব মানবগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আমাদের অনেক লোকগীতির মধ্যে বিধৃত আছে। যেমন সারিগান এবং নৌকা বাইচের গান কোনো সমুদ্রচারী জাতির সংস্কৃতির কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং আমরা একথা নিঃসংকোচে এবং নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কোনো সমুদ্রতীরবর্তী জাতির মতোই সাহসী, উদ্যোগী, কর্মনিষ্ঠ ও সংগ্রামশীল ছিল; এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্রে তারা ছিল পৃথিবীর অনেক জাতির পুরোবর্তী।

পৌরাণিক আখ্যান, দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্ম এবং ইতিহাসের প্রত্ন-উপদান থেকে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আসমুদ্রহিমাচলে নির্মীয়মাণ বাংলার বৃহৎ অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক নাগাদ প্রাচীন গোষ্ঠীভিত্তিক কৌমসমাজ জনপদভিত্তিক রাষ্ট্রে সুসংহত হচ্ছিল। বিভিন্ন সাহিত্য ও আখ্যানে এ সময়কার সামন্ত- সমাজ, রাজতন্ত্র এমনকি প্রজাতন্ত্রেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সময়ে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল মগধ। বর্তমান মধ্য ও দক্ষিণ বিহার জুড়ে অবস্থিত এ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান তার বাণিজ্যিক ও রণনীতির উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। সম্রাট অশোকের সময় এবং তার বহুকাল পরেও অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ ও পুণ্ড্রের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বিরাজ করছিল। তবে গুপ্ত যুগের পূর্বে বাংলার ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস প্রণয়নের উপাদান পাওয়ার সম্ভাবনা আজও দেখা যাচ্ছে না। গুপ্ত যুগের উত্থান শুরু হয় ২৭৫ খ্রিস্টাব্দে। সমুদ্র গুপ্তের শাসনামলে (৩৩৫-৩৮০ খ্রি.) কেবল সমতট ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলো রাজ্য বা জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের আগে বাংলা জনপদে মৌর্য শাসনের অকাট্য প্রমাণ মেলে বগুড়ার মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয় ২৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট অশোকের অবসর গ্রহণ থেকে।

কুমার গুপ্তের আমল থেকে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলায় গুপ্ত রাজত্বের কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। দেশে সোনা ও রূপার টাকার প্রচলন হয়; নাগরিক জীবনে বিলাসব্যসন বৃদ্ধি পায়। দেখা যায় সমাজ জীবনে কৃষির চেয়ে বাণিজ্যের প্রাধন্য। নগর ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিল্পের কেন্দ্র। নাগরিকরা বিলাসব্যসনে সময় কাটাতেন। এ সমৃদ্ধির কথা আমরা জানতে পারি সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এ, বিদ্যাপতির 'পুরুষ

পরীক্ষায়' এবং বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'। প্রায় সমকালেই বাণিজ্যের মতো কৃষিতেও বাংলা সমৃদ্ধি অর্জন করে তারও তথ্যচিত্র পাওয়া যায়। একটি শ্লোক থেকে জানা যায় ধান খেতে সেচ দেবার জন্য সেকালে খাল কাটা হত এবং আল বাঁধা হত—'শালি ধানের জন্য খাল কাটা হয়, তার জল খাওয়া হয়, হাত মুখ ধোয়া হয়, ধানেরও বৃদ্ধি ঘটে।' উনিশ শতকের ইংরেজ প্রকৌশলী উইলকক্স কর্তৃক এ অনুমান সঠিক বলে সমর্থিত হয়। এছাড়া চিনা পর্যটক পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানচর্চায় পাটলিপুত্র ও তাম্রলিপ্তিতে ৫ বছর অতিবাহিত করেন। এ থেকে প্রাচীনকালেও এ অঞ্চলে জ্ঞানচর্চার ইঙ্গিত মেলে।

পঞ্চম শতকেই দুর্ধর্ষ হুনরা ভারত আক্রমণ করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল করে দেয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার এ সুযোগ বঙ্গ ও গৌড় স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। এ তথ্যের প্রামাণ্য হিসেবে ৭টি তাম্রশাসন আষ্কিার করা সম্ভব হয়েছে। ষষ্ঠ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত তিনজন মহারাজাধিরাজের সংবাদ পাওয়া যায়, যাঁদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ শাসকত্রয়ের নাম— গোপালচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও নরেন্দ্রাদিত্য সমাচার দেব। সমতট অঞ্চলে প্রায় সমকালেই একটি বৌদ্ধ রাজবংশের খবর পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা অনুমান করেন এঁরা কোনো পার্বত্য কোমের প্রতিনিধি ছিলেন।

ষষ্ঠ শতকের শেষে অথবা সপ্তম শতকের প্রথম দশকে শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ৬০০-৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একজন বিখ্যাত রাজা। বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা তাঁর অধীনে ছিল কিনা জানা যায় না। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালি রাজা যিনি উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও হস্তক্ষে করেন বলে মনে করা হয়। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা লিখেছেন :

> উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অংশে (যা বর্তমানে বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত) সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই লিপির প্রচলন ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। একটি লিপিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের জন্য বেশ কিছু আবাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবাসনগুলিতে মুদ্রা ও খাদ্যশস্যের এক মজুত ভাণ্ডারের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। উৎপাদনের একাংশ রাজাকে কর এবং উপহার হসেবে দেওয়া সামর্থ তখন কৃষকদের ছিল। বঙ্গভূমির অধিবাসীরা প্রাকৃত ভাষা জানতেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও অনুশাসনের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপকূলবর্তী জেলা নোয়াখালিতে একটি উৎকীর্ণ লিপি উদ্ধার করা হয়েছে যার থেকে বোঝা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে এখানকার মানুষ প্রাকৃত ও ব্রাহ্মী লিপিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত বঙ্গভূমির অন্যান্য অংশে ঐতিহাসিকেরা লিপির সন্ধান পাননি। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঁকুড়া জেলার গোকর্ণ অঞ্চলে 'মহারাজা' উপাধিধারী এক শাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত জানতেন এবং বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। সম্ভবত এই দেবতার উদ্দেশ্যে তিনি একটি গ্রামও উৎসর্গ করেছিলেন।
>
> পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) সংস্কৃত শিক্ষা প্রাধান্য বিস্তার করে। ৫৫০ খ্রিস্টাব্দেব পরে গুপ্ত বংশীয়

শাসকেরা উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন এবং একাংশ যায় কামরূপ শাসকদের হাতে। সামন্ত মহারাজা নামে বর্ণিত স্থানীয় শাসকেরা নিজস্ব প্রশাসন যন্ত্র ও সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। হাতি, ঘোড়া, পদাতিক ও নৌ-বাহিনীর সাহায্যে গঠন করা হয়েছিল সেনা দলগুলো। কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায়ের স্বাধীনতাও এঁদের ছিল। ৬০০ শতাব্দীতে বঙ্গভূমির নাম হয় গৌড়। হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্ক নিজের অধিকার কায়েম করেন এখানে।[৪৯]

শশাঙ্ক ঠিক বাঙালি ছিলেন না, তিনি ছিলেন মগধের অধিবাসী। কিন্তু সে সময় বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি পরিধি ছিল আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। সে অর্থে মগধ বাংলার সীমাবহির্ভূত নয়। বিশেষত সমকালে মগধ ও বাংলার সংস্কৃতি গভীরভাবে ঐক্যসূত্রে গ্রোথিত ছিল। শশাঙ্ক একটি অখণ্ড জাতীয় সত্তা হিসেবে গৌড় সাম্রাজ্য পতিষ্ঠা করেন। কর্ণসুবর্ণে—বর্তমান মুর্শিদাবাদের রাঙামাটিতে রক্তমৃত্তিকায় ছিল তাঁর রাজধানী।[৫০] তবে উড়িষ্যার কঙ্গোদ প্রদেশের মহারাজ মহাসামন্ত মাধবরাজের শিলালেকে রাজাধিরাজ বলে শশাঙ্কের উল্লেখ থেকে উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চল অবধি তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতির কথা সমর্থন করেছেন অনেক ঐতিহাসিক। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সমগ্র গৌড়, মগধ-বুদ্ধগয়া এবং উৎকল ও কঙ্গোদ দেশের অধিপতি ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় ও মগধের অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয় এবং ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শশাঙ্কের সাম্রাজ্য ভেঙে তছনছ হয়ে যায়।[৫১] এবং বাংলার রাজনৈতিক আকাশে দেখা দেয় মেঘের ঘনঘটা। শশাঙ্কের রাজ্যসীমা ও তার শাসন বিষয়ে উপাদানের অভাবে বেশি কিছু জানা যায় না; হয়তো আর কোনো দিন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নাও হতে পারে।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (আনু ৭৫০-৭৭০) কলহপূর্ণ ও পরস্পর হানাহানি বা 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থায় বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতি হন পালরাজ বংশের স্থপতি গোপাল (৭৫০৭৭৫ আ)। শশাঙ্কের পরে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রজারা বিশেষত সামন্তরা স্ব স্ব স্বার্থে মাৎস্যায়নের অবসানকল্পে এই সামন্তকে সার্বভৌম রাজা করে অনুগত্যের স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। গোপাল বাঙালি ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। তবে সন্ধ্যাকারনন্দীর রামচরিতের সাক্ষ্যে গোপালের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্ধন[৫২] তাঁর রাজত্বকালের বিশদ বিবরণ জনা যায় না। পণ্ডিতরা অনুমান করেন তিনি তাঁর রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ এবং মগধ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁর পুত্র ধর্মপাল (আনু ৭৭০-৮১০), পৌত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০) পাল শাসনকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যান এবং রাজ্যসীমা পশ্চিম দিকে বিস্তৃত করেছিলেন। এঁদের সময় এদিককার রাজাদের সামনে আদর্শ ছিল 'সকলোত্তরাপথনাথ' বা উত্তর ভারতের সকল জনপদের অধিপতি হওয়া। ফলে এঁরা সেদিকে সীমানা বাড়িয়ে চলেন। ধর্মপালের সময় ভোজ (বর্তমান বেরারের অংশ), মৎস্য (আলওয়ার এবং জয়পুর-ভরতপুরের অংশ), মদ্র (মধ্য পাঞ্জাব),

কুরু (পূর্ব পাঞ্জাব), যদু (পাঞ্জাবের সিংহপর), যবন (সম্ভবত পাঞ্জাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোনো আরব-অধিকৃত ভূখণ্ড), অবন্তী (বর্তমান মালব), গান্ধার (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা) এবং কীর (পাঞ্জাবের কাংড়া জেলা) প্রভৃতি উত্তরাপথের রাজ্য তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। ধর্মপাল সম্ভবত নেপালও জয় করেছিলেন। দেবপাল পিতার যোগ্য উত্তরাধিকার ছিলেন। তিনি পালরাজ্যের সীমান্ত পূর্বে ও পশ্চিমে আরো বৃদ্ধি করেন। দেবপাল হুন গর্ব খর্ব করে দ্রাবিড় ও গুর্জর প্রতিহারের দর্প চূর্ণ করে আসমুদ্রমোদিনী পদানত করেন। দেবপাল ৪০ বছর (৮১০-৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্ব করেন এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দেন। তিনি উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত থেকে কর ও উপঢৌকন পেতেন। তাঁর খ্যাতি এতদূর ছড়িয়েছিল যে, জাভা, সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন নালন্দায় অনুদান দেওয়ার অনুমতি চেয়ে। দেবপালের পর থেকেই পালসাম্রাজ্যে চিড় ধরতে শুরু করে। পুনরায় মহীপালের শাসনামলে হৃতগৌরব ফিরে পাওয়া পর্যন্ত একশো বছরেরও কিছু বেশি সময় কেটে যায়। ৯৮৮ থেকে ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছরের শাসনামলে মহীপাল সাধারণ বাঙালির সমর্থন পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। বাদাল স্তম্ভলিপির প্রমাণে বলা চলে দেবপাল অন্তত কিছুকালের জন্য কম্বোজ থেকে বিন্ধ্যপর্বত এবং প্রাগজ্যোতিষপুর ও পশ্চিম সাগর অবধি তাঁর শাসন বা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[৫৩] বারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের বংশলতিকা পেলেও তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এগারো শতকের মাঝামাঝি স্থিত হয়ে আসে। পাল রাজাদের রাজ্য সীমার সঠিকতাও আজ অবধি নির্ণয় করাা সম্ভব হয়নি। তবে পালবংশ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মপালের আমলে উত্তর ভারতে পাঞ্জাব অবধি ছিল তার রাজ্যের বিস্তার। বিক্রমশীল, নালন্দা, উড্ডীয়াগ ওদন্তপুরী প্রভৃতি ছিল পাল রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র। তাঁরা একটি সুষ্ঠু সমাজ নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতি গঠনের ঊষাকালের সূচনা তাদেরই কীর্তি।

আনুমানিক ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে মদনপালের মৃত্যুর সাথে সাথে পালরাজাদের প্রায় চারশত বছরের গৌরবময় রাজত্বের ইতি ঘটে। পালরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। তাদের শান্তি পূর্ণ শাসন ব্যবস্থায় সর্বদাই সহাবস্থান ও সমন্বয়ের আবহ বিরাজ করত। সেজন্য শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্যসহ মানবিক সব ক্ষেত্রেই সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল। সে দিক থেকে পালযুগকে বাঙালির উজ্জীবনের কাল বলা যায়। বাংলার এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল শক্তি হল ধর্মীয় সমন্বয় ও সহিষ্ণুতা। তাদের ভূমিদানপত্রে দেখা যায় শিব-বিষ্ণু প্রভৃতি মন্দিরে ভূমি দান করা হয়েছে। এ সময় থেকে বৌদ্ধকে দশাবতারের একজন হিসেবে ধরা হতে থাকে।[৫৪] পালদের

উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে বাংলার লোকায়ত আচার বিশ্বাসের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। পাহাড়পুর ময়নামতীর অসংখ্য পোড়ামাটির কাজ থেকেও এটা বোঝা যায়। এসব চিত্রে সাধারণ সমাজ জীবনই প্রতিভাত হয়েছে। পাল যুগের এই মানবিক কর্মবোধ ও প্রাসঙ্গিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সেকালে সারা ভারতবর্ষ এবং এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পালদের সময় সংস্কৃত ও পালি ভাষায় শাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চা প্রসার লাভ করে। প্রাচীন এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নালন্দা ছিল পালদের রাজ্যসীমার অন্তর্গত এবং এ বিদ্যাপীঠ তাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলত। নালন্দা বিদ্যাপীঠের আচার্য শীলভদ্র ও পালযুগের কৃতী মানুষের আদর্শ অতীশ দীপঙ্করের নাম ভারতবর্ষের এমনকি পৃথিবীর জ্ঞান-শিক্ষার ইতিহাসে আজও দীপ্তিময়মম, যা মানব ইতিহাসে জ্ঞানচর্যার ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল সোনালি সকালের নিশানা দেখায়। ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, শিল্পকলা, সেতু নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ সবই ছিল তাঁর জ্ঞানচর্যার অধিভুক্ত। শতাধিক বই তিনি লিখে গেলেও মানব জাতির দুর্ভাগ্য কালের গর্ভে তা সবই হারিয়ে গেছে।

আমরা আগেই জেনেছি নবম-দশম শতকে বাংলাভাষা প্রাচীন খোলস বদলিয়ে তা নিজস্ব ঢং-এ পা-পা করে চলতে শুরু করেছে—এ সময় চর্যাগীতি ও দোঁহাকোষের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল যাত্রা শুরু হয়েছে। এ সময় বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা বিশেষত বৌদ্ধ দর্শন, তন্ত্রমতবাদ, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, ভাববাদ ও বস্তুবাদের সহাবস্থান এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সময় চিকিৎসা ও ভেষজবিজ্ঞান, নৌ-নির্মাণ ও চালনা, ব্যাংকিং ও অর্থশাস্ত্রের চর্চা হত। উত্তর রাঢ়ার ভট্ট ভবদেব বহু বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন—গণিত, জ্যোতিষ, সমুদ্রবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ও অস্ত্রবিদ্যায় ভট্ট ভবদেব তাঁর কালে অদ্বিতীয় ছিলেন। সংস্কৃত কাব্যে শ্রীধর দাস, বাচস্পতি, অশ্বঘোষ, সন্ধ্যাকর নন্দী প্রমুখের কীর্তি আজও অম্লান।[৫৫]

পাল বংশের গৌরবদীপ্ত রাজা মহীপালের সময় বাঙালি তার দেশ ও রাষ্ট্রের আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা দেখতে পেয়েছিল। তাই মহীপালের গৌরবকীর্তি লোকমুখে চড়িয়ে পড়েছিল যা 'মহীপালের গান' নামে লোকগীতির একটি প্রকার হিসেবে চিহ্নিত। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' এ প্রবাদটি আজও বাঙালির মনে অবিস্মৃত। সমকালের বহু নগর ও দিঘির সঙ্গে মহীপালের নাম জড়িয়ে আছে।[৫৬] ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মত অনুসরণে বলা যায়, পালরাজত্বের এই চারশো বছর বাঙালির ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই যুগেই হয়েছে আজকের বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির গোড়াপত্তন। আর্যপূর্ব ও আর্য সংস্কৃতিকে মিলিয়ে বাঙালির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই যুগে তার ভিত তৈরি হয়ে যায়। বাঙালির স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ, বাঙালির এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি পালরাজত্বের এই চারশো বছরের মধ্যেই গড়ে ওঠে। বাংলার ভৌগোলিক সত্তা এ যুগেই গড়ে উঠেছিল। বাংলা লিপি ও ভাষার গোড়া খুঁজতে গেলেও এই চারশো বছরের মধ্যে খুঁজতে হবে।

বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-বহির্ভূত স্মৃতি ও আচার, আর্য ও আর্য-বহির্ভূত সংস্কার ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ, পুরাণ, পূজা, শিক্ষা ও আদর্শ, দেবদেবী সমস্ত পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করে পরস্পরে মিলেমিশে এক বিরাট সামাজিক সমন্বয় গড়ে তুলেছিল।

পাল আমলের গোড়ার দিক থেকেই বাংলায় সামন্ত প্রথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। একাদশ-দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্রের সবকটি লক্ষণই ফুটে উঠেছিল। আবার সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাষ্ট্রে জন্ম নিয়েছিল আমলাতন্ত্র। এগুলো গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায়। রাজকর্মচারীদের তালিকায় ভূমি ও কৃষি সংক্রান্ত পদই বেশি দেখা যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে সমাজে কৃষি নির্ভরতা বেশি লক্ষ করা যায়। যে সমাজে জমিই জীবিকার প্রধান উপায়; সেখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।[৫৭]

একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত সেনবংশ নামে এক নতুন রাজ বংশের উত্থান হয়। হেমন্ত সেন এ বংশের প্রথম রাজা। তাঁর পুত্র বিজয় সেন (আ. ১০৯৮-১১৬০) সমগ্র বাংলাদেশে সেন বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেন। বিজয় সেন দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গেও সেন আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে একাধিপত্যে এনেছিলেন—এটা তাঁর অনন্য কৃতিত্ব। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন (আ. ১১৬০-১১৭৮) পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন এবং রাজ্যসীমা মগধ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন। বল্লাল সেন বাংলার ইতিহাসে জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসেবে সমধিক খ্যাত। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন (আ. ১১৭৮-১২০৫) নিজে পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তাঁর রাজসভায় বহু পণ্ডিত, কবি ও গুণীব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি নদিয়া আক্রমণ (১০ মে, ১২০৫)[৫৮] করলে লক্ষ্মণ সেন তা প্রতিহত না করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চলে যান। অনুমান করা হয় বখতিয়ার লক্ষ্মণ সেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে দুর্গম অরণ্য পথে অনুপ্রবেশ করে এবং অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে নদিয়ায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন প্রায় ২৫ বছর দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে (আ. ১২০৫-১২৩০) রাজত্ব করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে চন্দ্ররাজবংশ প্রায় দেড়শত (৯০০-১০৫০) বছর রাজত্ব করেন। এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজধানী ছিল কুমিল্লার দেবপর্বতে। তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে (৯৩০-৯৭৫)। একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে বঙ্গে বর্ম রাজবংশের উত্থান ঘটে। ভোজবর্মা বর্ম রাজবংশের শেষ রাজা। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি গৌড়ের বিজয় সেনের হাতে বর্ম রাজবংশের পতন ঘটে।

ত্রয়োদশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাংলায় সেন রাজত্বের খণ্ডিত অস্তিত্ব টিকে থাকলেও বলা চলে তাদের খ্যাতি ও বিকাশ দ্বাদশ শতক পর্যন্তই। কেন্দ্রীয়

শক্তির দুর্বলতা এবং সামন্তদের মধ্যে বিরোধের সূত্র ধরে বাংলা মুসলিম শক্তির কাছে আক্রান্ত হয় এবং বাহ্যিকভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

সেন আমলে একদিকে যেমন সামন্ত প্রভু ও আমলারা প্রবল হয়ে উঠেছিল, তেমনি অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমবাদের গোঁড়ামিও বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থি ছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'পাল আমলের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণের আদর্শ এ যুগে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সেই আদর্শের স্থানে সবলে ও সোৎসাহে তাহারা এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই আদর্শ স্মৃতিশাসিত, বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ, সর্বপ্রকার যুগোপযোগী সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণ-বিরোধী আদর্শ।' এ আমলে সমাজস্তরে শত বিভাজনে সমাজকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে ও সমাজে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। একদিকে আমলাতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অদম্য প্রভাব পাল আমলে আচরিত রাষ্ট্রের সামাজিক সাম্য বিনষ্ট করে। পাল যুগে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল উদার ও ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন। সেখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদে কোনো রেষারেষি ছিল না।[৫৭] এ সময়ে ভবদেব, হলায়ুধ, জীমূতবাহন প্রমুখের স্মৃতি ব্যবহার ও মীমাংসা শাস্ত্রে সমাজশাসনের যে রূপরেখা আমরা পাই তা সমাজের উদার আবহ বিনষ্ট করাই প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায় আরও বলেন :

> এ যুগের প্রধান চেষ্টাই হল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শ অনুযায়ী বাংলার সমাজকে একেবারে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো। সেই চেষ্টার পেছনে ছিল রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন। উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণির লোকেরাও ছিল তার পোষক ও সমর্থক। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী ও রাঢ়দেশ এবং পরে বিক্রমপুর অঞ্চল। বিক্রমপুরে বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতির একটি বড়ো ঘাটি থাকায়, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি রাঢ়বরেন্দ্রীর মতো তেমন প্রবল প্রতাপ হয়ে উঠতে পারেনি। আর ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। এই জন্যেই বোধ হয় মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির শাসন আজও কিছুটা দুর্বল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির দিক থেকে উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারত বরাবরই একটু বেশিরকমের গোঁড়া। কর্লিঙ্গ-কর্ণাট থেকে সেন ও বর্মণেরা সেই আদর্শ নিয়েই বাংলাদেশে এসেছিলেন। এই যুগে বাংলার সমাজ ও বাঙালি জাতিকে বর্ণ ও শ্রেণির দিক থেকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে নতুন করে গড়া হয়েছিল; এই গড়ার পেছনে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবার কিংবা নিজের করে নেবার কোনো আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ এই যুগে ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে বিভক্ত। রাজসভার চরিত্রবল ও আত্মশক্তির অভাব। ধর্ম ও সমাজ বিলাসব্যসনে মশগুল। শিল্প ও সাহিত্য বাস্তবতা হারিয়ে ফাঁকা উচ্ছ্বাস, অত্যুক্তি ও দেহসর্বস্বতায় ভরে উঠেছে। জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তুক-তাকে পঙ্গু। উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট।

এরপর বখতিয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশো বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশে জুড়ে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়—সেন আমলে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতিরই অনিবার্য পরিণাম।[৬০] তবে এসব সত্ত্বেও বলা চলে সাহিত্যচর্চার একটা আবহ রাজদরবারে হলেও ছিল। বল্লাল সেন ও পুত্র লক্ষ্মণ সেন দু'জনই ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। লক্ষ্মণ সেন একজন কবিও বটে। তাঁদের সময় কাব্য-সাহিত্য ও সঙ্গীতের বেশ চর্চা হত। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচিত 'গীতিগোবিন্দ' তৎকালের আদর্শ স্থানীয় রচনা। আর এক সভাকবি ধোয়ী তাঁর 'পবনদূত' কাব্যের জন্য বিখ্যাত। বিশেষত গীতিগোবিন্দের গান বাংলা অঞ্চলসহ প্রায় সব নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সাহিত্যে নতুন পথ দেখিয়েছে। আমরা সমাজ-ইতিহাসের পারম্পর্যতা বোঝার জন্যই রাজনৈতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করছি।

বখ্‌তিয়ার নদিয়া জয়ের পর লক্ষ্মণাবতী এবং বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলা দখল করেন। বখতিয়ারের রাজ্যসীমা পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর, পশ্চিমে বিহার। অনুমান করা যায় স্বপ্নচারী এই খলজি উদ্বাস্তু সৈনিকের লুণ্ঠন ও রাজ্যজয় নেশায় পরিণত হয়েছিল। অবিমিশ্রকারী এই সৈনিক দুর্গম এলাকা তিব্বত অভিযান পরিকল্পনা তাঁর অদূরদর্শীতারই পরিচয়। কথিত আছে, পরাজিত এবং রণক্লান্ত এই সৈনিক অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলে তাঁরই এক অনুচর আলি মর্দান খলজি নাকি ছুরি মেরে তাকে হত্যা করেন (১২০৬)।

বখতিয়ারের মৃত্যুর পর শুরু হয় খলজিদের অন্তর্কলহ। অন্যদিকে দিল্লির উপর্যুপরি আক্রমণ। শিরান, আলি মর্দান ও ইওজ এই তিনজনের মধ্যে অন্ত র্বিরোধের শেষ পরিণতি ইওজ খলজির (১২২৭) মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খলজি শাসনামলের অবসান হয়। ১২২৭ থেকে ১২৮৭ পর্যন্ত এই আশি বছর দিল্লির একটি প্রদেশ হিসেবে বাংলা শাসিত হয়।[৬১] দিল্লির আধিপত্যের অবসান হয় ফকর-উদ্দিন মুবারক শাহ কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা (১৩৩৮) ঘোষণার মধ্য দিয়ে। তাঁর রাজধানী ছিল ঢাকার সোনারগাঁও। ফকর-উদ্দিন মুবারক শাহ তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বৃদ্ধি করেন। তিনিই প্রথম চট্টগ্রাম অঞ্চল মুসলমানদের আধিপত্যে আনতে সক্ষম হন। তাঁর রাজত্বকাল ১৩৪৬ খ্রি. পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় পর্যটক ইবনবতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। অপর দিকে লখনৌতিতে সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং রাজধানী ফিরোজাবাদে স্থানান্তর করেন। সুলতানের এক রাজকর্মচারী ইলিয়াস তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন (১৩৪২-১৩৫৮) এবং তিনি সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করেন।

সমগ্র বাংলাভাষা অঞ্চলকে একত্রিত করার গৌরব এই ইলিয়াস শাহের। তিনি বাংলাদেশের বাইরেও কয়েকটি এলাকা জয় করেন এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

করেন। তিনি নেপালে আক্রমণ চালান। ত্রিহুতের কিছু অংশ দখল করার পর পশ্চিমে কাশী, গোরক্ষপুর ও চম্পারণ পর্যন্ত এক বিস্তৃত অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি বাংলাদেশে এক উদার শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, বাঙালি হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। দিল্লির ঐতিহাসিক শাম-ই সিরাজ আফিফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই বাঙ্গালা', 'শাহ-ই বাঙ্গালীয়ান এবং 'সুলতান-ই বাঙ্গালা', রূপে উল্লেখ করেছেন।

দিল্লির সম্রাট ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা আক্রমণ করলে ইলিয়াস শাহ দিনাজপুরের ঐতিহাসিক একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায় ছয় মাস অবধি অবরোধ করে রাখার পর ফিরোজ সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। এই সুযোগে দিল্লি পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করে। সিকান্দার পিতৃ-পরীক্ষিত কৌশল অবলম্বন করে একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। দুই বছর ছয় মাস অবরোধ চলার পর পুনরায় সন্ধি হয়।

১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম মাহ (১৩৯৩-১৪১১ খ্রি.) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিয়াসউদ্দিন দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি সুফিসাধকদের প্রতি ভক্তি এবং বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু কিংবদন্তি রয়েছে। বিশেষত তাঁর সময় বিচার ব্যবস্থা ছিল খুবই নিরপেক্ষ। তিনি মক্কা, মদিনা, জৌনপুর ও চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁর সময়ই বাংলাদেশ থেকে চিন সম্রাটের জন্য জিরাফ উপঢৌকন পাঠানো হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তাঁর আমলে বাংলাদেশ প্রভূত সমৃদ্ধি অর্জন করে। দরিদ্র আরববাসীর জন্য তিনি খয়রাতি সাহায্য পাঠান যা মক্কা ও মদিনার দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিলি-বণ্টন করা হয়। তাঁর প্রেরিত অর্থে (স্বর্ণমুদ্রা) মক্কা, মদিনায় বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তিনি বহির্বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্রনীতির উল্লেখযোগ্য প্রথা দূত বিনিময়ের এক বিশেষ নজির স্থাপন করেন। চিনের তৎকালীন সম্রাট য়ুং-লো তাঁর এই দূত বিনিময় নীতি অনুমোদন ও অনুসরণ করেন। ১৪০৫ থেকে ১৪৩৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে চিনে অন্তত ৭ বার এবং চিন থেকে বাংলাদেশে ৩ বার দূত বিনিময়ের খবর ইতিহাসে লিখিত আছে। এছাড়া কাজির বিচারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে একটি চমৎকার কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তাঁর দুই দশকের রাজত্বকালে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নত দেশে পরিগণিত হয়। এমনকি পারস্যের সুবিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গেও তাঁর পত্র বিনিময় হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উলেমা শ্রেণি ও স্থানীয় আমলা-গ্রশাসকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক বিরোধিতায় রাজা গণেশের (১৪২৭-১৮) উত্থান ঘটে, যিনি শেষ পর্যন্ত একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।[৬২] গণেশ ছিলেন রাজশাহীর ভাতুরিয়া নামক স্থানের জমিদার। গণেশ তেমন

গ্রহণযোগ্য হন না; কারণ দেখা যায় মুসলিম সামন্ত-আমির ওমরাহগণ জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণের আহ্বান জানান। রাজা গণেশ তাঁর পুত্র যদুকে জালালউদ্দিন মাহমুদ নাম দিয়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন এবং পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন।[৬৩] জালালুদ্দিন 'খলিফাতুল্ল' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তর করেন। তিনি চিন ও মিশরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী শামসুদ্দিন আহমদ শাহ (১৪৩২-৩৬) হিরাটে দূত পাঠিয়ে এবং তৈমুরের পুত্র শাহরুখের হস্তক্ষেপ কামনা করে ইব্রাহিম শর্কির আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি প্রতিরোধ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। শামসুদ্দিন আহমদ শাহের রাজত্বকাল থেকে সভাসদ ও সামন্ত-আমির-ওমরাহদের মধ্যে প্রাসাদ রাজত্বকাল থেকে সভাসদ ও সামন্ত-আমির-ওমরাহদের মধ্যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়; ফলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত ঘটে। আহমদ শাহ হাবসি ক্রীতদাস সাদি খান ও নাসির খানের হাতে নিহত হন। পরে নাসির সাদিকে হত্যা করে নিজেই শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। ক্ষমতা লাভের সাত দিনের মধ্যে নাসির খান নিহত হন এবং সামন্তচক্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহকে (১৪৩৬-৬০) ক্ষমতায় বসান। তিনি রাজকার্যের উচ্চাসনে ক্রীতদাস হাবসিদের অধিষ্ঠিত করেন। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফতেহ শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু হাবসিরা তাকে হত্যা করে হাবসি রাজত্ব কায়েম করে। রাজনীতিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সামন্ত সমাজে হত্যা, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। হাসবি মুজফফরকে নিহত করে কূট-কৌশলে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হন।[৬৪]

২০০ বছরের স্বাধীন সুলতানি আমলের সবচেয়ে খ্যাতিমান শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯ খ্রি.)। তিনি অত্যন্ত উদারনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক শাসক ছিলেন। ধর্মীয় অনুশাসনগত দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ তাঁর শাসনামল কিংবদন্তিতুল্য।[৬৫] তাঁর সহনশীলতা বাংলার বুকে এমন এক আবহ সৃষ্টি করেছিল যে, তাঁর শাসনকালে সাহিত্য সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি দ্রুত বিকাশ লাভ। করেছিল। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার ফলে বাংলার জনপদগুলো একত্রিত হয়ে একটি একক বঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তাঁর নিযুক্ত চট্টগ্রামের সামরিক গভর্নর পারগল খানের অনুজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।[৬৬] কবীন্দ্রের অনুবাদই বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারত। কবীন্দ্র এই শাসককুলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর রাজত্বকালে বেশ কিছু উচ্চ পদে হিন্দুদের নিযুক্ত করেছিলেন। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ দাস। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন গোপীনাথ বসু এবং টাকশাল অধ্যক্ষ অনুপ ছিলেন হিন্দু।[৬৭] হোসেনের রাজত্বকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভোরের আলোর মতো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। জাতি গঠনের এই অনুকূল

পরিবেশে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ সবাই মিলে একাত্ম হয়ে জাতি গঠন প্রক্রিয়া তরান্বিত করেছিল। তাঁর রাজত্বকালে বাংলার ভৌগোলিক সীমাও বৃদ্ধি পায়। ড. মমতাজুর রহমান লেখেন :

> প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে ভৌগোলিক অবস্থা কীভাবে এ অঞ্চলে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির বিস্তারকে প্রভাবিত করেছে তা লক্ষ করা উচিত। উত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক প্রভাব থেকে বাংলাকে বিযুক্ত করতে ব্যগ্র স্বাধীন সুলতানরা পশ্চিম থেকে এদেশে প্রবেশ: পথ মিথিলা বা তিরহুত এবং দক্ষিণ বিহারের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভাজনরেখামুখী গঙ্গার উভয় তীরের ভূখণ্ডের উপর কার্যকর অধিকার বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে রাজমহল থেকে দক্ষিণ বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের এবং বিহার শরিফসহ পাটনা পর্যন্ত পূর্বে গঙ্গা এবং কোসীর সঙ্গমস্থল থেকে পশ্চিমে ছাপড়া ও বালিয়া জেলা পর্যন্ত, যার মধ্যে ঘোগরা ও গঙ্গার মিলনস্থল অন্তর্ভুক্ত উত্তর বিহারের দক্ষিণ পর্যন্ত প্রসারিত সমগ্র অঞ্চল কৌশলগতভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত বলে মনে হয়। কারণ মধ্য-যুগের বাংলা পরম্পরাগত সীমানা পাহাড়ের নিকটস্থ তেলিয়াঘরি গিরিপথ এবং কোসী নদী হেঁটে পার হওয়া যায় এবং স্থানগুলির প্রতিরক্ষার জন্য গঙ্গার অপর তীরস্থ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছিল আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায় এমন জায়গায় পণ্ডক এবং কোসী নদী পার হয়ে নদীর উত্তর তীর ধরে পশ্চিম থেকে সৈন্যবাহিনী বাংলার দিকে অগ্রসর হতে পারত: দক্ষিণ বিহারের উত্তরাংশ দিয়ে যাওয়া যে সড়ক লখনৌতিকে দিল্লির সঙ্গে যুক্ত করেছিল সেটা ছিল সংকীর্ণ তেলিয়াঘরির ভেতর দিয়ে বাংলায় আসার পথ। এটা এবং গঙ্গার সংকীর্ণ জলধারা এদেশের প্রতিরক্ষা অবস্থানকে মোটামুটি সন্তোষজনক করে তুলেছিল। বখতিয়ার খিলজি এবং শের খানের মতো আক্রমণকারীরা সম্ভবত পশ্চিমের প্রবেশপথের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পেরেছিলেন, যার ফলে তাঁরা ঝাড়খণ্ডের ওধারে বীরভূম ছাড়িয়ে গঙ্গার গতিপথের দিকে যাওয়া অধিকতর দুর্গম পথ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। বিহারে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী ভূখণ্ড বলতে গেলে ছিল বাংলার প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং সম্ভবত এটা উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বাংলায় প্রবেশপথ হিরহুতের সৈন্য চলাচলের ঘাটি হিসেবে ব্যবহৃত হত।[৬৮]

হোসেন শাহের প্রথম সাফল্য দেশের সীমানা বৃদ্ধিতে। তিনি কামরূপ, কামতা, জাজনগর এবং ত্রিপুরা ও উড়িষ্যার অংশবিশেষ জয় করেছিলেন। তাঁর সময় বাংলার সীমা গিয়ে দাঁড়ায়—পশ্চিম সীমান্তে উড়িষ্যার মন্দ্রেশ্বর পর্যন্ত, উত্তর-পূর্ব দিকে একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত। পূর্বে ত্রিপুরার মাঝামাঝি, দক্ষিণ-পূর্বে কর্ণফুলি নদীর তীর পর্যন্ত, দক্ষিণ দিকে খুলনা-বাখরগঞ্জ। এছাড়া হোসেন শাহের মহত্তর সাফল্য হিন্দু-মুসলিম উভয়ের মিলিত সমাজ সাধনার প্রবর্তনা। তাঁরই সময় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পরিণতি যাত্রা শুরু হয়। যদিও বাংলাভাষায় রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, শাহ মোহাম্মদ সগিরের ইউসুফ-জোলেখা এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ কর্তৃক মহাভারতের

বাংলা অনুবাদ বাংলার মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য রস জুগিয়েছে—যা একালেরই সৃষ্টি। হোসেন শাহ এবং তাঁর অমাত্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিগণ সানন্দচিত্তে সাহিত্য রচনা করেছেন। আর শাসককুল তাঁদের যোগ্য সম্মানে সম্মানিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাভারত প্রণেতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর, সুলতান ও তাঁর অমাত্যবর্গের উৎসাহে ও প্রেরণায় সাহিত্য রচনা করেন। চট্টগ্রামের অমাত্য (সামরিক শাসনকর্তা) পরাগল খান কবীন্দ্রকে বাংলায় মহাভারত রচনার নির্দেশ দেন। কবির ভাষায় :

> কুতূহলে পুছিলেক ভারত কাহিনী।
> যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী ॥
> যেন মতে বনে ছিল রাঢ়স বছর।
> কোন কর্ম্ম কৈল গিয়া বনের ভিতর ॥...
> এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
> দিনকে শুনিতে পারি পাঁচালী পড়িয়া ॥[৬৯]

একদিকে ভাষার বিকাশের সাথে সাথে যেমন স্ফূর্তি ঘটেছে মানসজগতে, তেমনি অন্যদিকে ইহজাগতিক জীবনবোধসম্পন্ন বহিরাগতদের সাথে গভীর যোগাযোদের ফলে বহুকাল পরে বাঙালির জীবনের গণ্ডিবদ্ধতা ও তার মনের জড়তা ঘুচে গিয়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যসহ বিকশিত হতে থাকে তার কর্মজগতের পরিধি।[৭০] জনৈক ঐতিহাসিক লেখেন :

> বহু আচার ও নিয়মে ভরা বাংলার জীবনযাত্রা ছিল বিচিত্র। রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গের মতো প্রাচীন আঞ্চলিক বিভাগগুলি তখনও অন্তর্হিত হয়নি। কিন্তু সেগুলিকে বৃহত্তর এক ভৌগোলিক অণ্ডলের অধীনে সুগ্রথিত করা হয়েছিল যার আঞ্চলিক আয়তন ছিল মোটামুটিভাবে বর্তমান বাংলার মতো। বাঙ্গালা বা বাংলা নামের উদ্ভব ইতোমধ্যে হয়েছে এবং চট্টগ্রাম থেকে মান্দারণ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসামের পাহাড়শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত গোটা ভূখণ্ডের জন্য এ নাম ব্যবহার করা হচ্ছিল। এরচেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল যে, এ সময়ের মধ্যে বাংলায় তাঁর নিজস্ব একটি ভাষার বিকাশ ঘটেছিল যা সে আমলের কবিরা সমরূপে গ্রহণ করতে পারতেন। কাজেই বাঙালিদের জীবনযাত্রায় বেশকিছু সর্বজনীন উপাদান ছিল। এগুলি ছিল বসবাসের জন্য একটি সন্নিহিত এলাকা, সাহিত্যের এক সর্বজনীন ভাষা এবং তাদেরকে শাসনের জন্য এক সর্বজনীন রাজনৈতিক শক্তি। এগুলি ঐক্যের বন্ধন রূপে কাজ করেছিল এবং তাদের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করেছিল। এটা কোনো সাধারণ কৃতিত্ব নয় এবং এতে নিশ্চিতরূপে শাসকবর্গের প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। হোসেন শাহি আমল বাঙালি জাতির জন্মের একটি সুস্পষ্ট পর্যায়ের সূচনা করেছিল বলে মনে হয়। আফগানদের বিজয়-তরঙ্গমালা ও পরবর্তীতে মোগল সাম্রাজ্যবাদ একে নিরুৎসাহিত করেছিল বলেও মনে হয়। শাসকগোষ্ঠীকে চারদিক থেকে বেশকিছু শত্রুভাবাপন্ন দেশ ঘিরে রেখেছিল। এদেরকে প্রতিরোধ করার অবিরাম চেষ্টা সে করে যাচ্ছিল। এটা করতে গিয়ে তাকে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও দেশের অখণ্ডতা নিয়ে ভাবতে হয়েছিল। স্থানীয় সংস্কৃতির উন্নতি বিধান এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখলে এটা অর্জন করা সম্ভব ছিল। ফলে জনগণকে শাসকশ্রেণির আরও কাছে টানা হয়েছিল এবং

শাসক শ্রেণির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার তাদের অকৃত্রিম কারণ ছিল। কাজেই অভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি জনগণের মধ্যে এক সর্বজনীন ঐক্য-বোধের সঞ্চার করেছিল বলে মনে হয়।[৭১]

হোসেন শাহের আমলেই বাংলার জনপদগুলো নিজেদের স্বতন্ত্র ঘুচিয়ে এক অখণ্ড ভৌগোলিক রাষ্ট্রের ঐক্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। বাংলাভাষা প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত ও মাগধি প্রাকৃত থেকে স্বতন্ত্র হয়ে, অপভ্রংশ পর্যায় থেকে মুক্তি পেয়ে তার যথার্থ আদিম রূপ প্রকাশ করল। সাত শতক থেকে এক হাজার শতকের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত চর্যাপদগুলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক 'জন' এক 'ভাষার' বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকে যে 'বৃহৎ বাংলা' তার চারদিকে রয়েছে সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক সীমানা, তাইতো কবি সুকান্ত গেয়ে ওঠেন, 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ'। রাষ্ট্রের সীমারেখা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হলেও প্রাকৃতিক সীমানা ঠিকই থাকে। মোঘল মাসনামলে আমরা দেখি বঙ্গ-পুণ্ড্র-গৌড় একাকার হয়ে 'সুবেহ বাংলা' নামে মোঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রশাসনিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। আমরা ব্রিটিশের সময়ে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র যে সীমানা দেখি সম্রাট আকবরের সুবা বাংলার সীমানা তার চেয়ে অনেক বেশি সম্প্রসারিত ছিল। রাজমহল পরগনা, শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া পরগনা, সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত তেলিয়াঘেরিও সুবে বাংলার আওতাভুক্ত ছিল। বর্তমান দ্বারভাঙ্গা ছিল পশ্চিম সীমান্তে, আর উত্তরে তুষার-শুভ্র হিমালয়। অপর দিকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে বৃহৎ বাংলার সীমানা আবারও সংকুচিত করা হয়।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন রাজশক্তির পরিবর্তন সাপেক্ষে নয়, প্রকৃতি নির্দেশিত সীমাকেই বৃহৎ বঙ্গের সীমা বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'মোটের উপর যে স্থানের অধিবাসীরা বা তাহার অধিকসংখ্যক লোক সাধারণত বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে তাহাই বাংলাদেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন।' ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় সুপ্রাচীন কাল থেকে গড়ে ওঠা বিশাল বাংলার সীমা নির্দেশ করেছেন এভাবে : 'উত্তরে হিমালয় ধৃত নেপাল। সিকিম ও ভুটান রাজ্য-উত্তর-পূর্ব দিকে :

সেন আমলে বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবক্ষয় যখন চলছে তার অনেক আগে থেকেই উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নতুন দিকে মোড় নিচ্ছিল। ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর বহু সংখ্যক আরব বণিক ভারতবর্ষের অন্যান্য উপকূলসহ চট্টগ্রাম বন্দরে বাণিজ্যে এসেছেন। এবং একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু মুসলিম ধর্ম প্রচারক ও সুফি সাধক বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে এসে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেছেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রান্ত এলাকায় মুসলিম ধর্মাবলম্বী খিলজি, ইলাবরি, তুর্কি, মামলুক, ঘুর, তুঘলক প্রভৃতি

উপজাতির সামনে ভাগ্য ফেরাবার প্রধান ক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষের ছোটো বড়ো রাজ্যগুলো। সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকের লেখা থেকে জানা যায় ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলো ছিল পরস্পরের প্রতি কলহপূর্ণ, ম্রিয়মাণ ও অবক্ষয়ের মুখে নিপতিত। এর ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ বেশিদিন রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। গজনির শাসক (আধুনিক আফগানিস্তান) শাহাবুদ্দিন ঘুরি যখন ১১৯২ সালে আজমির রাজ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন তখনই বহু শতাব্দীর ভারত সভ্যতার ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রন্তিলগ্নে পৌছায়। পারসি ব্রাউনের মতে 'মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের অবসান হয়।'

খলজি উপজাতির বখতিয়ার একজন উচ্চভিলাষী ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধামাত্র। এরা প্রায় সবাই দুর্ধর্ষ যাযাবর প্রকৃতির লোক; যুদ্ধ ছিল এদের অনেকের পেশা। ফলে এদের পক্ষে রাজনৈতিক বিজয় সহজ হলেও সাংস্কৃতিক বিজয় ছিল দুরূহ। আর এ কাজে এগিয়ে আসেন পির-দরবেশ ও সুফি সাধকবৃন্দ। বাংলায় সুফি সাধকদের প্রণোদনায় ইসলামের সাম্যের বাণী সমাজের সকল স্তরে পৌঁছে যায়। শাহ জালাল, খান জাহান আলি, শাহ ইসমাইল গাজি প্রমুখ সাধক ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আবার দেখা যায় তাঁরা কূটনীতিসহ নেহাত পার্থিব দায়িত্ব গ্রহণে উন্মুখ ছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তা নিপুণভাবে পালন করেছেন। সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়া সুফি-সাধকদের মাধ্যমে যে খানকা বা আস্ত ানা গড়ে উঠেছিল তাতে পারস্য ও উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত ধ্যান ও জপের মাধ্যমে সাধনার ধারা এখানেও চালু হয়। অনুমান করা সংগত যে বাঙালি এর মধ্যে তার সনাতন প্রবণতার খোরাক পেয়েছিল। ইসলামের সাম্য ও মানমপ্রেমের বাণী বাঙালির মনে স্থায়ী আসন করে নেয়। সুফি ও বৈষ্ণব চেতনায় উজ্জীবিত হয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম, সর্বোপরি সমাজে জীবনমুখী মানবতাবদের স্ফূরণ ঘটে; ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও বাস্তবমুখী জীবনাচার তৎকালীন হিন্দুর বর্ণাশ্রম বিভক্ত সমাজ ও মায়াবাদী চেতনার ভিতকে যেমন নাড়া দিয়েছে: তেমনি হিন্দুসংস্কৃতির ভক্তি ও প্রেম মুসলিম মানসে স্ফূরণ ঘটিয়েছে। মধ্যযুগে উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, নানক এ ধারারই সাধক-সন্ত।

বাংলার বৈষ্ণব সাধনা স্তিমিত প্রায় বৌদ্ধ সহজিয়া এবং নবাগত ইসলামি মরমিবাদ তথা উদার মানবতাবাদে সিক্ত সুফিবাদের মিলিত চেতনার এক মানবীয় প্রকাশ। এরই ফলে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের কবি চণ্ডীদাসের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই বৈপ্লবিক কথা। আমাদের মনে রাখতে হবে কোন্ পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যতায় অনেক মুসলমান বৈষ্ণব হয়েছেন এবং অন্তত ১২১ জন মুসলিম কবি স্বতঃপ্রণোদিত- ভাবে বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেছেন। সমাজের এই বিকাশমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জাতিগঠন প্রক্রিয়াও একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাইতো ১৬২০ সালে জন্মগ্রহণকারী কবি আবদুল হাকিম বলতে পারেন—

যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥

হোসেন শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নুসরাত শাহ ১৫১৯ খ্রি. সিংহাসনে আসীন হন। সমকালে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছিল। ১৫২৬ খ্রি. পানিপথে বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি পরাজয় বরণ করেন। এটা বাংলার সার্বভৌমের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সুযোগসন্ধানী দিল্লির সম্রাট বাংলা আক্রমণের ফন্দি-ফিকির করতে থাকেন। নুসরত শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, সমকালের কবিদের রচনায় প্রশংসার সঙ্গে তাঁর নাম বারবার উল্লেখিত হয়েছে।[৭২] ১৫৩২ খ্রি. পিতার সমাধি পরিদর্শন কালে এক ক্রীতদাসের হাতে তিনি নিহত হন। এরপর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ শাহ পিতৃব্য গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের হাতে ১৫৩৩ খ্রি. নিহত হন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ৬ এপ্রিল ১৫৩৮ খ্রি. আফগানদের হাতে পরাজিত হন এবং বাংলার ২০০ বছরের সুলতানি শাসনামল সমাপ্ত হয়।[৭৩]

আমরা দেখি শশাঙ্কের সময় (আনু. ৬০০-৬৩৫ খ্রি.) থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে এক নামে অভিহিত করার প্রয়াস দেখা যায়। জনপদগুলোর স্বতন্ত্র সত্তা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ঘটনা প্রবাহের ফলাফল স্বরূপ ক্রমশ বিলুপ্ত হতে শুরু করে। যদিও শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা পর্যন্ত গৌড়াধিপতি, গৌড়বাসী, গৌড়েশ্বর বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু তাদের অজানতেই বনৌষধির ক্রিয়ার মতো (হেমলোকের অনুরূপ) অন্যসব জনপদের বিলুপ্তি টেনে 'বঙ্গ'-বাঙ্গাল বাঙালি জাতিসত্তা ঘোষণা করে দেয়। এই কার্যটি সুসম্পন্ন হয় বাংলার দক্ষ প্রশাসক সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস (১৩৪২-১৩৫৮) শাহের হাতে। তিনি লক্ষ্মণাবতী ও বাংলা একীভূত করেন। এই যুক্ত অঞ্চলকে তিনি বাঙ্গাল নমে অভিহিত করেন। সুলতান নিজে 'শাহ-ই বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করেন এবং নিজেকে বৃহত্তর বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভাষাগত ঐক্যের পটভূমি স্থাপিত হয়। এ সময় থেকে তেলিয়াগর্হি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ 'বাঙ্গালা' এই একটি সাধরণ নামে এবং এর অধিবাসীগণ বাঙালি নামে পরিচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজ তাঁর কবিতার পঙ্ক্তিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে (১৩৯৩-১৪১০) বাঙ্গালার সুলতানরূপে অবিহিত করেন এবং বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ও তৎপুত্র নুসরত শাহকে (১৫১৯-১৫৩১) বাঙ্গালার সুলতান এবং এর অধিবাসীদেরকে বাঙালি বলে

উল্লেখ করেন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ কর্তৃক দিল্লির বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের পরাজয় পর্যন্ত দুশো বছর কাল বাংলা নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ভোগ করে।

পরবর্তী ৪০০ বছরের (১৫৩৮-১৯৪৭) ইতিহাস আফগান, মোঘল, পুর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজদেব লুটতরাজের ইতিহাস। ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৬ খ্রি. পর্যন্ত আফগান শাসন। ১৫৭৬ থেকে ১৭১৬ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় সাঁইত্রিশজন মোগল সুবেদার বাংলা শাসন করেন।[৭৪] মোগল সম্রাটদের নিয়োগকৃত শাসনকর্তা ও তাদের কর্মচারী-গোমস্তারা নানা প্রকার কূটচালে বাংলার কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য-সম্পদের উপর শোষণের জাল বিস্তার করে এবং এটা মোগল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত (১৭১৬ খ্রি.) চলতে থাকে। ১৭০৭ খ্রি. আওরঙ্গজেবের মৃত্যু থেকে পলাশির পরাজয় (১৭৫৭ খ্রি.) পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল অনিয়ন্ত্রিত, কেবল ক্ষমতার পালা বদল, শোষণ ও নির্যাতনের ইতিহাস।

১৫৩৮ থেকে ১৬০৮ (অথবা ১৬১০) খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইসলাম খানের আগমন কাল পর্যন্ত ৭০ বছরের বাংলার ইতিহাস ক্ষমতার পারা বদল ও টানাপোড়েনের ইতিহাস, বাংলা বনাম দিল্লির সুলতান-বাদশাহের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস। বিহারের উদীয়মান নেতা শেরখান ১৫৩৮-এর এপ্রিলে সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখল করেন। আবার ১৫৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে শেরখানকে পরাজিত করে হুমায়ুন গৌড় দখল করেন। শেরশাহ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করলে বাংলা অঞ্চলও শেরশাহের অধীনে হয়। শেরশাহের সময় সোনারগাঁ থেকে সিন্ধুর তীর পাঞ্জাব পর্যন্ত যে মহাসড়কটি নির্মিত হয় সেটিই পরে 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামে খ্যাতি লাভ করে।

আফগান সামন্তদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন আগ্রা পুন-রুদ্ধারের অল্পকাল পরেই ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। তাঁর সন্তান কিশোর আকবর সিংহাসন লাভের অল্পকাল পরেই আফগান শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন। অভিভাবক বৈরাম খানের দক্ষতায় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হয় এবং মোগল সাম্রাজ্য বিপদমুক্ত হয়।

বিহারের তাজ খান কররানি ১৫৬৪ খ্রি. গৌড় দখল করেন। তাজ খান অল্পদিন রাজত্ব করে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যায়। তাঁর ভ্রাতা সোলায়মান করনারি (১৫৬৫-১৫৭২) বাংলা ও বিহারে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। সেনাপতি কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে তিনি উড়িষ্যা দখল করেন এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আফগান নেতা হিসেবে এসব অঞ্চলের অধিকর্তা হন। তবে তিনি দিল্লির বাদশাহ আকবরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বজায় রেখে চলেন। এমনকি

স্বাধীন শাসকের প্রতীক 'শাহ' বা সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন না। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য নাকি তিনি রাজধানী গৌড় থেকে কিছুদূরে 'তাঁড়ায়' স্থানান্তরিত করেন।

১৫৭২ সালে সোলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বায়েজিদ সিংহাসনে বসেন। বায়েজিদ অল্পদিনের মধ্যেই নিহত হলে সোলায়মানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ সিংহাস লাভ করেন। দাউদ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার অভিপ্রায়ে নিজ নামে খুতবা পাঠ, মুদ্রা জারি ও বাদশা উপাধি গ্রহণ করেন। বাদশা আকবরের কাছে এটা ছিল অসহনীয়। তিনি মোগল সেনাপতি মুনিম খানকে তাঁর রাজ্যে আক্রমণ চালাতে নির্দেশ দেন। নয় মাস ধরে পাটনা দুর্গ অবরোধ করেও মুনিম ব্যর্থ হলেন। আকবর নিজে পাটনা জয়ের ভার নিলেন। পরে মুনিম খান সারা বিহার অধিকার করেন। মুনিম খান বাংলা আক্রমণ করলে দাউদ প্রথমে সাতগাঁয়ে এবং পরে উড়িষ্যা পালিয়ে যান। ১৫৭৫ সালের কটকের সন্ধি হয় বাংলা ও বিহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হবে এবং দাউদ মোগল সম্রাটের সামন্ত হিসেবে উড়িষ্যা শাসন করবেন। কিছুদিন পর মুনিম খানের মৃত্যু হলে দাউদ পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনর্দখল করে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মোগল সেনাবাহিনীর সাথে রাজমহলে সাত মাস ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দাউদ পরাজিত ও নিহত হন (১২ জুলাই ১৫৭৬)। এভাবে সাঁইত্রিশ বছরের আফগান শাসনের অবসান হয়।

তবে এ বিজয়ের ফলেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা আকবরের অধীনে চলে যায়নি, বরং এ দেশের সামন্ত প্রভুরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেন। এঁদের ভিতর বাংলার বারোজন ভূস্বামী (ভূ-সামন্ত) বিশেষভাবে পরিচিত। ইতিহাসে এরা 'বারো ভুঁইয়া' নামে খ্যাত। যদিও এঁদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এসব ভুঁইয়াকে কেউ কেউ বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর প্রতীক হিসেবে কৃতিত্ব দিতে চান। তবে এটা প্রশ্ন সাপেক্ষ, কারণ তাঁরা মোগল শাসকের বিরুদ্ধে যে কাজটুকু করেছিলেন তা নিতান্তই সামন্তেরই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড। সে যা হোক এসব ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে আকবর বারবার সেনাবাহিনী পাঠিয়েও তেমন সুবিধা করতে পারেননি। বস্তুত এ কৃতিত্বের দাবিদার তাঁর পুত্র জাহাঙ্গির এবং জাহাঙ্গিরের প্রেরিত সুবেদার ইসলাম খানের। তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ও ভুঁইয়াদের ক্ষমতা খর্ব করেন। এর পরের ইতিহাস মূলত মোগল শাসনের একটি সুবা বা প্রদেশ হিসেবে মোগল সাম্রাজ্যের অংশমাত্র। ১৫৭৬ থেকে ১৭১৬ পর্যন্ত সাঁইত্রিশজন মোগল সুবেদার বাংলা শাসন করেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সুবেদার মুর্শিদ কুলি খান দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গোলযোগের সুযোগে ইচ্ছে মাফিক শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৭১৭ সালে তিনি দিল্লির সম্রাট ফারুকসিয়রকে এক লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে বাংলার সুবেদারি লাভ করেন। ১৭১৯ সালে, এক বছরে পরপর পাঁচজন দিল্লির সিংহাসন

অলংকৃত করেছেন এবং তাঁরা উজিরদের কথায় উঠেছেন ও বসেছেন। এই পালাবদলের ফলে এবং দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর অভাবে প্রশাসনে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলি খান একই সঙ্গে বাংলা ও বিহারের দেওয়ান এবং উড়িষ্যার সুবেদার ও দেওয়ানের দায়িত্ব পালন করেন। নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে তিনি স্বয়ং তাঁর পরবর্তী সুবেদার নিযুক্ত করে যান তাঁর কন্যাপুত্র সরফরাজকে। কিন্তু মসনদ অধিকার করেন সরফরাজের পিতা সুবাউদ্দিন স্বয়ং। পিতা সুজাউদ্দিনের (১৭২৭-৩৯) মৃত্যুর পর সরফরাজ সিংহাসনে বসেন। পরবর্তী কালে সরফরাজকে হত্যা করে মসনদে বসেন আলিবর্দি খান। অপুত্রক আলিবর্দি খান (১৭৪০-৫৬) কন্যাপুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। সিরাজ মসনদে বসেন ঠিক, কিন্তু ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে স্বীয় সেনাপতি ও আত্মীয় মিরজাফর আলি খানের নিষ্ক্রিয়তায় ইংরেজদের কাছে (১৭৫৭) পরাজিত হন এবং আত্মগোপন করতে গিয়ে ধরা পড়েন ও নিহত হন। একটি বিদেশি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্রে এবং তাদেরই হাতে স্বাধীন নবাবের পতন বাংলা ও সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের পরাধীনতারই ইঙ্গিতবাহী।

তৈমুর- চেঙ্গিসের বংশধর সমরখন্দের বিতাড়িত শাসক বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। মোগলরা ছিল দুর্ধর্ষ ও উচ্চাভিলাষী— তারা ভারত-বর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে ছিলেন বিভোর। এদিকে বিহারে শেরখান শূরের মাধ্যমে আফগান শক্তি মাথা চাড়া দেয়। হোসেন শাহি বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে আফগান শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করেন। বাংলার অধীনতা নিয়ে শুরু হয় মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব। ১৫৭৬ সালে বাংলা আকবরের হাতে বিজিত হবার আগে এই ৩৮ বছর ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও শোষণের ফলে বাংলার রাষ্ট্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সামাজিক জীবনে অবক্ষয় দেখা দেয়।[৭৫] ১৫৭৬ সালে পরাজয়ের পরও দীর্ঘকালব্যাপী আফগান সামন্তরাজা ও জায়গিরদাররা মোগল প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে আঞ্চলভিত্তিক যুদ্ধ সংগঠিত করে। এতে স্থানীয় জনসাধারণের কিছু কিছু সমর্থন তারা পেয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কেননা তারা প্রকারান্তরে বোঝাতে চাইত যে তারা বাঙালির হিতার্থেই মোগলবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এসব যুদ্ধ সংগঠনকারীরা বাংলার ইতিহাসে বারো ভূঁইয়া নামে খ্যাত। এটা ইতিহাসের অমোঘ সত্য যে যুদ্ধ করা ব্যতীত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সংগত কারণেই তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

১৫৩৯ সাল থেকে ১৫৯৪ সাল (মোগল সুবেদার মানসিংহের সুবেদারিত্বের পূর্ব পর্যন্ত) পর্যন্ত পাঠান ও মোগল শক্তির ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বাংলার সমাজ জীবন হয়ে উঠেছিল অশান্ত, অনিশ্চিত ও বিপদসংকুল। আফগান শাসনের অবসান ও মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তীকালীন সময়ে সমস্ত বাংলা দেশব্যাপী যে স্বৈরতন্ত্র দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থচেতনা। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন না

থাকার কারণে সমস্ত দেশে নেমে এসেছিল ব্যাপক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। সমকালের এই সমাজচিত্র মধ্যযুগের শক্তিশালী কবি মুকন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলণ কাব্যে চিত্রিত করেছেন।[৭৮] চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় সামন্তপ্রভু ডিহিদার ও রাজস্ব আদায়কারীরা কীভাবে সমাজের দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করত। ধনপতির বক্তব্যে উচ্চশ্রেণীর শোসকচরিত্র উন্মোচিত হয়েছে:

নৃপতি অধর্ম্মশীল দয়া নাই এক তিল
নিষ্ঠুর সভার যত লোক,
কৃপণ দারুণ ভণ্ড লঘুদোষে গুরুদণ্ড
পরধন খেতে যেন জোঁক।[৭৭]

বাংলাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করতে মোগলবাহিনীকে অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে। আকবরের বহু খ্যাতনামা সিপাহ্সালার যেমন মুনিম খান, মোজাফফর খান তুরবাদি, হোসেন কুলি বেগ, মানসিংহ প্রমুখ বাংলায় মোগল পক্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে বাংলায় যখন ইসলাম খান সুবেদার তখনই ১৬১৩ সাল নাগাদ বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে রূপান্তরিত হয়। এই প্রদেশকে আরো পূর্ণতা দেয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ সুবেদার শায়েস্তা খান।

মোগল শাসনের সময় বাংলার সাথে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন আবার শুরু হয়। লুপ্ত সামুদ্রিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবন পায়। বাংলার শিল্প উৎপাদন তার লুপ্ত ঐতিহ্য ফিরে পেলে সমকালের বিদেশি বণিকসমাজ এদিকে আকৃষ্ট হয়। বাংলার সিল্ক, রেশম, বাংলার নৌবাণিজ্য আবার জমজমাট হয়ে ওঠে। শিল্প-উৎপাদনেও নতুন জোয়ার আসে। এক হিসেবে দেখা যায় ১৬৮০-১৬৮৩ এই চার বছরে শুধু ইংল্যান্ড থেকে বাংলার রপ্তানি আয় দাঁড়ায় দুই লক্ষ পাউন্ড মূল্যের পৌপ্যমুদ্রা। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে আমদানি করে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড বা তৎকালীন সাড়ে আঠারো লক্ষ টাকার শিল্পজাত দ্রব্য। দেশের অর্থনীতিতে তেজীভাব ঈর্ষান্বিত পর্যায়ে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর সুফল দেশ বা দেশের সাধারণ মানুষ ভোগ করতে পারেনি। মোগল যুগে ব্যাংকিংয়সহ উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুবাদে দাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কতিপয় দেশীয় ফড়িয়া, রাজকর্মচারী, এবং বিদেশি কোম্পানি ক্রমে স্থানীয় উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবস্থা কবজা করে নেয়। উদ্যোগী বণিকরা উন্নত কারিগর আমদানি করে বা বাছাই করে স্থানীয় শ্রমিক সহযোগে স্বীয় উদ্যোগে ছোটো বড়ো শিল্প কারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। এসব শিল্পপণ্য উৎপাদন করতে যে উপাদান আবশ্যক সেই কাঁচামাল ও শ্রমিক জলের দরে পাওয়া যেত। ঠিক যদি আমরা ভারত বিভাগের পর পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ ও শিল্প বাণিজ্যের কথা স্মরণ করতে পারি সেখানে দেশীয় ফড়িয়ার যোগসাজসে এবং রাষ্ট্রনৈতিক

আনুকূল্যে পাকিস্তানের বাণিজ্য কোম্পানিগুলো পূর্ব পাকিস্তানে জেঁকে বসেছিল, তারা ব্যাংক্যিসহ বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুটতরাজ চালাচ্ছিল। ঠিক তেমনি একটি প্রক্রিয়ায় ষোলো শতকের শেষদিক থেকে বহুজাতিক কোম্পানিসহ শাসককুল বাংলার বুকে আছড়ে পড়ে।

১৬৬৬ সালে ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার লেখেন, ওলন্দাজরা তাদের কাশিম বাজারের সিল্ক ফ্যাক্টরিতে সময় সময় ৭ থেকে ৮ শো লোক নিয়োগ করত। ইংরেজ ও অন্য দেশের বণিকরাও একই পর্যায়ে কারখানা চালাত। অপর একজন পর্যটক তাবার্নিয়ের লেখেন, 'শুধু কাশিম বাজারে বছরে ২২০০০ বেল সিল্ক উৎপাদিত হয়। ১৬৫৪ সালে ইংরেজ ফ্যাক্টরিরর এক চিঠিতে জানা যায় যে, ওলন্দাজরা বাংলার পণ্য উৎপাদনে বছরে কম করে ২ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন খাটাত। এ প্রসঙ্গে ড. মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর এক গবেষণায় লেখেন :

> যে মনীষা প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটায় অথবা যান্ত্রিক উদ্ভাবনের ক্রমবিকাশ সম্ভব করে তোলে সেই ক্রিয়াশীল বুদ্ধিবৃত্তি বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে institution বা প্রতিষ্ঠান ও রীতির ও সৃষ্টি করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কতকগুলি প্রযুক্তির সমতুল্য। দাদান প্রথা এ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অন্যতম। বণিক পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দালালকে অগ্রিম টাকা দিত। দালাল সে টাকা পাইকারকে দিলে বিভিন্ন স্থানের বা শহরের উৎপাদন—কারিগরদের মধ্যে পাইকার সে অর্থ বণ্টন করত। সেই অর্থের জন্য কারিগর পাইকারের জামিনদার এবং পাইকার দালালের জামিনদার রূপে গণ্য হত। এই ঐতিহাসিক প্রথা দাদন প্রথা রূপে পরিচিত। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার puttingh out system দাদনি প্রথার সঙ্গে অনেক দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এই দুই প্রথায় উৎপাদন ব্যবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনা করলে প্রথা দুইটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। দাদনি ব্যবস্থায় কারিগর পণ্যের মূল্যের অধিকাংশ হাতে পেত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকত। গৃহীত অর্থ কারিগর কাঁচা মাল ক্রয়ের কাজে ও পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় করতে পারত। বাংলায় ও ভরতের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলে দেশি ও বিদেশি বণিকগণ দাদনি ব্যবস্থার মাধ্যমে কারিগরদের কাছে থেকে পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করত। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বণিকগণ নগদ অর্থ দিয়েও পণ্য কিনত। সতেরো শতক থেকে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের রেকর্ডপত্রে দাদনির উল্লেখ ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় ষোলো শতকের দিকেও এই প্রথা চালু ছিল। মনে হয় ভারতের বাণিজ্যিক অর্থনীতিতেই দাদনি প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল।

সে কালের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হুণ্ডি ছিল letter of credit bill of exchange ধরনের মাধ্যমে। কোনো সরাফ বা মহাজন বা তেজারতি কারবারির কাছে টাকা জমা দিয়ে একটি অঙ্গীকার-পত্র নিয়ে ব্যবসায়ী বা পর্যটন অন্যত্র গিয়ে অন্য একজন সরবরাহকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পর কিছু অর্থ বাটা হিসেবে বাদ দিয়ে উক্ত পত্রের শর্ত অনুযায়ী টাকা ফেরত নিতে পারত। সুদ, বিমা খরচ ও টাকা বহনের জন্য খরচ সাধারণত বাটার অন্তর্ভুক্ত হত। মুসলিম আমলে ভারতে ব্যবসা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হুণ্ডি ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছিল। হুণ্ডি credit বা ব্যাংকে

জমানো টাকার কাজ করত এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নগদ অর্থ পরিবহনের ঝুঁকি থেকে টাকার মালিককে রেহাই দিত। এই ব্যবস্থা মুসলিম আমলে আন্তর্জাতিকভাবে চালু হয়েছিল। ঢাকায় শায়েস্তা খানের কাছ থেকে নগদ অর্থ না নিয়ে কাশিম বাজারের জন্য হুণ্ডি নিতে ট্যাভারনিয়ারকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। নইলে নাবিকগণ ওই টাকা আত্মসাৎ করতে পারত। জগৎ শেঠ হুণ্ডি করে দিল্লিতে টাকা পাঠাতেন।[৭৮]

বিদেশিদের পাশাপাশি দিল্লিও সুবে বাংলার সম্পদের উপর হাত বাড়াতে শুরু করে। সম্রাট জাহাঙ্গির বছরে ১০ লক্ষ টাকা করে বাংলা থেকে ব্যক্তিগত কোষাগারে নিতে শুরু করেন। ১৬৭৮ সালে শায়েস্তা খান দিল্লির বাদশাহকে একবার নগদ ৩০ লাখ টাকা এবং ৪ লাখ টাকা মূল্যের সোনার গয়না পাঠান। শায়েস্তা খান এবং অন্যান্য রাজকর্মচারী অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য রাজ কোশাগার লুটসহ ঘুষ ও উৎকোচের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য তারা সকলেই দালাল জোগাড় করেন। শায়েস্তা খানের নিজের অর্থলিপ্সা এম প্রচণ্ড ছিল যে পশুখাদ্য ব্যবসায়ও একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করত। জনৈক ব্যবসায়ী লেখেন, ১৩ বছর বাংলার গভর্ণর থেকে শায়েস্তা খান যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন তা সমকালীন বিশ্বে বিরল। তার দৈনিক আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা।

১৬৮২ সালে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্নর উইলিয়াম হেজেজ শায়েস্তা খানের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের দুর্নীতিতে তাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি দেখে রাজা জেমসকে বুঝিয়ে ১৬৮৬ সালে স্বদেশ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। ১৬৯০ সাল পর্যন্ত মোগল শক্তির সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ চলে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ের সুবিধা তারা আদায় করে নেন।

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল দরবার ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত হয়। ১৭১২ সালে বাদশাহ শাহ আলমের মৃত্যুর পর মোগল প্রশাসন অবনতির চরম পরিণতিতে উপনীত হয়। সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁর নেতৃত্বে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নবাবতন্ত্র শুরু হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন দক্ষ প্রশাসক। তাঁর রাজস্ব আদায়ের কলাকৌশল এবং শোষণ, লুণ্ঠন ও বিলাসব্যসনের পাশাপাশি ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর অর্থনৈতিক পীড়নে বাংলার অর্থনীতি ও সামাজিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির আমবাগানে যুদ্ধ নামক নাটকের মধ্য দিয়ে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে। যুদ্ধের পূর্বাহ্নে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রধান ক্লাইভ কয়েকজন আমলা ও নবাবের কয়েকজন প্রভাবশালী সেনাপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনোরূপ যুদ্ধ না করেই ক্লাইভ ষড়যন্ত্র ও হীন চক্রান্তের দ্বারা পলাশির যুদ্ধে জয়ী হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। পলাশির যুদ্ধের পর তাঁরা বাংলায় একচেটিয়া

বাণিজ্যাধিকার স্থাপন করে। এ বাণিজ্যকে লুণ্ঠনের নামান্তর বলে আখ্যা দেয়া যায়। তাঁরা অবাধে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করে ইংল্যান্ডে পাঠাতে থাকে। বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদেই ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব তরান্বিত ও বাস্তবায়িত হয়।

প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানি ভারতের রাজনীতির মঞ্চে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। যুদ্ধের পর কোম্পানির সহায়তায় মিরজাফর বাংলার সিংহাসনে বসেন। মিরজাফর ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কোম্পানির কৃপায় তিনি নবাবপদ লাভ করেছেন, ফলে তিনি কোম্পানির বশংবদ ব্যক্তিতে পরিণত হন। এ সময় থেকে বাংলার নবাবের স্বাধীন সত্তাও বিলুপ্ত হয়। বাংলার শাসন ক্ষেত্রে কোম্পানির ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ শেষ পর্যন্ত মিরজাফরকেও কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করে। মিরজাফর কোম্পানির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য এক চক্রান্তে লিপ্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়।

কোম্পানির তত্ত্বাদধানে নিযুক্ত পরবর্তী নবাব তাঁরই জামাতা মির কাশিম। তাঁর চরিত্রে দূরদর্শিতা, রাজনীতিজ্ঞান এবং সুদক্ষ শাসকের গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি প্রথম থেকেই কোম্পানির প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতে কৃতসংকল্প ছিলেন। ফলে কোম্পানির উদ্ধত আচরণ ও দাবিদাওয়ার প্রতিবাদে তিনি কোম্পানির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মিরকাশিম অসাধারণ কূটনীতিকজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা এবং দিল্লি থেকে বিতাড়িত এবং অযোধ্যায় অবস্থানরত মোঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমকে নিয়ে ইংরেজ বিরোধী জোট গঠন করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ১৭৬৪ সালে বকসারের যুদ্ধে এই জোট ইংরেজ বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মিরকাশিম অযোধ্যা থেকে পালিয়ে যান এবং বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানির হাতে বন্দি হন। চতুর ক্লাইভ কোম্পানির স্বার্থে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারাজিত বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে ১৭৬৭ সালে এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। সন্ধির অন্যতম শর্ত হচ্ছে কোম্পানি বাদশাহকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর হিসেবে দেবে এবং বিনিময়ে কোম্পানি বাংলায় দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। ১৭৫৭ সাল থেকে কোম্পানি বাংলার সুবার ওপর যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করেছিল দেওয়ানির অধিকার সেই প্রতিপত্তিকে বৈধতা দান করে। কোম্পানির দেওয়ানি অধিকার লাভের ফলে নবাবের পদ বাহ্যিকভাবে বজায় থাকলেও তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা লোপ পায়। নবাবের দায়িত্ব আইনগত থাকলেও কার্যত তাঁর কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না। রাজনীতির ইতিহাসে এ উদ্ভট ব্যবস্থাই 'দ্বৈত শাসনব্যবস্থা' (Diarchy) নামে পরিচিত।

কোম্পানি দেওয়ানি অধিকার লাভের পর ক্লাইভ বাংলার নবাবের সঙ্গে এক বন্দোবস্ত করেন। নবাব বছরে ৫০ লক্ষ টাকা বৃত্তির পরিবর্তে বাংলার রাজস্বের ওপর সব দাবি ত্যাগ করতে সম্মত হন। কিন্তু পুলিশ ও বেসামরিক শাসনভার

পূর্বের মতো নবাবের হাতেই থেকে যায়। কোম্পানি রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নামে দুজন ব্যক্তিকে যথাক্রমে বাংলা ও বিহারের নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত করে। এই দুই কর্মচারীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করা, বিশেষত রাজস্ব সংগ্রহ করে কোম্পানির হাতে তা প্রেরণ করা।

ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার কোনো উপযুক্ত ক্ষমতা নবাবের না থাকায় দেশের সর্বত্র অরাজকতা দেখা যায়। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধির নীতি জনসাধারণের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এমনকি কর সংগ্রাহকের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য কৃষকরা কাজ বন্ধ করে বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। ১৭৭০ সালে বাংলায় সংঘটিত হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষকে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর–বাংলা ১১৭৬) দ্বৈত শাসনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন 'আনন্দমঠ' নামক উপন্যাস।[৭৯] তাঁর ভাষায় :

> ১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই। সুতরাং ১১৭৫ সালে কিছু মহার্ঘ্য হইল। লোকের ক্লেশ হইল ; কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল।... আশ্বিন কার্ত্তিকে এক বিন্দু বৃষ্টি পড়িল না। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের কর্তা একেবারে দশ টাকা বাড়াইয়া দিল। বাংলায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। প্রথমে লোকে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয় ? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর কোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল, জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জমিজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী কে কেনে ? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়।

এ দুর্ভিক্ষে জনগণের জীবনযাত্রা ও নৈতিকতার মান বিশেষভাবে নিম্নাভিমুখী হয় এবং সমাজ জীবন পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। বরং কৃষকের কাজে রাজস্ব আদায়ে তাঁরা আরও বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁরা এরই সঙ্গে ধ্বংস করে বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। কৃষির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অব্যবস্থা দেখা দেয় তাঁর প্রতিফলন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। দেশীয় বণিকদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য এখন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। বাংলার বিখ্যাত রেশম বস্ত্র ও কার্পাস বস্ত্র, বয়ন শিল্প কোম্পানির কুটচালে ভেঙ্গে পড়ে। কোম্পানি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে দেশীয় বণিক ও কারিগরদের জীবিকার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং দেশীয় অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করে।

বাংলার মানুষের উপর নেমে আসে শোষণ ও নির্যাতন। বাংলার মানুষের জীবন হয়ে ওঠে অমানবেতর। ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫) বাংলায় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার 'পাঁচশালা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কর্নওয়ালিস ১৭৭৯ সালে 'দশশালা' এবং ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী' বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে জমিদার স্থায়ীভাবে জমির মালিকে পরিণত হয় এবং জমির রায়তরা রূপান্তরিত হয় প্রজা সাধারণে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল কৃষিনির্ভর বাংলার মানুষকে আরও বিপর্যস্ত করে দেয়। এ আঘাত পড়ে গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে। শোষণ-নির্যাতন ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিহত করার জন্য বাংলার মাটিতে বারবার বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে। সংগঠিত হয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৭-৮৩), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), নীল চাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (১৭৭৮-১৮৮৯), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), যশোর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪-৯৬), বীরভূমে গণবিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন ও ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮৩১-১৮৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭), ময়মনসিংহে কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), ময়মনসিংহে সাম্যপন্থী (ইংরেজ কথিত পাগলপন্থী) করিম শাহ ও টিপু পাগলার বিদ্রোহ (১৭৭৫, ১৮২৫-২৭), ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৪৪-৯০), লবণ শিল্পে মালঙ্গি বিদ্রোহ (১৭৮০-১৮০৪), রেশম চাষিদের সংগ্রাম (১৭৭০-১৮৮০), বীরভূম বাঁকুড়ার পাহাড়িয়া বিদ্রোহ (১৭৮৯-৯১), সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।

বাংলায় কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অরাজকতা দেখা দেয়। ফলে হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলমান ফকির সম্প্রদায় কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা ক্ষধার্ত চাষি, অধিকারচ্যুত জমিদার শ্রেণির এবং কর্মচ্যুত সৈনিকদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। বঙ্কিম কর্তৃক তাঁর উপন্যাসে সৃষ্ট মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানি প্রভৃতি চরিত্রের ঐতিহাসিক পটভূমি এই পরিপ্রেক্ষিতে বিধৃত।

কোম্পানির শাসনের কুটকৌশলে আর্থ-সামাজিক কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম হতাশা দেখা দেয়। মুসলমান সমাজের হতাশা এবং ইংরেজ অপশাসনকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে ভারতে ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচালিত হয়। 'ফরাজি' কথার অর্থ হল ইসলামের পবিত্র আদর্শে বিশ্বাস। হাজি শরিয়তুল্লাহ নামক মুসলিম ধর্মজ্ঞানী বাংলার ফরাজি আন্দোলনের উদ্গাতা। ধর্মীয় খোলসে এ আন্দোলনের সূচনা হলেও এর প্রধান ভিত্তি ছিল অর্থনীতি এবং শীঘ্রই এ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ওহাহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ। ধর্মীয় আন্দোলনের মোড়কে এর সূত্রপাত ঘটলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। বাংলায় তিতুমিরের নেতৃত্বে ওয়াহাবিগণ সংগঠিত হয়। তিনি কৃষকদের

স্বার্থরক্ষার জন্য জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং তিনি ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করেন। এই দেশপ্রেমিক বসিরহাট থানার নারকেল বেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লায় ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন।

আদিবাসীদের বিদ্রোহের মধ্যে বাংলার সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে সাঁওতালদের ওপর জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার চরমে ওঠে। সিধু ও কানহু নামে দুই ভ্রাতার নেতৃত্বে ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সাঁওতালগণ কোম্পানির অধীনতা অস্বীকার করে এবং স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য স্থাপন করে। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইংরেজ সেনাবাহিনীর সাথে তাদের তুমুল যুদ্ধ চলে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নির্মম পরাজয় ঘটে। এসব আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ সারা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। ১৮৫৭ সালে প্রচণ্ড আকারে দেখা দেয় সিপাহি বিদ্রোহ–ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ও বিদ্রোহও নির্মমভাবে দমন করে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের নির্মমতা ছিল নজিরবিহীন। শত শত বিদ্রোহীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয় এবং শত শত বিদ্রোহীকে প্রকাশ্য জনপথে গাছের সাথে লটকিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার করে মৃত্যু দেয়া হয়। এটা করা হয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ও ত্রাস সঞ্চারের জন্য। ৫৭ বিদ্রোহের ব্যাপারে ভারতবাসীর জন্য একটা তাৎক্ষণিক ইতিবাচক ফল এই ফলে যে ১৮৫৮ সাল থেকে কোম্পানি শাসন অবসান করে সরাসরি ব্রিটিশ রাজত্বের অধীনে নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। এভাবে অন্তত ধূর্ত ক্লাইভ প্রতিষ্ঠিত লুটপাটের শাসনের অবসান ঘটে এবং অন্তত কৈফিয়ৎ জানানোর ব্যাপারে ভারতবাসীর একটা আইনি ভিত্তি স্থাপিত হয়।

কোম্পানি ও ব্রিটিশ রাজ্যের প্রায় দুশো বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনে বাংলার কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। আবহমানকালের বাংলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ভেঙে যায়। নীল চাষ প্রবর্তনায় বাংলার কৃষক অত্যাচারিত হয়, নির্যাতিত হয় অপমানিত হয়। লবণ আইন বাংলার মানুষের শোষণের হাতিয়ার। বাংলার দুহাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পের ধ্বংস সাধন করে। দেশের অভ্যন্তরে দালাল ও সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করে সামজকে ভীতু দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। পাল যুগের পরে ক্রমে ক্রমে যে কৃষি ও গ্রামীণ সমাজ আমাদের সভ্যতার মেরুদণ্ড স্বরূপ হয়ে ওঠে তা ব্রিটিশ কুশাসনে ভেঙে পড়ে। তারা আমাদের বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচার করে। সর্বোপরি বাঙালির হাজার বছরের লালিত-অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধে ধর্মীয় বিভেদবোধ জাগিয়ে দিয়ে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। এটা বাঙালির সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্টের এক নজিরবিহীন ষড়যন্ত্র।

ব্রিটিনের কাছে আমরা কি পাই? মধ্যযুগের অবসান। কতিপয় প্রশাসকের কাছে আমরা পাই শিক্ষা, অনুসন্ধিৎসা, উদার মানবতাবাদী চিন্তাদর্শ। এডাম বার্ক, উইলিয়াম জোন্স, ব্যারিংটন মেকলে, জন মার্শাল, এ. জে. গিয়ার্সন, আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রমুখ মনীষী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাচেতনার প্রতি আমাদের উন্মুখ করে তোলে।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে আমরা এর সুফল পেতে শুরু করে। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ যোগ আধুনিক বাংলা এমনকি আধুনিক ভারতেরও তিনি পথিকৃৎ। আধুনিক শিক্ষা, চিন্তা- চেতনা, মননচর্চায় উনিশ শতকের যে জাগরণ তার প্রথম ঢেউ লাগে বাংলায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ত্রয়ী মনীষী আধুনিক বাঙালি মনীষার স্থপতি এবং রবীন্দ্রনাথ এই তরঙ্গের সর্বোৎকৃষ্ট ফসল– যেন সূর্য কিরণ। এই কিরণেরই আর এক প্রভা, আর এক স্ফুরণ নজরুল ইসলাম। রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন নেতাজি সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎ বসু, শের-ই-বাংলা ফজলুল হক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ দেশপ্রেমিক অমিততেজী ব্যক্তিত্ব।

আমরা কিঞ্চিৎ পেছনে তাকালে কি দেখি। বাঙালির জ্ঞানচর্চায় ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ধারায় পাল আমলের চারশো বছরের ইতিহাসে জ্ঞানবিজ্ঞান ও মননচর্চার যে ইঙ্গিত পাই, তা আজও বাঙালিকে গর্বিত করে। কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হলেও পাঠান সুলতানদের আমলে একবার জ্ঞানচর্চার জোয়ার আসে বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, ইসলামের সুফি ও মরমিয়াবাদের সংমিশ্রণে-সমন্বয়ে উদ্ভূত শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে বৈষ্ণব দর্মান্দোলনে ধ্বনিত হয় মানবতার জয় গান। এর কিছু কাল পরে আবির্ভূত হন বাউল পুরোহিত পালন। তিনি সকল জাত-ধর্ম-বর্ণ পরিহার করে মানবতাবাদের পতাকা উড্ডীন করেন। রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ, মুসলিম ঐতিহ্য থেকে অনুবাদ, পুঁথি সাহিত্য সর্বোপরি এক সমন্বিত সাংস্কৃতিক জোয়ার উদ্ভাসিত হয়।

অতীশ দীপঙ্কর ও শ্রীচৈতন্য এ দুই মনীষী দুই কালের প্রধান প্রতিনিধি। সেকালে বাঙালির জ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃতি: দীপঙ্করের প্রধান অবলম্বন ছিল সংস্কৃতি; শ্রীচৈতন্য সংস্কৃত ভাষাকে প্রভাবিত করলেও তাঁর ভাবধারায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা। বাঙালির অনুভূতি, চিন্তা ও জাতীয় চরিত্রও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা। ষোড়শ শতাব্দীকে বাঙালির জাগরণের কাল বললে অত্যুক্তি হয় না।

উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তা-চেতনায় জ্ঞানচর্চায় পুনরায় এক সমৃদ্ধির কাল আগত হয়। ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার আন্দোলন, মানবপ্রেম, দেশপ্রেমের স্ফুরণ, নতুন সাহিত্য সৃষ্টির যে ঘটনা প্রবাহ, সমাজে যে গতিশীলতা আসে তাকে বাংলার জাগরণ বা রেনেসাঁস বলা যুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে করি। তাহলে আমরা

তিনটি জাগরণ প্রত্যক্ষ করছি। এক. পালযুগে শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, জয়শ্রী মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত, দিবাকর চন্দ্র, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মণ, চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাসের কাল, মুসলমান আমলে শ্রীচৈতন্যের কাল এবং ইংরেজ আমলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম-মধুসূদন,, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের আধুনিক কাল।

১৮৫৭'র বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমনের অনতিপরে (অল্প কিছু কালের মধ্যেই) বাংলা সাহিত্যে যে ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি দেয়া দেয়; এবং তাতে যেভাবে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে তাতে করে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে ওই বিদ্রোহ লেখকদের প্রাণে জাতীয় চেতনা বিকশিত করেছিল—এমনকি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করেন কালজয়ী মহাকাব্য। 'মেঘনাদবধ' এবং অসংখ্য সনেট—যার প্রতিপাদ্য ছিল দেশপ্রেম ও মাতৃভাষা প্রেম। এ বিদ্রোহে আমাদের বীরেরা পরাজিত হয়েছিল বটে, তবে এই দ্রোহ জাতির অন্তর্জগতে ইতিবাচক সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। এরই ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন, খিলাফতি, ফরায়েজি-ওয়াহাবি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন অসাধারণ বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করে।[৮০]

কোম্পানি আমলের গোড়ার দিকে ১৭৬৩ থকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এবং বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সংঘটিত হয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ। এর নেতৃত্বে ছিলেন মজনু শাহ, মুসা শাহ, করম শাহ, টিপু শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, নুরুল মোহাম্মদ, পীতাম্বর প্রমুখ। এ ছাড়া ত্রিপুরার শমসের গাজি, বলাই ও দুনিচাঁদ, সরদার বিশ্বনাথ, তিতুমীর, হাজি শরিয়তুল্লাহ, পুত্র দুদু মিঞা, সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিদু ও কানু, বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখ অত্যাচারের প্রতিবাদে স্থানীয় জনসাধারণকে নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেন। এ সব আন্দোলন ইংরেজ প্রশাসনের ভিত কাঁপিয়ে তুলেছিল। ইংরেজ তার নিষ্ঠুর হত্যালীলা ও ধূর্ত চাতুরির জোরে এসব বিদ্রোহ দমন করেছে।

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপস্নবের পর তাদের বস্ত্র শিল্পের চাহিদা মেটাতে ১৮১৫-১৬ সালে বাংলায় ১,২৮,০০০ মন নীল তৈরি করতে হয়েছিল। নীল চাষের জন্য বাংলার কৃষকের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল-দর্পণ' নাটকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত করেন। আমরা এক লোকপ্রচলিত ছড়ায় পাই, 'নীলের দাদন ধোপার ত্যানা/একবার লাগলে ওঠে না'। নীল বিদ্রোহের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ বিশ্বনাথ। সর্দার বিশ্বনাথ ১৮০৮ সালে বারোজন সঙ্গীসহ ধরা পড়েন। বাঁশবেড়িয়া নীলকুঠির কাছে এক বট গাছে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানো হয় তাঁদের। নীল বিদ্রোহের পরবর্তী নায়ক তিতুমিরের নেতৃত্বে এক পর্যায়ে চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, ফরিদপুর নিয়ে এক বিরাট ভূখণ্ড মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। বলতে দ্বিধা নেই যে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সাধারণ দীন মজুর, গরিব কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষ। শেষ পর্যন্ত এই দেশপ্রেমিক ১৮৩১ সালের

১৯ নভেম্বর বারাসতে ইতিহাসখ্যাত 'বাঁশের কেল্লা'র লড়াইয়ে যুদ্ধরত অবস্থায় পঞ্চাশজন সহযোদ্ধাসহ শহিদ হন।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি গোপন সন্ত্রাসবাদী দলের মাধ্যমে বাঙালির বিপস্নব সাধনা ও সংগ্রামী চেতনার ধারা এগিয়ে চলে। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করে দু'দিনের জন্য চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাখে। সূর্য সেন ধরা পড়েন এবং ১৯৩৪ সালে তাঁর ফাঁসি হয়। সূর্য সেনের সতীর্থ ছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ। বিশ শতকের গোড়া থেকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বাংলার নেতাকর্মী ও জনতা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়। বাঙালি বীর নেতাজি সুভাষ বসু উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেন। তবে তাঁর আকস্মিক অর্ন্তধানে এ সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

বাংলার সীমানা

হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ কবির এই কাব্যিক ব্যঞ্জনাময় বাংলার ভৌগোলিক সীমার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। কবি সুকান্ত (১৯২৬-৪৭) যখন এ কাব্যবাণী রচনা করেন তখন ব্রিটিশ রাজত্বের কবর খোঁড়ার কাজ চলছে এবং বাংলার প্রতি ব্রিটিশ শাসকের ষড়যন্ত্রের শেষ আঘাত বাংলাকে খণ্ডিত করার একরৈখিত সিদ্ধান্ত প্রায় পাকাপোক্ত। আর কদিন পরে বাংলার মানুষের হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন রেডক্লিফের কলমের খোঁচায় দ্বিখণ্ড করা হবে। বাঙালির ইতিহাসের এ এক মর্মন্তুদ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা প্রসঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কাব্যিকতা করে জনৈক কবি লিখেছেন :[৮১]

'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্ধক্ষিণঞ্চ যৎ।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম ধত্রেয়ং ভারতা প্রাজা ॥

এর বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় : 'যে দেশ সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ, তার নাম ভারতবর্ষ, এখানকার প্রজাগণ ভারতী নামে প্রসিদ্ধ'। আদি বাংলা ভৌগোলিক সীমানার নিশানা অনেকটাই উল্লেখিত সীমানার ইঙ্গিত বহন করে। বাংলার উত্তরে বিশাল শিলাময় হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে, বিস্তীর্ণ সাগর যার প্রান্তসীমায় রয়েছে সবুজ বনাঞ্চল; পশ্চিমের সীমানায় পরিবর্তন এসেছে বরাবর—পূর্ব সীমান্তের আংশিক পরিবর্তন ঘটেছে কয়েকবার।

বৃহৎ বাংলার সীমারেখা নিয়ে ইতোপূর্বে অনেক আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। আমরা শশাঙ্কের বাংলা, পাল আমলের বাংলা, সেন আমলের বাংলা এবং খণ্ড খণ্ড জনপদগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে ইতিহাস, পুরাণ, শিলালিপি,

সাহিত্য ও দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে তথ্যপূর্ণ বিশেস্নষণের প্রয়াস নিয়েছি। আমরা এখানে মোগল সাম্রাজ্যের নথিপত্র এবং ব্রিটিশ প্রশাসনিক দলিলপত্র থেকে কিঞ্চিৎ সাহায্য নিতে পারি।

মুগল সাম্রাজ্যের যে কয়টি বিভাগ বা প্রদেশ ছিল তার মধ্যে বাংলা অঞ্চল বা সুবা বাংলা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তদেশে। যার বিস্তৃতি ছিল ভাগীরথীর পূর্ব প্রান্ত থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। সম্রাট আকবরের সময় বাংলাদেশ ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। এর মহাল ছিল ৬৮৯টি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় আরও কিছু নতুন এলাকা সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, বিহারের অংশ বিশেষ, পশ্চিম আসাম, ত্রিপুরা, ছোটোনাগপুর প্রভৃতি।

কতগুলি নিজস্ব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বংলা একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল এবং এগুলো বাংলাকে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা করে রেখেছে। আবুল ফজল সুবা বাংলার ভুগোল সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে "বাঙ্গালাহ দ্বিতীয় অঞ্চলে (ইকলিম) অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগর্হি পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য চারশত ক্রোশ। এর পূর্ব ও উত্তর সীমায় পর্বত, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এদেশের প্রান্তসীমায় আছে কামরূপ এবং আসাম।" জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুজুব' গ্রন্থে উলেখ করেন "বাংলা দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি বিশাল দেশ। সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম থেকে গর্হি পর্যন্ত ৪৫০ এর দৈর্ঘ্য এবং উত্তরের পর্বতমালা থেকে মান্দারন অঞ্চল পর্যন্ত ২২০ এর প্রস্ত।

আইন-ই-আকবরি'তে বাংলার যে ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে বিভাগ পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক প্রকৃতির মিল রয়েছে। বাংলার উত্তর দিকে চলে গেছে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণি।

বঙ্গোপসাগর-বিধৌত এর দক্ষিণাঞ্চল এবং বিখ্যাত 'রয়াল-বেঙ্গল টাইগার' অন্যান্য বন্য প্রাণীর আবাসভূমি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবন এর দক্ষিণে শেষ সীমারেখা টেনেছে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে এ প্রদেশকে উর্বরা ও শস্যশ্যামলা করে তুলেছে। এর পূর্বসীমায় গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বতরাজি অবস্থিত। খরস্রোতা গঙ্গা, মহানন্দা ও এদের বহু শাখা-প্রশাখা এর পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত এবং রাজমহলের পাহাড়, ঝাড়খণ্ডের বনাঞ্চল, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি এর পশ্চিম-সীমানা বেষ্টিত।

অসংখ্য পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র ও বনজঙ্গল ইত্যাদি প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তির দরুন বাষ্পীয় পোতের প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বহুকাল বাংলাদেশে প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশী, তিব্বত, চিন ইত্যাদি দেশগুলোর সঙ্গে এর যাতায়াত ছিল দুঃসাধ্য, কেবল ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির মতো দুঃসাহসী এ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে সাহস করেছিলেন (১২০৪ খ্রি.)। খরস্রোতা পার্বত্য নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি আসাম ও কামরূপের সঙ্গে

বাংলার সংযোগ স্থাপনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। আরাকান ও মিয়ানমারের সঙ্গে জলপথে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংকীর্ণ পথেই এর একমাত্র সামান্য যোগাযোগ ছিল। পশ্চিম প্রান্তের দীর্ঘ বনের সারি, পাহাড় ও নদী-নালা ইত্যাদি থাকার জন্যে উত্তর ভারত থেকে, বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত দিয়ে বাংলায় প্রবেশ মোটেই সহজ ছিল না। তেলিয়াগর্হি, ত্রিহুত ও ঝাড়খণ্ড কেবল এই তিনটি দুর্গম পথে বাংলার সঙ্গে এই উপমহাদেশের যোগাযোগ সম্ভব ছিল। নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত 'বাঙালীর ইতিহাস' আদিপর্ব থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপ করে বলেন :

> বাংলার প্রাকৃতিক সীমা : উত্তরে হিমালয় এবং তার গায়ে নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর-সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিকা-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণি বেয়ে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল সাঁওতাল পরগনা, ছোটোনাগপুর, মানভূম, ধলভূম, কেওঞ্জর, ময়ূরভঞ্জের অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোসাগর। এই সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়, পুণ্ড্র বরেন্দ্রী, রাঢ়া, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; এরই মাঝখানে ভাগীরথী, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা এবং অসংখ্য নদনদীতে ঘেরা বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড় আর অরণ্য। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।[৮২]

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত চর্যাপদের আলোচনায় বাংলার সীমান্ত প্রসঙ্গে বলেন :

> চর্যাপদকে আমরা যখন বাংলা সাহিত্য বলিয়া আলোচনা করিব তখন ব্রিটিশ সরকার তাঁহার শাসনকার্যের জন্য ইচ্ছামতো শিকল টানিয়া পূর্বে-পশ্চিমে এবং উত্তরে-দক্ষিণে বাংলাদেশের যে সীমারেখা স্থির করিয়া দিয়াছিল তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমি এখানে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমানা-নির্ধারণ-রূপ গবেষণার অবতারণা করিতে চাহি না, তবে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে মোটের উপরে বলা যায়, চর্যাপদের ভিতরে প্রতিফলিত হইয়াছে যে বাংলাদেশ তাহা নিম্নব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যার কিয়দংশ, বর্তমান বিহারের কিয়দংশ এবং কামরূপ বা বর্তমান আসামের কিয়দং লইয়া একটি বৃহৎ ভূভাগ।[৮৩]

প্রথম দিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে সমগ্র ভারত বারোটি প্রশাসনিক জোনে বিভক্ত ছিল। যেমন ১. বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ২. বোম্বে,৩. মাদ্রাজ, ৪. উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ৫. পাঞ্জাব, ৬. আসাম, ৭. মধ্যপ্রদেশ, ৮. ব্রিটিশ ব্রহ্ম, ৯. রেবার, ১০. মহীশূর ও কুর্গ, ১১, রাজপুতনা, ১২. মধ্যভারত। তখন বাংলার আয়তন ছিল পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্ত থেকে ব্রিটিশ ব্রহ্মের সীমানা পর্যন্ত। একথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে সে সময় যুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম বাংলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ব্রিটিশ প্রশাসন রাজনৈতিক কারণে বাংলা অঞ্চলকে খর্ব করার অপচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। এক সময় বিহার, উড়িষ্যা, ছোটোনাগপুর ও আসাম ছেঁটে ফেলার পরও ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। কেননা তারা একথা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় যে, বাংলা একদিন তাদের জাতীয় স্বার্থের হুমকি হয়ে দাঁড়াতে

পারে! এ আশঙ্কায় ১৯০৫ সালের ১৭ অক্টোবরে তারা বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। কিন্তু দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ বঙ্গভঙ্গ রহিত করতে বাধ্য হয়।

ভারতবর্ষের জনমণ্ডলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, অহংবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, স্বদেশপ্রেম, ঐতিহ্যগরিমা, স্বদেশচেতনা, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি উদ্গাতা এই বাঙালি—আর এই বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ঘটে। অকুতোভয় দেশপ্রেমিক ১৪ বছরের কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসি কার্যকর হয় ১৯০৮ সালে। মাত্র ২৫ বছর বয়সে আত্মাহুতি দিয়ে বিশ্বজনের কাছে দেশপ্রেমের বিরল নজির স্থাপন করেছেন যতীন দাস। সেদিন চতুর ব্রিটিশ প্রশাসন সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে বাঙালি যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছে তাকে আর সামাল দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। মহম্মদ আলি জিন্না ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই দেশ বিভক্ত হয়। বঙ্গ বিভাজন করায় ব্রিটিশ তার পূর্বকৃত সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়নের সুযোগ নেয়—রেডক্লিফের কলমের খোঁচায় বাংলার বুকে এঁকে দেয়া হয় প্রায় অমোচনীয় রক্তরেখা। ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ফলে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের হাজার বছর লালিত বাসভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের দুই প্রদেশে রূপান্তরিত হয়। একটি পশ্চিমবাংলা প্রদেশ অপরটি পূর্ববাংলা পরে পূর্ব পাকিস্তান।

কিন্তু অল্প কিছুকালের মধ্যেই দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে ওঠে বাংলার সন্তানেরা মাতৃ নামের এ অসম্মানের বিরুদ্ধে পুনরায় আন্দোলন সংগঠন করে। এ আন্দোলনের একটি মাইল স্টোন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি—মাতৃভাষা রক্ষার জন্য তারা বুক পেতে দেয় পাকিস্তানি সামরিক জান্ত ার বুলেটের সামনে। যাদের রক্তের ঋণে ২১ ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সম্মানে সিক্ত। অতঃপর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃহৎ বাংলার এক অংশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে সার্বভৌমত্ব অর্জন করে। বাঙালি জাতি বর্তমানে দুটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রে বিভক্ত। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং অপরটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশ। এছাড়া ভারতবর্ষ ব্যাপী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুল সংখ্যক বাঙালি ও বাংলাভাষী মানুষ বসবাস করে। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে আমেরিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, প্রতীচ্যের জাপান পর্যন্ত বাঙালিরা গড়ে তুলেছে বাংলাভাষাঞ্চল। যাকে আমরা আন্তঃবাংলা ভাষাঞ্চল বলতে পারি। জনসংখ্যার দিক থেকে বাঙালি জাতি আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি হিসেবে পরিচিত।

যে জাতির আছে শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, যে জাতির আছে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস, শ্রীচৈতন্য, যার আছে রাজা রামমোহন রায়, কবি লালন শাহ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্র-নজরুল, বেগম রোকেয়া যে জাতির রয়েছে তিতুমির, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, যার রয়েছে সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো রাজনৈতিক রূপকার, যার রয়েছে স্যার জগদীশ, মেঘনাদ সাহা, কুদরত-ই-খোদা, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন বসু, ড. আহমদ শরীফ, অর্মত্য সেন প্রমুখের মতো গৌরবদীপ্ত এক একটি নাম যারা বিশ্বজগতের মানবসভ্যতা ও মানবতার আলোর স্ফুরণকারী এক একটি নক্ষত্র স্বরূপ—যাদের জন্য বাঙালি বিশ্ব মানচিত্রে গর্বিত এক অনন্য জাতি। তার স্বতাজ্য অহমিকা একটু আধটু আছে বইকি। আমি তো বলি যে থাকাটাই স্বাভাবিক।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. এম. এ. রহিম, অনু. আসাদুজ্জামান, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১।
২. ড. মো. মতিউর রহমান, বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুলাই ২০০০, পৃ. ১৭৫।
৩. আসমুদ্রহিমাচল আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ বা বাংলা দেশ। বাংলা বা বাঙ্গালা নামটা এল কোথা থেকে? আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা হয়েছে। আল বলতে শুধু খেতের আল নয়, ছোটোবড়ো বাঁধও বোঝায়। বাংলাদেশ জল-বৃষ্টির দেশ: ছোটো বড়ো বাঁধ না দিলে বৃষ্টি, বন্যা আর জোয়ারের হাত থেকে ভিটে-মাটি-খেত-খামার রক্ষা করা যায় না। যে অঞ্চলে জলকম হয়, সে অঞ্চলে বর্ষার জল ধরবার জন্যে বাঁধের দরকার। তাই আল্ বেশি বলেই এদেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ।
বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বাঙালীর ইতিহাস (ড. নীহাররঞ্জন রায়কৃত 'বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব' সংক্ষেপিত), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৭।
৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, (ঐ.) পৃ. ১৮
৫. ড. আনিসুজ্জামান (সম্পা.) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭, পৃ. ৫১।
৬. ঐতিহাসিকদের মতানুসারে সেন রাজবংশের রাজাদের কাল নির্ণয় : সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন (অজ্ঞাত), বিজয় সেন ১০৯৭–১১৬০ খ্রি. বল্লাল সেন ১১৬০–১১৭৮ (আ.) লক্ষ্মণ সেন ১১৭৮–১২০৬ (আ.), বিশ্বরূপ সেন ১২০৬–১২২০ (আ.) এবং কেশব সেন ১২২০–১২২৩ (আ.)। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস : সেন যুগ, ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৮।
৭. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ওই, পৃ. ২০।

৮. অজয় রায়, বাংলা ও বাঙালি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৪।
৯. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
১০. ড. আহমদ শরিফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, নিউ এজ পাবলিকেসন্স, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ. ১।
১১. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
১২. সৈয়দ আমিরুর ইসলাম, বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪।
১৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।
১৪. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
১৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
১৬. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
১৭. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারত, অনু. সুমন চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯, পৃ. ২০২।
১৮. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
১৯. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
২০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
২১. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
২২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
২৩. ড. মুহম্মাদ আবদুল জলিল, বাংলাদেশের ফোকলোরের ইতিহাস, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৪।
২৪. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
২৫. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, পৃ. ২৪।
২৬. ড. আনিসুজ্জামান (সম্পা.) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
২৮. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
২৯. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
৩০. রামশরণ মর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২-২০৩।
৩১. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
৩২. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
৩৩. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৩৪. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
৩৫. আবদুল মোমেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৩৭. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
৩৮. অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
৩৯. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
৪২. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৪৩. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
৪৪. ড. আহমদ শরিফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৪৬. মোবাশ্বের আলী, বাংলাদেমের সন্ধানে, পৃ. ২।
৪৭. ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজবিবর্তন, পৃ. ৩১।
৪৮. আশুতোশ ভট্টাচার্য, বাংলা লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৫১।
৪৯. রামশরণ শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২।
৫০. ড. আহমদ শরিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৫১. আবুল মমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৫২. ড. আহমদ শরিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৫৪. আবুল মমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
৫৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
৫৮. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৪।
৫৯. আবুল মমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
৬০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
৬১. শাহানারা হোসেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (১ম খণ্ড) 'বাংলার ঐতিহাসিক পরিচয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬।
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৬৪. সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩।
৬৫. ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
৬৮. ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।
৬৯. ড. কল্পনা ভৌমিক, কবীন্দ্র মহাভারত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩২।
৭০. আবুল মমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।
৭১. ড. মমতাজুর রহমান তরফদার (অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান), হোসেন শাহী আমলে বাংলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৫, ১ম প্রকাশ ২০০১, পৃ. ২৭১।
৭২. ড. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

উদ্ধৃতি : 'সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ছিলেন বাঙ্গালী কবিদের সবচেয়ে উদার পৃষ্ঠপোষক ও বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে খুবই উৎসাহী।... হোসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরগল খান তাঁর দরবারে হিন্দু ও দর্শনের আলোচনায় অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন। এটা তাকে মহাভারতের বাংলা অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করে; যাতে সাধারণ লোকেরা এ গ্রন্থের মর্ম বুঝতে পারে।...সুলতান হোসেন শাহের উত্তরাধিকারীগণ বাংলা সাহিত্যের কবিগণের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা দানের নীতি অব্যাহত রাখেন।'

৭৩. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৭৪. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।
৭৫. আবুল মমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
৭৬. শিপ্রা সরকার, সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৫৬।
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।
৭৮. ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, মধ্যযুগের বাংলা প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ২৯-৩০।
৭৯. মোবাশ্বের আলী, বাংলাদেশের সন্ধানে, পৃ. ৮০।
৮০. আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাঙালীর চিন্তাধারা : আধুনিক যুগ, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ২৩।
৮১. নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, কলকাতা, ১৯০২, পৃ. ৩৩৭।
৮২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৮৩. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, তৃতীয় মুদ্রণ, পৌষ, ১৩৭৬, পৃ. ১০৬।

বাংলার সুফি সাধনা

পটভূমি

বাংলা সাহিত্যে সুফিবাদ ও বাউল সাধনার প্রভাব অসামান্য। তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের সৃষ্ট বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ (নবম-দশম শতক) পরবর্তীকালের নাথগীতি, বৈষ্ণব পদাবলী (কীর্তন), শাক্তপদাবলী (শ্যামা সঙ্গীত), মধ্যযুগের সুফি ও যোগনির্ভর পুথি সাহিত্য, সতেরো-উনিশ শথকের বাউল গান, মুর্শিদি-মারফতি-মাউজভাণ্ডারি গান সুফি এবং বাউল ধারার সৃষ্ট, রবীন্দ্র-বাউলের গীতাঞ্জলিতে যার পরিপূর্তি। প্রায় এক হাজার বছরের বিপুল-বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার-এই সৃষ্টির আনুপূর্বিকতা জানার জন্য আমরা প্রাসঙ্গিকভাবেই একবার আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে কিঞ্চিৎ নজর দিতে পারে।

বিগত হাজার বছরে বাঙালির মানস-ভুবনে ও সমাজ জীবনে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার পেছনে রয়েছে এক ঐতিহাসক পটভূমি। বাঙলার ভৌগোলিক সীমা এবং রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য সুপ্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাসে চিহ্নিত। সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, গ্রহণ-বর্জন চলছে সুদীর্ঘকাল ধরে। মৌর্য-গুপ্ত- শশাঙ্কের রাজত্ব, পাল রাজত্ব, সেন রাজত্ব, সুলতানি রাজত্ব, মোঘল ও ব্রিটিশ রাজত্বকালে তাকে অনেক চড়াই-উৎরাই এবং আগ্রাসীর মোকাবেলা করতে হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশ বারংবার বিদেশী শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলেও সে বাইরের কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির আধিপত্য সহজে মেনে নেয় নি।[১] অনেক সময় রাজনৈতিক আধিপত্য মানতে বাধ্য হলেও সে সংস্কৃতি বা মতাদর্শগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। বরং আগ্রাসনকারীরা প্রায়সই এ দেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে-তেমনি আবার বাঙলার দেশজ সংস্কৃতিও বহিরাগত উপাদানের সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে। এভাবে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে এবং তৈরি হয়েছে

বাঙালির চিন্তাদর্শের দার্শনিক ভিত। মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে হাজার বছর লালিত সমাজ মনে ইসলামি ধর্মমত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। বিখ্যাত ভারতীয় সমাজ গবেষক ড. তারাচাঁদ তাঁর এক গবেষণায় বলেছেন, "ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে মুসলিম বিজয় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে"।[২] বিশেষ করে সুফিবাদের প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতিতে নানামাত্রায় সমন্বয়ের ধারা সূচিত করে।

ইতিহাসের ছিন্নপত্র থেকে বাঙলা ভাষাভাষি অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আমাদের সংস্কৃতি, জাতি, জাতীয়তা, আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাপন, তাদের জীবনসংগ্রাম তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর পাই। আমাদের সাহিত্য, পুথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, রামায়ণ, মহাভারত, গ্রিক ইতিহাসকারদের লেখা, পর্যটকদের বিবরণ, ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতির বিপুল ভাণ্ডার, লোকসাহিত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসামগ্রির বিবরণ, মুসলিম ধর্মপ্রচারক, সুফিবাদ, মরমিবাদ ও পির-ফকিরদের বিবরণ, বৈষ্ণব ধর্মান্দলন, শশাঙ্ক-পাল-সেন-বর্মণ-সুলতান-নবাব-মুঘল-ব্রিটিশ শাসনামল প্রভৃতির খবরাখবর থেকে আমরা আমাদের জাতির ভাঙা-গড়ার ইতিহাস জানতে পারি।

বাঙলার ইতিহাসে বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, পুণ্ড্র, গৌড় নামের খণ্ড খণ্ড জনপদগুলো একীভূত হয়েছে নানা পর্যায়ে। প্রাচীন বাঙলা তথা সমগ্র বাঙলার ইতিহাসে রাজা শশাঙ্ক ছিলেন একজন বিখ্যাত শাসক। তাঁর সময়কাল আনুমানিক ৫৯০-৬৩০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি স্বাধীন গৌরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পাল রাজবংশ আনুমানিক ৭৫০-১১৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দক্ষিণপূর্ব বাঙলাসহ সমগ্র বাংলাদেশ ও মগধ পালরাজ্যভুক্ত ছিল। তাদের রাজ্যসীমা বিবর্তিত হয়েছে, তবে পালরা ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। পালরা একটি সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছিল এবং ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতি গঠনের ঊষাকালের সূচনা তাদেরই কৃতি।[৩] এরপর সেন বংশ প্রায় দেড় শত বছর (১০৯৮-১২৩০) রাজত্ব করেন।[৪] লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করলে তিনি আক্রমণ প্রতিহত না করে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। অনুমান করা হয় বখতিয়ার লক্ষ্মণ সেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে দুর্গম অরণ্য পথে অনুপ্রবেশ করেন এবং নদীয়ায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে হতবাক করে দেন। লক্ষ্মণ সেনের পর তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন প্রায় ২৫ বছর দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন।

বখতিয়ার খলজি নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতি (বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ) দখল করার পর তিব্বত অভিযানের পরিকল্পনা করেন। স্বপ্নচারী এই খলজি তিব্বত জয় করতে ব্যর্থ হন এবং এক বছরের মধ্যেই এই অবিমিশ্রকারী সৈনিক মৃত্যুবরণ করেন (১২০৬)। তাঁর মৃত্যুর পর শুরু হয় খলজিদের অন্তর্কলহ। এই কলহের শেষে

পরিণতি ঘটে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইওজ খলজির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এরপর ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১১১ বছর দিল্লির একটি প্রদেশ হিসেবে বাঙলা শাসিত হয়।

দিল্লির আধিপত্যের অবসান ঘটে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফকর উদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসে যা 'দুইশত বছরের স্বাধীন সুলতানি আমল' বলে পরিচিতি (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.)। ফকর উদ্দীন ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পরবর্তী সুলতান শামস-উদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪৬-১৩৫৮) সমগ্র বাঙলা ভাষাভাষি অঞ্চলকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি নেপাল আক্রমণ করেন, ত্রিহুতের কিছু অংশ দখল করেন, পশ্চিমে কাশি, গোরক্ষপুর ও চমপারণ পর্যন্ত এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে তার রাজ্যভুক্ত করেন।

সুলতান ইলিয়াস বাংলাদেশে উদার শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তিনি বাঙালি হিন্দুদের উচ্চরাজপদে নিযুক্ত করেন। ইলিয়াসের মৃত্যুব (১৩৫৮) পর তার পুত্র সেকেন্দার শাহ বাঙলার সুলতান নিযুক্ত হন। ১৩৯৩ খ্রি. সেকেন্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ সুলতান নিযুক্ত হন। সুলতান গিয়াস উদ্দিনকে (১৩৯৩-১৪১১) নিয়ে বাঙলায় অনেক কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। বিশেষত তিনি দয়ালু, কবি ও ভাবুক প্রকৃতির শাসক ছিলেন। তিনি সুফিসাধকদের প্রতি ভক্তি এবং বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। পনের শতকের গোড়ার দিকে উলেমা শ্রেণী এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বিরোধিতায় রাজা গণেশের উত্থান ঘটে এবং তিনি একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

দুইশত বছরের স্বাধীন সুলতানি আমলের সবচেয়ে খ্যাতিমান শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯ খ্রি.)। তিনি উদারনৈতিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসম্প্রদায়িক শাসনকর্তা ছিলেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ তাঁর শাসনামল কিংবদন্তীতুল্য।[৫] তাঁর সহনশীলতা বাঙলার বুকে এমন এক আবহ সৃষ্টি করেছিল যে, তাঁর শাসনকালে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার ফলে বাঙলার জনপদগুলো একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছিল একটি একক বাংলারাজ্য। তার নিযুক্ত চট্টগ্রামের সামরিক গভর্নর পরাগল খানের অনুজ্ঞায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন।[৬] কবীবন্দ্রের অনুবাদই বাঙলা ভাষায় প্রথম মহাভারত। কবীন্দ্র এই শাসককুলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হোসেন শাহ বেশ কিছু উচ্চ পদে হিন্দুদের নিযুক্ত করেছিলেন, এমন কি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন কুমুন্দ দাস, তার মন্ত্রি ছিলেন গোপীনাথ বসু এবং টাকশাল অধ্যক্ষ অনুপ ছিলেন হিন্দু।[৭] তাঁর রাজত্বকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভোরের আলোর মতো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। জাতি গঠনের এই অনুকূল পরিবেশ হিন্দু মুসলিম-বৌদ্ধ সবাই মিলে একাত্ম হয়ে জাতি গঠন প্রক্রিয়া তরান্বিত করেছিল।

হোসেন শাহ'র জ্যৈষ্ঠ পুত্র নসরুত শাহ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সমকালের কবিদের রচনায় প্রশংসার সঙ্গে তাঁর নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে।[৮] ১৫৩২ খ্রি. পিতার সমাধি পরিদর্শনকালে এক ক্রীতদাসের হাতে তিনি নিহিত হন। এরপর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসন আরহণ করেন। ফিরোজ শাহ পিত্রব্য গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের হাতে ১৫৩৩ খ্রি. নিহিত হন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ১৫৩৮ খ্রি. আফগানদের হাতে পরাজিত হন এবং বাংলার ২০০ বছরের সুলতানি শাসনামল সমাপ্ত হয়।[৯] পরবর্তী ৪০০ শত বছরের (১৫৩৮-১৯৪৭) ইতিহাস আফগান, মোঘল, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, পরাসি ও ইংরেজদের লুটতরাজের ইতিহাস। ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল আফগান শাসন। ১৫৭৬ থকে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সাঁইত্রিশজন মোঘল সুবেদার বাঙলা শাসন করেন।[১০]

১৭৫৭ খ্রি. পলাশির আমবাগানে যুদ্ধ নামের নাটকের মধ্য দিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে এবং চতুর ইংরেজ বর্ণিক প্রধান ক্লাইভ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। এরপর ইংরেজ বর্ণিকরা বাঙলার সম্পদ পাচার করতে থাকে সুদূর ইংলন্ডে। ক্লাইভ 'দ্বৈত সরকার' নামে এক সরকার পদ্ধতির উদ্ভব ঘটান। এতে স্থানীয় বাঙালি প্রশাসনের হাতে আদালত, আইন-শৃংখলা রক্ষা ইত্যাদি বেসামরিক দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং কোম্পানির দাযিত্বে থাকে রাজস্ব আদায় ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার। দ্বৈত সরকার প্রবর্তনের পর কোম্পানি ও তার কর্মচারিদের বাণিজ্যের ব্যাপারটি গৌণ হয়ে ওঠে। বাঙালি কৃষকের কাছে অধিক হারে খাজনা আদায়ই হয়ে ওঠে কোম্পানির আয়ের প্রধান উৎস। কোম্পানির কর্মচারি ও গোমস্তাদের অত্যাচারে বাঙলার কৃষক প্রাণান্তকর অবস্থায় পতিত হন। তারা এরই সঙ্গে ধ্বংস করে বাঙলার ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। সংঘটিত হয় বাঙলার মহাদুর্ভিক্ষ; 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (বাঙলা সন ১১৭৬, খ্রি. ১৭৭০)। এই দুর্ভিক্ষে বাঙলার একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। জনবসতির অভাবে বাঙলার বিস্তৃর্ণ কৃষিজমি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে বন্যপশুর বিচরণভূমিতে পরিণত হয়। এই মহাদুর্ভিক্ষেও রায়তদের খাজনা আদায়ে কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নি। বরং বাঙলার মানুষের উপর আরও অধিক হারে নেমে আসে শোষণ ও নির্যাতন। বাঙলার মানুষের জীবন হয়ে ওঠে অমানবেতর। কোম্পানি রাজস্ব আদায় আরো পোক্ত করে।[১১] ওয়ারেং হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫) বাঙলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় 'পাঁচশালা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ সালে 'দশশালা' এবং ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী' বন্দোবস্তু কায়েমের মধ্য দিয়ে জমিদার জমির মালিকে পরিণত হয় এবং জমির রায়তরা রূপান্তরিত হয় প্রজাসাধারণে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল কৃষিনির্ভর বাঙলার মানুষকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এ আঘাত পরে গ্রাম বাঙলার প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে। এই শোষণ-নির্যাতন ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিহত করার জন্য বাঙলার মাটিতে বারবার বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে। সংগঠিত হয় উত্তরবঙ্গের

ফকির বিদ্রোহ, রংপুর-দিনাজপুরের কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড আকারে দেখা দেয় সিপাহী বিদ্রোহ-ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ব্রিটিশ সরকার এ বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় বাঙলার নবজাগরণ। এই শতকেরই শেষ দশক থেকে শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলন; দেশমাতার জন্য দেশপ্রেমীকদের আত্মহুতি। ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত থেকে মুক্তির জন্য বাঙলা এবং ভারতবর্ষব্যাপী নানামাত্রায় সংগঠিত হয় আন্দোলন-বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের মূল পাদপীঠ ছিল বাঙলা। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ফাসিতে ক্ষুদিরামের মৃত্যু বাঙালির দেশপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ। দেশপ্রেমিকদের প্রবল আন্দোলনের চাপে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। রাহুমুক্ত হয় বাঙলা ও ভারতবর্ষ। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙলা বিভক্ত হয়ে পশ্চিমাংশ পশ্চিম বাঙলা নামে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পূর্বাংশ পাকিস্তানের অংশ হয়ে প্রথমে নামকরণ হয় 'পূর্ববাঙলা; পরবর্তীকালে এর নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমরা এ পটভূমিতেই বাঙলার মানুষের মনোজগৎ ও সৃজনশীলতা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। আমরা এই আলোচনাকে নিম্নোক্ত দু'টি পর্যায়ে বিভাজন করতে পারি : সুফি মত ও বৈষ্ণব মত।

ক. সুফিবাদ : উৎস ও পরিচয়

প্রাচীন সভ্যতা ও বিশ্ববাণিজ্যের পীঠস্থান আরবে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। কুসংস্কার, নারী নির্যাতন, মানুষের অসম্মান, মদ-জুয়ার আসর, মুনাফা ও সুদের-উদগ্র কামনা, হিংসা-দ্বেষ, খুন-খারাবি ছিল সে সমাজের নিত্যদিনের প্রতিচ্ছবি। সমাজের এহেন অবস্থায় ইসলামের নবি হযরত মুহম্মদ (স.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা-অবমাননা সামজের এই অধপতিত অবস্থা মুহম্মদের স্পর্শকাতর মনকে বিচলিত করে। হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় তপস্যা-ধ্যানে তাঁর মরমি চিত্তে এক গভীর ধর্মানুভূতি জাগ্রত হয়। তপস্যার মাধ্যমে তিনি নতুন জীবন প্রাপ্ত হন। তিনি হন আল্লাহর অহি প্রাপক, পৃথিবীতে তার বাণী প্রচারক ও নবি। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম হাজার বছর ধরে প্রচলিত ও আচরিত অন্যসব ধর্মমত থেকে উদার, সহজ ও জটিলতা বর্জিত। তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত পবিত্র কোরআনের বাণীতে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ মানুষের উপরকার ভার সহজ ও লঘু করতে চান, আল্লাহ দয়াময় ও ক্ষমাশীল। পবিত্র কোরানে আল্লাহর গুণবাচক বিরাব্বইটি নামের তালিকা রয়েছে।

ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় তত্ত্বে আছে আল্লাহর একত্ব-আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় তার কোনো শরিক নাই। এ ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে : কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এ ধর্মমতের আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে; এতে ঘোষিত হয়েছে সকল মানুষের সমতা ও ভ্রাতৃত্বের কথা। অর্থাৎ সকল মানুষই মানুষ হিসেবে সমমর্যাদার অধিকারী। ছোট-বড়, উঁচু-নিচু এই ভেদনীতি ইসলামে অচল। সংস্কারজীর্ণ ভেদনীতির সমাজে হজরত মুহম্মদ (স.) এসেছিলেন মানব-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, সমাজ জীবনের উন্নয়নের জন্য, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। ধর্মীয় অনুশাসনের সাহায্যে, বিধি-নিষেধের দৃঢ় রজ্জুর সাহায্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর সাধনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে আরব জাতির প্রধান্য ও তাঁদের সাম্রাজ্য বিশ্বময় বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অল্পকিছুকাল পরেই ধর্ম ও সমাজ জীবনে গ্লানি এসে উপস্থিত হয়। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ভুলে মহাপুরুষের আদর্শের কথা ভুলে সাধারণ ধর্মযাজকরা আর ধর্ম গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারা আঁকড়ে ধরলেন আক্ষরিক অনুশাসনকে; বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলাকে এবং আচারের প্রাণহীন কাঠামোকে। ফলে সমাজে এসে দেখা দিল অন্তঃসারহীন টীকার যুগ। ধীরে ধীরে শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকে ভুলে গেল; শব্দ আর তার আভিধানিক এবং বৈয়াকরণিক অর্থ নিয়েই সাধারণ পণ্ডিতদের মতামাতি; রেষারেষি, তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে।[১২]

হযরত মুহম্মদের পরলোকগমনের (৬৩৫ খি.) কিছু কালের মধ্যেই রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের প্ররোচনায় এই ধর্মমতের মধ্যে খারিজি, শিয়া, মুরজিয়া, কাদেরীয়া প্রভৃতি বেশ কিছু সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। প্রথম দিকের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সম্প্রদায় হচ্ছে 'মুতাযিলা'-এঁরা যুক্তিবাদী নামে খ্যাত। যুক্তিকে তাঁরা ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের উৎসরূপে গণ্য করেন। কালচক্রে ইসলামের পালনীয় ও প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এবং কোরআন ও সুন্নার বিশ্লেষণ নিয়ে তাদের মধ্যে ঘোরতর কলহ ও সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। অবশ্য এর সূচনা ঘটে যে সময় থেকে আল-কোরআনের আয়াতসমূহ নবীর (স.) নিকট প্রত্যাদিষ্ট হয় সে সময় থেকে। কারণ কোরআনের অনেক আয়াতই রহস্যের স্পর্শে প্রায়শই রূপক। অনেক আয়াত দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, সমস্ত বস্তুসামগ্রীর এ জগত হচ্ছে কেবল ঐশি সত্তার মূর্ত প্রকাশ। মানুষের শিরার মধ্যেও আল্লাহ্ প্রবহমান। মানুষ পরম সত্তার হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আল্লাহ তাকে যেমন ইচ্ছে তেমনি ব্যবহার করে থাকেন। জগতে যা কিছু হয়, তা আপাতত সৃষ্টি থেকে তৈরি বলে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু আসলে তা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক উৎপাদিত, অর্থাৎ এর উৎস স্বয়ং আল্লাহ। এ সব রহস্যাত্মক ভাবধারা হাদিস কর্তৃক আরও দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। যেমন বলা হয় "যে নিজেকে জানে, সে তার প্রভুকে জানে"। আল্লাহ্ নবী (স.) কে বলেন, "বলুন (তাদেরকে) তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন"। নবী (স.) নিজেও মরমি ভাবধারা প্রদর্শন

করেছেন, তিনি মাঝে মাঝে নির্জনস্থানে (দৃষ্টান্তস্বরূপ হেরা গুহা) ভক্তি ও ধ্যানে নিমগ্ন থেকেছেন। তাঁর অনুগামীরা একনিষ্ঠভাবে তাঁকে অনুসরণ করে গেছেন। তাঁর কতিপয় সাহাবি ছিলেন অত্যন্ত মরমি ভাবধারাসম্পন্ন।[১৩] পার্থিব বিষয়ে তাঁরা সর্বদাই ছিলেন উদাসীন ও অনীহাপ্রবণ। পরবর্তীকালে এ সব আত্মমগ্ন মরমির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাঁরা তাদের সমর্থনে কোরআনের সেই সব আয়াত উল্লেখ করেন যে সব আয়াতে জগতকে ক্ষণস্থায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যকে চরম আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে আরবেরা বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। গ্রিক সভ্যতা তখনও সক্রিয়। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, ইউক্লিড, গ্যালিয়েন প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারা তখনও পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যে ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল : আরবেরা এই চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসে। জীবনের ধারা তাদের মধ্যে তখন উদ্দামবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। মোহাম্মদ স্বয়ং জ্ঞানের সাধক ছিলেন এবং জ্ঞান-সাধনার জন্য শিষ্যদের সবিশেষ উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রিক জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেয়ে আকণ্ঠ সে অমৃত তাঁরা পান করলেন; ফলে চিন্তাবিদ সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনব এক ভাবধারা এসে দেখা দিল-যাকে যুক্তিবাদ (Rationalism) নামে অভিহিত করা যেতে পারে। "সব তত্ত্বের বিচার যুক্তির সাহায্যে করতে হবে। এমন কি ধর্মেরও"-এই হলো এই দলের আদর্শ। যাঁরা এই আদর্শের অনুসরণ করতেন, তাঁরা 'মুতাযিলা' নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন। 'মোতাজেলা' বাদ একদিন মোস্‌লেম জগতে সবিশেষ বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা আল্‌ মামুন স্বয়ং মোতাজেলা-মত অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর যুগে মোতাজেলাবাদ রাজকীয় ধর্মরূপে পরিগণিত হয়।[১৪]

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, মাবাদ আল-জুহানি একদিন তাঁর সাথী ওয়াসিল ইবনে আতাসহ প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী হাসান আল-বসরি (রা.) এর নিকট আগমন করেন এবং বলেন : "হে আবু সাঈদ, যেসব শাসক মুসলমানদের রক্তপাত ঘটায় এবং দুষ্কর্ম করে এবং বলে যে, তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ্র ইচ্ছায় সাধিত হয়।" এতে হাসান আল বসরি (রা.) বলে যে, তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ্র ইচ্ছায় সাধিত হয়।" এতে হাসান আল বসরি (রা.) জবাব দেন : "আল্লাহ্র শত্রু, তারা মিথ্যাবাদী" এভাবে দেখা যায় যে, প্রাচীন মুতাযিলা কর্তৃক প্রথম যে মতবাদ পেশ করা হয় তাতে ছিল মন্দ বা অসৎ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। এগুলো আল্লাহ্র উপর আরোপ করা যাবে না। এটা 'কদর' মতবাদ নামে পরিচিত। এজন্যই আদি মুতাযিলীয়গণকে 'কদর' শব্দ উদ্ভূত কাদেরিয়া নামে অভিহিত করা হয়। একই কারণে তাঁদেরকে আদেলীয়ও বলা হয়। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের রক্ষক। কারণ, মানুষের কাজের জন্য মানুষ দায়ী থাকলেই আল্লাহ্র ন্যায়বিচার সংরক্ষিত হয়। মা'বাদ আল-জুহানি (রা.) প্রকাশ্যে এ মতবাদ প্রচার

করেন। সে জন্য খলিফা আবদুল মালিকের আদেশে ৬৬৯ খিস্টাব্দে হাজ্জাজ কর্তৃক তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

মা'বাদ আল-জুহানির পর গায়লান আল-দিমাশ্কি অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি প্রচার করেন যে, প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত করা এবং দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখা। গায়লানের এই প্রচার উমাইয়া শাসক-স্বার্থ সংরক্ষণের প্রকাশ্য প্রতিবন্ধক ও হুমকিস্বরূপ ছিল। ফলে হিজরি ১০৫, খ্রিস্টাব্দে ৭২৩ শাসনকালের শুরুতেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

গায়লান এবং মা'বাদ-এর মৃত্যু তাঁদের মতবাদকে বলিষ্ঠতা দান করে। তাঁদের শিক্ষা সমকালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রভাব বিস্তার করে। হাজার হাজার লোক মুতাযিলা মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসে। এ সময় অর্থাৎ হিজরি ৮০ (খ্রিস্টাব্দে ৬৬৯)-তে মুতাযিলা চিন্তার ক্ষেত্রে দু'জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ দু'জন হচ্ছেন : ওয়াসিল ইবনে আতা এবং আমর ইবনে উবায়েদ। তাঁরা উভয়েই বসরায় সুবিখ্যাত মসজিদে ভাষণদানকারী হাসান আল-বসরি (রা.)-এর শিষ্য। একদিন হাসান আল-বসরি (রাঃ) কিছু সমস্যা নিয়ে যখন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন-তখন কোনো এক ব্যক্তি মুরজীয় ও ওয়াদিয়ার বিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গির এক প্রশ্ন নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। প্রথম পক্ষের অভিমত : "গুরুতর পাপ সম্পাদনকারীকেও একজন মুসলিম বলে গণ্য করা উচিত। তাকে একজন অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করা যথার্থ নয়। তার বিচারের ভার আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত করা উচিত।" পবিত্র কোরআনে শাস্তিমূলক আয়াতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপে অপরপক্ষের অভিমত : "গুরুতর পাপ সম্পাদনকারী যেহেতু সত্যপথ হতে বিচ্যুত, তাই তাকে সম্ভবত বিশ্বাসী বলে বিবেচনা করা যায় না।" হযরত হাসান (রা.) কোনো উত্তর দেয়ার পূর্বেই ওয়াসিল অথবা আমর তাঁদের একজন মন্তব্য করেন : এমন লোকের অবস্থান মধ্যবর্তী জায়গায় (middle position) অর্থাৎ সে বিশ্বাসীও নয়, অবিশ্বাসীও নয়। হযরত হাসান (রা.) এতে ব্যথিত হন এবং বলেন, ইতিযালা আন্না অর্থাৎ সে আমাদের দল পরিত্যাগ করেছে। ওয়াসিল এবং আমর তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে মসজিদের অন্যপ্রান্তে চলে যান এবং নিজেদের মত প্রচার করতে শুরু করেন। যারা ওয়াসিল এবং আমরের মতবাদের অনুসারী হন তারাই মুতাযিলা নামে পরিচিত হন।

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মতাদর্শের সমন্বিত রূপ হচ্ছে ইসলাম। এ ধর্মের মার্কিকতা হচ্ছে জীবনকে অবহেলা বা অবজ্ঞা নয়, জীবনের প্রতি নিরাশা বা হতাশার স্থান নেই ইসলামে। জীবনবাদী ইসলামের এ আদর্শের সঙ্গে খুব স্বাভাবিক কারণেই জীবনের প্রতি নিরাসক্ত মরমিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সূচনা দেখা দেয় প্রায় প্রারম্ভকালেই। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অপেক্ষাকৃত উদার ও জীবনের প্রতি কিঞ্চিৎ নিরাসক্তবাদীরা ইসলামে এক নতুন ভাবধারার জন্ম দেয়-যা সুফিবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। মুতাযিলাবাদীরা বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে

সত্যের পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছিলেন, আর সুফিরা প্রেম ও অবলিলামুক্ত অন্তরে প্রাপ্ত ঐশ্বরিক প্রেরণার সত্যস্বরূপ সৌন্দর্যস্বরূপ খোদার সঙ্গে মিলনের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিলেন। সুফিদের এই সাধন-ধারা মহাপুরুষদের প্রবর্তিত বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করে।

সরলিকৃতভাবে 'সুফি' অর্থ শুদ্ধ, পাক-পবিত্র এবং মানবীয় গুণাবলীসমৃদ্ধ একটি ইতিবাচক শব্দ। আমরা সাধারণভাবে যেমন বলি সুফি ব্যক্তি, সাধু বা সজ্জন ব্যক্তি। শৈলেন্দ্র বিশ্বাসকৃত সংসদ বাংলা অভিধানে এর আভিধানিক অর্থ নির্দেশিত হয়েছে "নির্জ্ঞেয় সন্ধানী (mystic) মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ"।[১৫] বাংলা একাডেমীকৃত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' সুফি অর্থ 'ধার্মিক' মুসলিম মরমি সাধক।'[১৬] ইংরেজি Mystic অর্থ "গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ বা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন; ভয় ও বিস্ময় উদ্রেককর; অতীন্দ্র; মরমি; ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন প্রত্যাশী এবং এই মিলনের মাধ্যমে মানুষের বোধাতীত সত্যের সাক্ষাৎ প্রয়াসী ব্যক্তি।[১৭] মবমিভাব প্রতিটি মানুষের মধ্যে এমনকি প্রতিটি মানবশিশুর মধ্যেও ক্রিয়াশীল। আমরা কোথা থেকে এলাম, কোথায়ই বা যাব, কে আমাদের সৃষ্টিকর্তা, কি তার উদ্দেশ্য এ ভাবনা মানুষের নিরন্তর। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জগত ও জীবনের রহস্য সম্বন্ধে চিরজিজ্ঞানু'।[১৮] তবে সুফি শব্দের মার্মিক অর্থ জানতে হলে শব্দটির ব্যুৎপত্তির প্রতি একবার দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। যদিও শব্দটির উৎস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্য মতভেদ বিদ্যমান। সুফি আরবি শব্দ। আরবি স্বফা অর্থ পবিত্রতা। অনেকে বলেন আরবি 'স্বফা' ধাতু থেকে সুফি শব্দটি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর বঙ্গে স্বূফী প্রভাব গ্রন্থে লিখেছেন :[১৯]

> 'কেহ কেহ বলেন : "অহলু-স্ব স্বূফ্‌ফহ্‌" অর্থাৎ "পর্য্যঙ্কোপবিষ্ট" এই বাক্যাংশ হইতেই 'স্বূফী' শব্দের উদ্ভব হয়। তাঁহাদের মতে যে সকল মুসলমান সাধু, ইসলামের প্রাথমিক যুগে, মস্‌জিদের বহির্দ্দেশে পর্য্যঙ্কেবসিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন, তাঁহারাই 'স্বূফী'।
>
> আবার কেহ হেক মনে করেন, গ্রীক্ philosophos "ফিলোসফস্‌" (প্রজ্ঞাপ্রিয়) শব্দের আরবী অপভ্রংশ "ফয়্‌লসূফ" অর্থাৎ 'দার্শনিক হইতে "স্বূফী" শব্দের উদ্ভব ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মতে, যে সকল মুসলমান নিস্পৃহ ও জ্ঞানী ধর্ম্মের দর্শনসম্মত ব্যাখ্যা দিয়া নিজেদের জীবনকে অনুরূপভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই "স্বূফী'।
>
> আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, গ্রীক্ Sophisma "সফিস্‌মা" বা "জ্ঞান" শব্দের আরবী অপভ্রংশ "সফ্‌সত্বী" অর্থাৎ "ভ্রান্তকূটতার্কিক" হইতেই "স্বূফী" শব্দ গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বিপথগামী হইয়া যাঁহারা কূটতর্কের অবতারণা করেন, তাঁহারাই "স্বূফী"।
>
> কিন্তু যিনি যাহাই মনে করেন, এখন অধিকাংশ আরবী পণ্ডিতদের মতে "স্বূফী শব্দ আরবী "ইস্‌মু-জাজিদ্‌" বা মূল বিশেষ্যপদ "স্বূফ্‌' বা "পশম" শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মতে যে সমুদয় লোক ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগে পশমের জামা (ফাঃ জামহ্‌) পরিয়া সংসার হইতে একেবারে নির্লিপ্ত থাকিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহারাই "স্বূফী" বা 'পশমী জামা পরিধানকারী"।'

বস্তুত 'সুফি' শব্দটির উৎপত্তি আরবি 'তাসাউফ' শব্দ থেকে। সুফ অর্থ পশম, আর তাউসফ অর্থ পশমি বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। আবার মরমি তত্ত্বের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করার কাজকেও বলা হয় তাসাউফ।[২০] অর্থাৎ ইসলামের মরমিবাদের চিন্তাদর্শের সাথে যার নাম জড়িত তিনিই সুফি। আবদুল করিম প্রায় একই মত ব্যক্ত করে লিখেছেন :

> 'তসাউওফ বা সূফী শব্দটি আরবী সূফ শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'সূফ' শব্দের অর্থ হল উল বা পশম, অর্থাৎ যাঁরা পশমী বস্ত্র পরিধান করিতেন। প্রাথমিক যুগের ধর্মতাত্ত্বিকরা পশমী বস্ত্র পরিধান করে সাধনা করতেন বলে তাঁদেরকে সূফী বলা হত। পণ্ডিতরা সুফী শব্দের মূল বের করতে গিয়ে আরও কয়েকটি শব্দের অবতারণা করেছেন, যেমন কেউ কেউ বলেছেন যে, 'আহল উস-সুফ্ফা' অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) সময়ে যারা মসজিদের মেঝেতে বসে সাধনা করতেন, তাঁদের থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি। আবার কারও মতে 'সফ্-ই-আউয়াল' অর্থাৎ যারা সামনের সারিতে সালাত আদায় করতেন তাঁদের থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি। সে যাই হোক আধুনিক পণ্ডিতদের গ্রহণযোগ্য মত এই যে, সূফ' শব্দই সূফী বা তসাউওফের মূল।
>
> সূফী শব্দটি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুফার জাবির বিন হাইয়ান নামক একজন রাসায়নিক পেশাধারী সাধক এবং আবু হাশিম নামক একজন সাধকের নামের সঙ্গে সূফী শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে এবং পরবর্তী দুইশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র মুসলিম জাহানের সাধকের নামের সঙ্গে সূফী শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। আজ পর্যন্তও সূফী শব্দটি মুসলমান সাধকদের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।'[২১]
>
> অবশ্য এ অভিমতও পোষণ করা হয় যে তাদেরকে ঐ অভিধায় অভিহিত করার কারণ তারা 'সুফ' নামে এক প্রকার রঙ্গিন মোটা পশমি কাপড় পরিধান করতেন। সুফি শব্দের উদ্ভব সম্পর্কে ভিন্নমত হচ্ছে : "মদিনায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মদিনার মসজিদ সংলগ্ন নির্জন স্থানে অবস্থানরত সংসার নির্লিপ্ত আল্লাহ প্রেমিক একদল লোক 'আলহুস সাফফা' নামে পরিচিত হন। এদেরই উপর আরোপিত এই সাফফা শব্দ থেকে সুফি শব্দের উদ্ভব বলে ধরা হয়।"[২২]

ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম নিম্নোক্তভাবে সুফি শব্দের অর্থ ব্যক্ত করেছেন : "সূফী' শব্দটি আরবী শব্দ 'তসাউফ বা সফ্ শব্দ থেকে এসেছে। 'তাসাউফ' শব্দের অর্থ পবিত্রতা, আবার 'সফ্' শব্দের অর্থও পবিত্রতা। আবার ভিন্ন অর্থে 'সফ' মানে শ্রেণী বা সারি। তাহলে, অর্থ দাঁড়ায় শ্রেণীতে বা সারিতে যাঁরা অবস্থান করেন, তাঁরা 'সফ' পদবাচ্য। এই শ্রেণী মানে প্রথম। অতএব, প্রথম শ্রেণীতে অবস্থানকারীগণ অর্থাৎ যাঁরা কোরআন, হাদিস প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ এবং নামাজ ইত্যাদি উপাসনা নিয়ে দিন কাটান ও জাগতিক বন্ধনমুক্ত, তাঁরাই ঈশ্বরের নিকট প্রথম 'সফ' বা সাফ্-ই-অভিয়াল বা সামনের সারিতে আছেন বা থাকার যোগ্য। 'তাসাউফ' কথাটির আর এক অর্থ হল সত্য বস্তুসমূহের উপলব্ধি এবং সৃষ্ট জীবনগণের হাতে যা আছে সেই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নিস্পৃহতা বা নির্লিপ্ততা এবং উদাসীনতাই হল 'তাসাউফ' বা সুফী।"[২৩]

কেউ কেউ 'সাফা' (পবিত্রতা) শব্দ থেকে সুফি শব্দের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। অনেক পণ্ডিত, সুফি শব্দের ব্যুৎপন্নের ক্ষেত্রে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ নব্য প্লেটোবাদী খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের অনুপ্রেরণায় সুফিবাদের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। অন্যেরা মনে করেন আল-কেরআনই সুফিবাদের মূল উৎস। সুফিরা তাদের অুনপ্রেরণা লাভ করেন কোরআন থেকে এবং কেরআনের কিছু কিছু বাণীকে ব্যাখ্যা করেন গুপ্তজ্ঞানের রহস্যরূপে।[২৪]

জনৈক গবেষক বলেছেন, "সুফিপন্থ ভিন্নতর ধর্ম, তবে ইসলাম বহির্ভূত নয় এবং একে Islamic Mysticism বা ইসলামীয় মরমিবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলে। কোন জ্ঞানপ্রসূত বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামূলক এ ধর্ম নয়। প্রেমই বড় কথা এবং প্রেমের দ্বারাই (অতীন্দ্রিয়) ঈশ্বরের মধ্যে ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন অর্থাৎ ঐশ্বরিক ঐক্যলাভই হলো সুফিধর্মের চরম লক্ষ্য। ... প্রাচীন যুগে সুফীগণ শরিয়ৎ ও তরিকৎ এই দুই পন্থার সামঞ্জস্য করে সুফী সাধনা করতেন এবং কোরান ও হাদিসের বাণীকে গ্রহণ করতেন হক বা সত্য বলে। পরবর্তীকালে ঈশ্বরপ্রেমকে ধর্মের ভিত্তি করা হয়। স্বনামধন্য সুফী রাবেয়া দরিদ্র ক্রীতদাস হয়েও (৭১৩-৮০১ খি.) মোনাজাত বা প্রার্থনা যা লিখে গেছেন তা সুফী গ্রন্থের নিজস্ব সম্পদ। এই রাবেয়ার সময় থেকেই অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম পাদেই সুফী মতবাদের নূতন যুগের সূচনা হয়।"[২৫]

সুফিবাদের মূল উৎস আল-কোরআন। কোরআনের বাণী থেকেই সুফিরা খুঁজে পান আল্লাহর ক্ষমাশীলতা, ঔদার্যতা ও প্রেমময়তা। আল-কেরআনের বাণী "যেহেতু আমি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যিনি তোমাদের কাছে অহি পাঠ করেন, তোমাদিগকে কেতাব শিক্ষা ও প্রজ্ঞা দান করেন এবং যা তোমরা আগে জানতে না তাই জানিয়ে দেন।" সুফিদের মতে এই প্রজ্ঞা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, মরমিবাদের যা মূল বিষয়।[২৬] প্রথম যুগে আরব মুসলমানদের থেকে উৎপত্তি লাভ করে সুফিবাদ পারস্যের মরমি মাটিতে পরিপূর্তি লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে সুফিবাদ আল্লাহ্‌র ভীতি ও শেষ বিচারের দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটে-প্রেমের মধ্য দিয়ে প্রিয়তম আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়।[২৭] অনেকে মনে করেন কোরআনের গুরুত্বপুর্ণ আয়াতসমূহ সন্ন্যাসবাদী ও ভাববাদী ভাবধারা বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।[২৮] পরবর্তীকালে ঐ ভাবধারা অনুধ্যানমূলক ও সর্বেশ্বরবাদী রূপ ধারণ করে। একেই ভারতের বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদী প্রভাব হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। আবার এটাও বিশেষভাবে অনুধানযোগ্য যে, হযরত মুহাম্মদের জীবনকালেই কিছুসংখ্যক মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে আত্মনিবেদিত হয়ে ওঠেন। এদের নিকট ইসলাম ছিল আত্মার সংযোগ-কেবল বাহ্যিক কতকগুলি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নয়। তাঁদের ভাবনা ছিল

জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব, শেষ বিচারের দিন এবং অনন্ত শান্তির কথা। হযরত মুহম্মদের অব্যবহিত পরেই কঠোর তপস্যাপরায়ণতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমরা পাই বসরা নিবাসী আল-হাসান (৬৪৩-৭২৮) এবং সাধ্বী রমণী রাবেয়া বসরি (৭১৩-৮৮১) যাঁদের স্মৃতি সুফিমতে আজও অম্লান। রাবেয়া বলতেন, "আল্লাহর প্রেম আমাকে এতো বেশি নিমগ্ন করেছে যে, আর কারো কোনো প্রেম বা ঘৃণা আমার অন্তরে নাই।'

সুফিরা নির্জন বাস এবং দারিদ্র্য পছন্দ করতেন এবং নিভৃত সাধনা ও কেরআন শরীফের মর্ম উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতেন। তারা যে শুধু সমাজের অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন তা নয় বরং নিজের আত্মার দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতেন। সুতরাং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আত্মার পরিশুদ্ধি মারফত আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা। সুবিখ্যাত হাসান বসরীর জীবন-এর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং মুসলমান শাসকদের সঙ্গে প্রাথমিক যুগের সুফিদের কোনোরূপ বিরোধ দেখা দেয় নি। কিন্তু মুসলমান আইনবিদ্‌রা (ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ ও মুতাকাল্লিমীন) সুফিদের আত্মশুক্তি ও আত্মচর্চাকে পছন্দ করেন নি, কারণ, তাদের মতে কোরআন শরীফে মানুষের বাহ্যিক পাপের শাস্তির বিধান আছে, ধর্মীয় ভণ্ডামীর বিচারের বা শাস্তির কোনো বিধান নেই। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মানুষের মনের খবর কেউ রাখতে পারে না। তাই আইনবিদরা সুফিদিগকে প্রচলিত ধর্মবিরোধীরূপে আখ্যা দেন। কারণ সুফিদের মতে, কাজের ইচ্ছা প্রকৃত কাজের চেয়ে বেশি মূল্যবান, প্রকৃত জীবনধারণ পদ্ধতি শরীয়তের বিধানের চাইতে ভালো এবং বাধ্যতামূলক অনুষ্ঠান পালনের চেয়ে ঢের ভালো। সুতরাং রক্ষণশীল আলেমরা ক্রমে ক্রমে সুফিদিগকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন এবং তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। রক্ষণশীল আলেমদের প্ররোচনায় মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ও সুফিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ভারত উপমহাদেশেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুফিদের আধ্যাত্মিক সাধনায় বেশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। এই পথে কয়েকটি স্তর বা 'মকাম' আছে, এ স্তরগুলি সফলভাবে পার হতে পারলেই বিশেষ অবস্থায় পৌছে। সুফিদের এই সাধনার মূল লক্ষ্য মারিফাত বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে খাঁটি সত্যে বিলীন হয়ে এবং আরও এক স্তর অতিক্রম করে বাকায় পৌছে অর্থাৎ রিপু দমন করে মহাসত্য লাভ করা। এরূপে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করতে পারে।[২৯]

দশম শতকের দিকে সুফিবাদ সর্বেশ্বরবাদের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে পড়ে যা ছিল গ্রিক দার্শনিক চিন্তার সুর। আবার এ অভিমতও পোষণ করা হয় যে ভারতীয় একত্ববাদ (monism) বা বেদান্তবাদী দর্শনের প্রভাবও এখানে পড়েছে।[৩০] সর্বেশ্বরবাদ মরমি বিশ্বাসেও নিহিত-স্রষ্টা চিরকালব্যাপী বিশ্বচরাচরে বিরাজিত। তিনিই স্রষ্টা এবং সৃষ্টিও তিনি। স্রষ্টা সৃষ্টির ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন।

সৃষ্টিলোক ব্যতিরেকে তার কোনো আলাদা বা পৃথক অস্তিত্ব নেই।[৩১] উনিশ শতকে ধর্মসাম্যের বাণী নিয়ে বাঙলায় আবির্ভূত হন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৯৬)। তিনি ভক্তকুলক শিক্ষা দিলেন সৃষ্টিকে স্রষ্টাজ্ঞানে সেবা করতে। তাঁর অনবদ্য বাণী 'যত্রজীব তত শিব'। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা বিরাজমান। ড. তারাচাঁদ লেখেন : 'সুফিবাদ একটি জটিল চিন্তা-পদ্ধতি। একটি নদী যেমন বহুস্থান থেকে আগত উপনদীর স্রোতে স্ফীত হয়, এও ঠিক তেমনি। এর আদি উৎস পবিত্র কোরান ও হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর জীবন। খ্রিস্টধর্ম ও নবপ্লেটোবাদী চিন্তায় তা পুষ্ট হয়। হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে কিছু ভাবনা তাতে যুক্ত হয়। যোরোয়াস্ট্রিবাদ, মানিবাদ (mamism) প্রভৃতি প্রাচীন পারস্য ধর্ম থেকেও কোনো কোনো ভাবনা তাতে সংক্রমিত হয়।"[৩২]

সুফিবাদের উৎপত্তির বিষয়টি পণ্ডিত মহলে নানা আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়েছে। আমরা এ কথায় ঐক্যমতে আসতে পারি যে, মানুষের মরমি চিন্তা আজন্ম কালের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি শিশুতোষ কবিতায় বলেন :

> খোকা মাকে সুধায় ডেকে
> এলাম আমি কোথা থেকে
> কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমাকে?

জীবন প্রভাতে খোকার মনে উদিত এ প্রশ্ন আমাদেরও। আমি কোথা থেকে কিভাবে এলাম, আর ফিরেই বা যাব কোথায়? মানুষের মনের এ প্রশ্নই বিশ্বব্যাপী মরমি চিন্তার বিকাশ। সব সংস্কৃতিতে, মানুষের ইতিহাসের সব অধ্যায়ই তা থাকে। এ হচ্ছে প্রচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য মানসপ্রক্রিয়ার ফল। বুদ্ধির সংক্রামক থেকে সংরক্ষিত সে তিমিরাচ্ছন্ন মানস-অঞ্চল থাকে, মরমি চেতনা সেখান থেকেই উদ্ভূত হয়। এটা অবচেতন মানস প্রক্রিয়াজত। যেখানে যৌন বাসনা, ভীতি, কামনা প্রভৃতি থাকে, মনের সেই প্রাবৃত্তিক অঞ্চলে মরমি চৈতন্য বাস করেন। এর এক বিশ্ব প্রসারী তাৎপর্য আছে এবং এর ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের সমকালিন।[৩৩]

সুফিদের সুউচ্চ মরমি আদর্শ এবং মানবপ্রীতিই সুফিবাদকে জনপ্রিয় করে তোলে। প্রথম দিকে আল্লাহর মহত্ব ও দয়াশীলতার চাইতে তাঁর ক্রোধ, প্রতিহিংসা ও শাস্তিদানের প্রতিই মুসলিম মানসে ভয়ভীতি হিসেবে কাজ করেছিল। আল্লাহ যেন দূরবর্তী কোনো ভয়ঙ্কর শাসক ও শাস্তিদাতা। অচিরেই সুফিবাদ মানুষের আবেগাত্মক জীবন থেকে ভয়-ভীতি দূর করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ দয়াশীল ও ক্ষমাবান এবং তিনি মানুষকে ভালোবাসেন, অর্থাৎ আমরাও আল্লাহকে ভালোবাসবো, তাঁর প্রেমে আত্মমগ্ন হবো, কেননা, আমরা তো স্রষ্টারই অংশ। এভাবে সুফিবাদ আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে সামর্থ্য হয়। সৃষ্টি ও স্রষ্টা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনই সুফিবাদের মূল তত্ত্ব।[৩৪]

ইসলামি ধর্মতত্ত্বে গাজ্জালি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি যুক্তির সর্বোচ্চ কার্যকারিতা বাতিল করেন। মরমিবাদের উপর নির্ভর করে তিনি ভাবসমাধি এবং প্রত্যক্ষ সজ্ঞাকেই জ্ঞান লাভের প্রকৃত পন্থারূপে গ্রহণ করেন। তাই তিনি জাগতিক জীবন থেকে নির্লিপ্ত হয়ে মরমি সাধনায় তৎপর হন এবং কাঙ্ক্ষিত মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হন। গাজ্জালির উত্তরণ ঘটেছিল মতবাদের গোড়ামি থেকে মরমিবাদে।[৩৫] ইবনে সিনাও বলেন, যুক্তি শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই কার্যকর, পরম সত্য সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রত্যক্ষ ও সহজ জ্ঞানলাভ সম্ভব শুধু স্বজ্ঞার মাধ্যমেই। ইবনে সিনার অধিবিদ্যা ছিল সুফিবাদের কারখানার পেষণযন্ত্রস্বরূপ, কেননা পরম বাস্তবকে তিনি উপলব্ধি করেছেন শাশ্বত সৌন্দর্যরূপে, আত্মপ্রকাশ তার প্রকৃতি। সৌন্দর্যের উপলব্ধি হচ্ছে প্রেম, আর প্রেম জগতের চালিকা শক্তি। প্রেমের মাধ্যমেই মানবাত্মা পরম বাস্তবের সঙ্গে তার ঐক্য অনুভব করে।[৩৬] বার শতক থেকে মুসলিম মানসে সুফিবাদের প্রভাব ক্রমে প্রবলভাবে অনুভূত হতে থাকে। সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মচিন্তায় সর্বত্র সুফি প্রভাব প্রতিফলিত হতে শুরু করে। আমির খসরু নিম্নোক্ত বক্তব্যে সুফি মতবাদের মর্মবস্তু ব্যক্ত করেন।

আমি প্রেমাস্পদের প্রেমই বুঝি। সে প্রেম সমজিদেই পাওয়া যাক, আর মন্দিরেই পাওয়া যাক, কিছু তাতে আসে যায় না; সেই প্রেমাস্পদের প্রেমিক যারা, তাদের কাছে মোস্‌লেম কে, আর অমোস্‌লেম্ কে, এসবের আলোচনার কোনো অর্থই নাই। একবার যাবে নিজের অন্তরের দিকে, আর একবার যাবে বন্ধুর গলির দিকে। প্রেমিকের জন্য এর চেয়ে ভাল পথ আর নাই! হে ব্রাহ্মণ, ইসলাম তো আমায় ছেড়েছে, তুমি কিন্তু এ পথ ভ্রষ্টকে ছেড় না! প্রতিমার মন্দিরে যেতেও তার যে কোনো সঙ্কোচ নাই! কতবার লোকে আমায় বলেছে, উপবীত পর, ঘোর পৌত্তলিক তুমি! আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, আমার দেহের কোন রগটি আছে, যা উপবীতে পরিণত হয় নি।"[৩৭]

সুফি-ভাবধারা ইরানে সবিশেষ বিস্তার লাভ করেছিল; যে ফার্সি কাব্য-সাহিত্য বিশ্বসভ্যতার অন্যতম গৌরবের বস্তু, তার জীবনধারা এই সুফি আদর্শ থেকেই প্রবাহিত হয়েছিল। শাসম তবরেজ, রুমি, সাদি, হাফেজ, জামি প্রভৃতি মহাকবিরা সকলেই সুফি ছিলেন। ওমর খৈয়ামের কবিতাও সুফি ভাবমূলক, তবে তিনি সুফি ছিলেন বলে মনে হয় না। মধ্যযুগের দরবেশ, আওলিয়া প্রভৃতি সকলেই সুফি-মতবাদী ছিলেন।

মুসিলম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সুফিবাদ ভারতবর্ষে এসে দেখা দেয় এবং ভারতীয় সমাজ বিশেষত ভারতীয় মুসলিম সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। খাজা মইনুদ্দিন চিশতী, নিজাম উদ্দীন আউলিয়া, শাহ সুফি-সুলতান, শাহজালাল প্রভৃতি বিখ্যাত তাপসেরা সুফিমতাবলম্বী ছিলেন। আমির খসরু, উরফি, ফায়জি, আবুল-ফজল, কবীর, সারমুদ প্রভৃতি কবি সুফি-আদর্শই প্রচার

করেন। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম যেমন রাষ্ট্রীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, খলিফা আল-মামুনের সময় মোতাজেলাবাদ যেমন রাজকীয় সম্মান লাভ করে, সম্রাট আকবরের সময়ে সুফিবাদ তেমনি সাম্রাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর আজীবন সুফিমতবাদী ছিলেন এবং পরিণত বয়সে পির বা ধর্মগুরুরূপে নিজেকে প্রচার করেন।

সুফি আদর্শের বাইবেল হচ্ছে জালালুদ্দীন রুমির মাসনাভি নামক বিরাট কাব্যগ্রন্থ। প্রত্যেক দুই লাইনের মধ্যে মিল রেখে যে কবিতা লেখা হয়, ফার্সিতে তাকেই মাননাভি ছন্দ বলে। রুমির সমগ্র গ্রন্থটি এই ছন্দে লেখা হয়েছে বলেই এ-কে মাসনাভি নামে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান, চিন্তা এবং ভাবের ঐশ্বর্যে এ গ্রন্থ সত্যই অতুলনীয়। মানুষ কিসের সন্ধানে ফেরে, কিসের জন্য তার অন্তরের ব্যাকুলতা, কার বিরহে সে কেঁদে বেড়ায়, এই চিরন্তন সমস্যার আলোচনা নিয়েই রুমি তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধ করেছেন। এসব প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, তাই হলো সুফিবাদের মূল কথা। কবি বলেছেন :

> 'বাঁশীর সুর শোন।
> কেন সে নিজে কথা বলে চলেছে?
> কিসের বিরহে সে কাঁদছে?
> সে বলে যে দিন হতে ঝাড় থেকে তারা আমায় বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই দিন থেকেই আমার এই ক্রন্দন! ...
> কেন আমি কাঁদি?
> আমার কাঁদার মধ্যেই তাঁর সন্ধান তুমি পাবে!
> তবে সাধারণ মানুষ অন্ধ, বধির!
> চোখ তাদের আছে বটে, কিন্তু তারা দেখতে পায় না!
> কান তাদের আছে বটে, কিন্তু শুনতে পায় না! ...
> আমার বাঁশীর সুর-তাঁর সুরেরই প্রতিধ্বনি!
> আমার আত্মার ক্রন্দন-তাঁর ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি!'[৩৮]

প্রেমিক সুফি পৌত্তলিককে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না। চিরসুন্দরের অপরূপ সৌন্দর্যের একটুখানি আভা প্রতিমার দেহে পড়েছে বলেই তো পৌত্তলিক তার সামনে প্রণত হয়। এই সত্যটিকে ওমর খৈয়াম অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন : "প্রতিমা-পূজককে সম্বোধন করে প্রতিমা বললে, হে ভক্ত! কেন তুমি আমার সামনে প্রণত হচ্ছ, তাকি তোমার জানা আছে? তাঁর সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব আমার উপর এসে পড়েছে। তাইতো তুমি আমার প্রেমিক! তাইতো তুমি আমার ভক্ত!"

কবি হাফিজ সুফির এ আদর্শ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন : বাহাত্তরটি ধর্মসম্প্রদায়ের এই যে, কলহ-তার জন্য তাদের ক্ষমা কর। সত্য দেখতে পায় নি বলেই অলীকের পেছনে তারা গিয়েছে। প্রকৃত সুফির কাছে হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, খ্রিস্টান সবাই সমান। সবাইকে ভালোবাসতে হবে, সবার দুঃখ দূর করতে হবে, সব ধর্মের সম্মান করতে হবে, এই হল সুফি বা প্রেমধর্মের মহান আদর্শ।

হাফেজের কথায় : "হে হাফেজ! তুমি যদি সত্য-স্বরূপের সঙ্গে মিলন কামনা কর, সকলের সঙ্গে তাহলে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন কর। মুসলমানের সঙ্গে আল্লা-আল্লা বল, আর ব্রাহ্মণের সঙ্গে বল রাম রাম!"[৩৯] সুফিবাদের এই উদার মানবতাবাদ ও সমন্বয়ী চেতনার এক জ্বলন্ত নিদর্শনের পরিচয় এস. ওয়াজেদ আলী তাঁর ভবিষ্যতের বাঙালী গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন :

> এই উদার মনোভাবের বহু নিদর্শন আমাদের এই বাংলাদেশেই বর্ত্তমান আছে। এখানে আমার প্রত্যক্ষ এক অভিজ্ঞতার কথা বলছি। হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নামক এক গ্রাম আছে। একদা বাদশাহী আমলে এ স্থান সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল। এখনও সেখানে বিরাট এক মসজিদের ভগ্নাবশেষ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান এবং প্রকাণ্ড এক মিনার দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই পাণ্ডুয়ার শাহ সুফি সুলতান নামক বিখ্যাত এক দরবেশের মাজার বা সমাধি-সৌধ আজও বর্ত্তমান আছে। সুলতান জালালুদ্দীন খিলজির সময়ে শাহ সাহেব বাংলাদেশে এসেছিলেন। মাজারের নিকট ক্ষুদ্র একটি মসজিদ আছে। সেই যুগের তৈয়েরী সেই মসজিদে এখনও নামাজ হয়ে থাকে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই শাহ সাহেবের এই মাজার।
>
> আমি একবার মোটরযোগে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। মাজার দর্শনের উদ্দেশ্যে মোটর থেকে নামলুম। তখন সন্ধ্যা সমাগত। মসজিদ থেকে আজানের আহ্বান শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আরতির শঙ্খ এবং কাঁসর-ঘণ্টাও বেজে উঠল। এমন অপূর্ব্ব ঘটনা ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি। আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ খাদেম বা সেবাইত ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। তিনি যা' বললেন তা' শুনে বিস্ময়ে সত্যই অভিভূত হলুম। তাঁর বক্তব্যের সারর্ম্ম এই যে, মুসলমানের যিনি খোদা তিনিই হিন্দুর ভাগবান। তাঁরই উদ্দেশ্যে নামাজের ডাক আর শঙ্খের হাঁক। ভাষা, আচার, রীতি, সবই তো বাইরের। অন্তর্য্যামী মানুষ মাত্রেরই অন্তর দেখে বিচার করেন এবং প্রেম ও ভক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়েন। সর্বশাস্ত্র তাঁরই মহিমা-কীর্ত্তন করে; সেই প্রেমেব ঠাকুরকে যিনি জেনেছে বা চিনেছেন তার ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না।
>
> বৃদ্ধ সেবাইতের সহজ সরল বিশ্বাস আমার অন্তর অভিভূত করল। আমি সম্ভ্রমে আনত হয়ে কবর চুম্বন করলাম। ফিরবার পথে বার বার মনে হতে লাগল, হায়, আমরা বাঙালী যদি আজ এই প্রেমের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হতে পারতাম তাহলে সৌহার্দ্দ্যে, প্রেমে, আত্মার আত্মীয়তায় এ দেশে কি শ্রেয়ঃ, শক্তি ও কল্যাণই না বিরাজ করত! বাংলার সরস চিত্তক্ষেত্রে সুফি ও বৈষ্ণবের পারস্পরিক প্রভাব, সংমিশ্রণ ও রসায়ন এক অপূর্ব্ব সহজ প্রেমধর্মের আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে। ইহা যেমিন মানবধর্ম্মী, তেমনি সার্ব্বজনীন। স্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও আছে, আর ভাবীকালেও থাকবে।[৪০]

সুফিজগতে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিত্ব হুসেন বিন মনসুর আল-হাল্লাজ (৮৫৪-৯২২ খ্রি.)। তিনি তাঁর মত পদ্ধতির প্রবর্তনের জন্য ইসলামি জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি ভারতবর্ষসহ বহু দেশ ভমণ করেন। এক সময় তাঁর কার্যাবলি নিন্দনীয় হয় এবং ৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মনসুর মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ককে অনুধাবন করেছিলেন মানবাত্মার পরামাত্মার মিলন

প্রক্রিয়ারূপে। হিন্দু পরিভাষায় তা হচ্ছে পুরুষ দ্বারা বুদ্ধির উদ্ভাসন। যার প্রতি আমার প্রেম তা আমার হয়ে যায়। আমার দুই চিৎসত্তা একদেহে সম্মিলিত, আমাকে দেখা মানে তাকেই দেখা, তাকে দেখা মানে আমাকে দেখা, অর্থাৎ আমাদের দেখা। তিনি ঘোষণা করেন, "আনাল হক" অর্থাৎ আমিই আল্লাহ। তার ব্যবহৃত শব্দাবলী সুফিবাদে বহুল ব্যবহৃত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কবীর, নানক, দাদু ও অন্যান্য ভারতীয় সন্ত মুসলিম সুফিবাদের ভাষা ব্যবহার করতেন।[৪১]

শাইখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (মৃত্যু : ১২০৯ খ্রি..) সাহসী বক্তব্যের জন্য কাজিরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সুফি দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ইবনে-আল আরবি প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কে 'দর্পণ' বলে গণ্য করতেন। এই দর্পণে ঈশ্বর প্রতিবিম্বত হন। তাঁর মতে ঈশ্বর প্রতিটি অনুতে অভিব্যক্তি, তিনি প্রতিটি দুর্জ্ঞেয় বস্তুতে প্রকটিত। তিনি বুদ্ধির আগোচর।' মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে তিনি বলেন, "মানুষে ঈশ্বরের রূপ প্রকাশ, ঈশ্বর মানুষের চিৎশক্তি। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর তার সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করেন।" তিনি আরো বলেন, ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। দেহবোধ থাকা পর্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের পূর্ণ মিলন সম্ভব নয়। বিশ্বাস ও অনুধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

এই ঈশ্বরবোধ থেকে যে কথা অনুমান করা চলে তা হচ্ছে এই যে, নানা উপায়ে নানা পদ্ধতিতে আরাধনা করা যেতে পারে এবং সব ধর্মেই সত্য নিহিত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদত্ত ধর্ম সমন্বয়ের মহত্তম বাণী "যত মত তত পথ" যেন এরই প্রতিধ্বনি। তিনি পরমতসহিষ্ণুতার অনন্য বাণী শুনান মানুষকে। রামকৃষ্ণের ধর্মচিন্তার অগ্রভাগে ছিল মহানুভব উদারনৈতিক মানবতা। মানুষের প্রতি দরদ ও প্রেমানুভূতি তাঁকে সার্বজনীন ধর্মের উপাসকে পরিণত করে। তিনি ভক্তকুলকে শিক্ষা দেন সৃষ্টিকে স্রষ্টা জ্ঞানে সেবা করতে। তাঁর "যত্র জবি তন্ত্র শিব' বাণীর মার্মিক অর্থ সব সৃষ্টি স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত, সব জীবই স্রষ্টার এক একটি খণ্ডাংশ। তাই তিনি মানুষকে পরামর্শ দান করেছেন শিবজ্ঞানে জীব সেবার। অর্থাৎ স্রষ্টার সান্নিধ্য পাবার জন্য সৃষ্টি সেবা কর। সব ধর্মের মূল লক্ষ্য এক, সব ধর্মই শ্রেষ্ঠ, সব ধর্মেই মানুষের মঙ্গল নিহিত, এভাবে তিনি পরমসহিষ্ণুতার অনন্য বাণী শুনান মানুষকে। সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার সারবস্তু সর্ববস্তুতে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যেতে পারে এবং সে জন্য সকল মতের প্রতি সম্পূর্ণ সহনশীলতা অবলম্বন করা উচিত।[৪২]

সুফিধর্ম ঠিক সন্ন্যাসও নয় আবার গৃহধর্মও নয়। সুফিবাদের স্বতঃপ্রণোদিত ধারণা সংসার বিমুখতা ও দারিদ্র্যতা ঈশ্বর লাভের প্রকৃত উপায়। স্রষ্টার প্রতি প্রেম মাহাত্ম্য সুফিদের প্রধান অবলম্বন। আসলে সুফিবাদ প্রেমবাদী মতবাদ। সে প্রেম হলো আল্লাহ প্রেম। সুফিবাদে বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদী প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধ-নির্বাণবাদ ও 'ফানা' তত্ত্বের উন্মেষ-এর সহায়ক হয়েছে এবং সুফিরা তাত্ত্বিক ও মরমি হলেও তা ইসলামপন্থি এবং এরা কোরআনকে আশ্রয় করে বৈরাগ্যের দিকে এগিয়ে যায়।[৪৩]

সুফিবাদে ব্যক্তিগত জীবনযাপন অর্থাৎ জীবনের প্রায়োগিক দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির আচরণ, চাল-চলন খাদ্যাভাস থেকে শুরু করে জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তাপসিকতা ও নির্মোহপরায়ণতা সুফিদের মৌল দিক। আমরা ভারবর্ষের ও সেই সঙ্গে বাঙলায় সুফিবাদ বিস্তারের আদি পর্যায়ে তাদের আস্তানায় জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে লোকজনকে সমাগত হতে দেখি। তাদের জীবনযাত্রার সরলতা, আন্তরিক ধর্মপরায়ণতা, আবার কখনও কখনও সুফিদের অলোকিকত্বের জনশ্রুতি, তাদের নির্লোভ ও নিরহঙ্কারমূলক জীবনযাপনে জনসাধারণকে মুগ্ধ করতো।

বাঙলার নাথপন্থিদের কঠোর তপস্যা, আত্মনিগ্রহমূলক বৈরাগ্য ও অলৌকিক ক্ষমতার কল্পকথা প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি মানসে দৃঢ়মূল ছিল। প্রচলিত ধর্মসংঘের বিরুদ্ধে উদ্ভূত নাথসিদ্ধাদের সহজিয়া পন্থা সেকালে শুধু বাঙলায় নয়, সর্বভারতেও ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। সুফিতত্ত্বের সাধক, পির দরবেশের সঙ্গে নাথ গুরুদের ধর্মসাধন পন্থার খানিকটা ঐক্য আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। সুফিতত্ত্বের ধারায়, হালকায়ে জিকির, ধ্যানমগ্নতায় আত্মার নানা রূপ দর্শনের প্রয়াসের সঙ্গে বাঙালির এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের নিজস্ব দর্শন সাংখ্য-যোগের একটি গভীর মিল আছে। কায়াসাধনার যে রীতি-পদ্ধতি সুফিবাদে প্রত্যক্ষ করা যায়, তার সঙ্গেও সিদ্ধাচার্যদের কায়া সাধনার মিল আছে। সায়াসাধনা কঠিনতর শারীরবৃত্তীয় সাধনা। যোগ দর্শন ও সুফি দর্শনের এই শারীরবৃত্তীয় সাধনার প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের সম্মিলন ঘটেছে উদারনৈতিক ভারতবর্ষের মানস-ভূবনে।[৪৪] এখানে সুফিবাদ পেয়েছে নতুনমাত্রা-যার স্বতঃসিদ্ধ অভিধা উদার মানবতাবাদ, এখানে বেদ-বাইবেল-কোরআন পুরাণ নয়, এখানে মানবই সত্য, মানুষই মহান, এখানে "সবার উপর মানুষ সত্য"।

সুফিবাদের অভীষ্ট হচ্ছে ঈশ্বরে নীল হয়ে যাওয়া। এই যে ঈশ্বরের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মার একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করতে হলে ইসলামি শাস্ত্রমতে সাধনপথের চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়।[৪৫] স্তরক্রম হচ্ছে শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফত। পাঞ্জু শাহ বলেন :

আল্লাহতালা চার রাহা করিয়াছে তায়।
শরিয়ত তরিকত জানিবা ত্বরায় ॥
হকিত মারুফত এই চারি হয়।
চারি রাহে দুই ভেদ জানিবা নিশ্চয় ॥

এই চারটি স্তরের প্রত্যেকটি অপরটির পরিপূরক। এতদ্‌সত্ত্বেও গুহ্যার্থ বা মার্মিকতার দিক থেকে প্রত্যেকটি স্তরক্রমই পৃথক ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

শরিয়ত : আল-কোরআনে সরলীকৃত অর্থ বা সাধারণ অর্থ যা সর্বসম্মুখে প্রকাশিত, যা সাধারণভাবে পালনীয় এটাই শরিয়ত। অর্থাৎ ইসলামি বিধানাবলির যে অর্থ প্রকাশিত তা-ই শরিয়ত। এক কথায় বলা যায় শরিয়ত হচ্ছে সোজাপথ বা

সরল পথ। শরিয়ত হলো প্রকাশ্য বিদ্যা, অর্থাৎ গুপ্ত নয়। সত্যভাবে, সরল ও সটিক পথ অবলম্বন করে আল্লাহর আরাধনা করে তারই অনুগত অর্থাৎ সরলভাবে ইসলামের বিধানাবলি মেনে আল্লার পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় বা পথ-নিদের্শই শরিয়ত।

তরিকত : শরিয়তের বিধিনিষেধ ও পালনীয় বিধানাবলি সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সাধক তরিকত নামক স্তরে পৌছেন। তরিকত হচ্ছে পথ। এই পথের জন্য পথ-প্রদর্শক আবশ্যক। অর্থাৎ সাধকের একজন আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শকের সাহায্য প্রয়োজন। এই পথ প্রদর্শককে বলা হয় 'পির' বা 'শেখ', যিনি তাকে তদীয় অন্তরসত্তার পবিত্রকরণে শিক্ষা দেন। পির সাধককে পথের নিশানা দেখান। তরিকা অনেক। তার মধ্যে বিশেষ ৪টি হলো : কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, চিস্তিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া।

হকিকত : তরিকত থেকেই হকিকতের যাত্রা। কোরআনের মূল অর্থ জানতে চাওয়া, অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, বুঝে নেয়া ও বুঝিয়ে নেওয়াই হলো হকিকত। শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত একে অপরের সঙ্গে অঙ্গীভূত বা যুক্ত। একটা থেকে অপরটির উত্তরণ। কোন পথ ধরে যেতে হবে এবং সেই পথের দিক নির্দেশ এবং হুঁশিয়ারি ছাড়া যেমন চলা যায় না, তেমনি গুরুর কাছে হকিকত পন্থিকে জেনে নিতে হয় কোন লতিফার পর কোন লতিফার সবক নিতে হবে।

মারিফত : ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের এটা সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরে তর্ক যৌক্তিকভাবে পরিহার করা হয়-কেননা তা ঈশ্বরজ্ঞান লাভের জন্য অনাবশ্যক। এখানে পরিশুদ্ধ মনকে স্বর্গীয় জ্ঞানের সাহায্যে আলোকিত করা হয়। যারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন-ঈশ্বরও তাকে কৃপা করেন, তখন ব্যক্তি ইচ্ছা বলে আর কিছু থাকে না-সাধকের সমস্ত কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছা-ক্রিয়া বা প্রকাশরূপে পরিগণিত হয়।[৪৬]

আত্মসংযম, নিষ্ঠা ও নৈতিক উৎকর্ষের দ্বারা সুফি যে স্তরে উন্নীত হন তা ফানাফিল্লাহ বা আত্মোৎসর্গ বা আত্মার বিনাশ এবং বাকি-বিল্লাহ বা স্রষ্টার নৈকট্য লাভ বলে পরিচিত। এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে। সুফি যখন 'ফানা' থেকে বাঁকায় পৌছেন তখন তার বিষয় বিষয়ী ভ্রম কেটে যায়, ব্যক্তিগত বোধ তিরোহিত হয়, বিধান বা ধর্মাচারের আনুষ্ঠানিকতা লোপ পায়। সাধক সার্বিক মিলনের স্তরে একাত্ম হয়ে যান। যেমন মনসুর হাল্লাজ ঘোষণা করেন 'আনাল হক' অর্থাৎ 'আমিই আল্লাহ-আমি তিনি, যাকে আমি ভালোবাসি এবং যাকে আমি ভালোবাসি তিনি আমি'।

আসলে মারফত হলো গুপ্তবিদ্যা। স্রষ্টার দর্শন পেতে হলে যে গুপ্তবিদ্যা বা সাধনা (দেহতত্ত্ব) আয়ত্ত করতে হয়, তা কঠিন এবং তন্ত্রাচারসম্মত। মারফতি প্রেম গুরু পরম্পরায় আয়ত্ত করে প্রেম-সাধনা পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে প্রকৃত প্রেমবস্তুর সান্নিধ্যে আসা যায়। এই সাধনা পার্থিব প্রেম ও দেহজ প্রেম দিয়ে শুরু

হলেও শেষ পর্যন্ত নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে অপার্থিব প্রেমে উত্তরণ ঘটে।[৪৭] এই যে প্রেম সাধনা এর নিশানা আছে গুরুর কাছে। গুরুই বলে দেবেন প্রেম সাধনার পথ। অন্তরের প্রগাঢ় ভালোবাসা দিয়ে আরাধনা করে নিজেকে ঈশ্বর চেতনার সাথে বিলীন করে দেয়া এবং নিজের মধ্যে ঈশ্বর সত্তা বোধ করা অথবা ঈশ্বরে লীন হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলার সাধনাই মারফতি সাধনা। তবে অবশ্যই শরিয়তের পথ ধরেই এ পথে আসতে হবে। শরিয়ত হচ্ছে প্রকাশিত যা সর্বজনবিদিত আর মারফত অপ্রকাশিত বা গুপ্ত যা সাধারণ্যের বোধগম্য নয়, যা কেবল গুরুর নির্দেশনা মতো নিরন্তর সাধনা করেই অর্জন করা সম্ভব।

'পির' বা শইখ হচ্ছে সুফিবাদী সাধনায় একান্ত কেন্দ্রীয় বিষয়। সুফিবাদে পির বা গুরু বিদ্যক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি শিষ্যকে পথ দেখান। ধুলনুন বলতেন, যথার্থ শিষ্য ঈশ্বরের চেয়ে গুরুর প্রতি অধিক অনুগত হবে। গুরুভক্তি থেকেই সুফিরা ব্যক্তিকে পূজ্য করে তোলেন। শিষ্যকে বলা হয় তিনি যেন মুর্শিদকে (গুরু বা পিরকে) নিয়তই স্মরণ করেন-যেন মুর্শিদের মধ্যে তার আত্মবোধকে বিসর্জন দেন। মুর্শিদের কাছে আত্মসমর্পণের ও আত্মলয়ের বাণী ধ্বনিত হয় সুফিবাদে।

সুফিদের আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে, যিকির, গীত (সংগীত) ও নৃত্য। যিকির ভারতীয় যোগপদ্ধতির ধ্যান ও প্রণায়মের সমতূল্য। শিবলি তাঁর প্রদত্ত সুফিবাদের সংজ্ঞায় এ বৈশিষ্ট্যর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, "সুফিবাদ শারীরবৃত্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রক"। গীত ও নৃত্যের বিধিসম্মততা নিয়ে বিতর্ক আছে। আল-গাজ্জালির মতে এটা নিষিদ্ধ নয়। তিনি সুফিবাদে তা অনুমোদন করেন এ জন্য যে-ভক্ত এর সাহায্যে ঈশ্বরের সাথে গভীর প্রেমকে অনুভব করতে পারেন। হুজুইরির মতে গীত বিধিসম্মত, কিন্তু নৃত্য গর্হিত। রুমি সংগীত ও নৃত্য উভয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। শইখ বদর উদদীন সম্পর্কে (ত্রয়োদশ শতকে এই সন্ত ভারতে বসবাস করেন) বলা হয় যে, "বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি নড়াচড়া করতে পারতেন না, তখন একটি 'স্তবগান' শোনামাত্র তিনি তুরিয়ানন্দে অধীর হয়ে উঠতেন ও যুবার মতো নাচতে শুরু করতেন। এই অশক্ত অবস্থায়ও শইখ কিভাবে নাচতে পারতেন জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলতেন, শইখ কোথায় প্রেম নাচে।"[৪৮]

সুফিরা কেবল তাদের আত্মোৎকর্ষ লাভের জন্যই নিজেকে নিয়োজিত করেন না, তাঁরা ইসলামের জন্য এবং মানব সেবার জন্য হিতৈষণামূলক কাজেও নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন। মানব সেবাকে তারা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেমরূপে বিচেনা করে থাকেন। রুমি বলেন, "মানুষের চিত্ত জয় করাই মহত্তম তীর্থযাত্রা। তিনি বলেন, কাবা তো কেবল ইব্রাহিমের গৃহ, কিন্তু হৃদয় হচ্ছে আল্লার একমাত্র আবাস।" আমরা অনেক সুফি সাধকের ব্যক্তিগত জীবনাচার থেকে জানতে পারি মানব সেবার জন্য তারা কিভাবে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। কিভাবে তারা নির্যাতিত ও অবহেলিত মানুষদের সেবায় নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

ভারতে ও বাঙলায় সুফিবাদ

ধর্ম প্রচার ও মানব সেবার সুমহান ব্রত নিয়ে কখনো কখনো বিপদ অত্যাসন্ন জেনেও ইসলামের প্রথম যুগের সুফিরা ভারত ও বাঙলায় আগমন করেছিলেন। সুফিদের ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস ফুলের বেনুনি গাথা মালা সদৃশ্য। আরব থেকে এর গাথুনি শুরু, তারপর পারস্য হয়ে প্রেম-যোগ-ভক্তিবাদসিক্ত ভারত ও উদার ভাবভূমি বাংলাদেশে প্রবিষ্ট হয়। অনুমান করা খুবই সঙ্গত যে সুফি দর্শনের মতো একটি প্রবল ভক্তিবাদসিক্ত জীবন দর্শনের উৎসস্থল কিঞ্চিৎ কম উৎকর্ষই ছিল-যা ছিল গোলাপ কুঞ্জময় পারস্যে এবং প্রেম-যোগ-ভক্তি ও ভাবময় বাংলাদেশে।

আরব, প্যালেস্টাইন, মিশর প্রভৃতি পশ্চিমী দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ইতিহাসে অতি প্রাচীন।[৪৯] এমনকি প্রাক-মুসলিম আরব বসতির কথাও ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তাদের আগমন বাণিজ্যিক ব্যাপদেশেই ঘটে থাকা স্বাভাবিক। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুসলিম নৌবহর ভারতীয় জলসীমায় উপনীত হয়। নবম শতকে তারা ভারতের পশ্চিম উপকূল, দক্ষিণ উপকূল ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। ১১৯২ খ্রি. মুহম্মদ ঘুরির সৈন্যদলের সাথে আসেন খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি। আজমীর শহরের তার দরগাহ; ভারতীয় সুফিদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। মুলতানের শেখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (১১৬৯-১২৬৬ খ্রি.) এ উপমহাদেশে সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। বুখরার অধিবাসী খাজা বাহাউদ্দীন (মৃত্যু : ১৩১৮) নকশবন্দিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এতে হিন্দুদের যোগপ্রক্রিয়া, হটযোগ, প্রাণায়াম, ষট্চক্রভেদ, অজপা হবস-এ দম (শ্বাস-প্রক্রিয়া) প্রভৃতি যুক্ত করেন। ভারতের যোগতন্ত্র সমৃদ্ধ ব্যাপারগুলি জালালের 'মাসনভি'র সঙ্গে কবীর-এর 'ভীজক' যুক্ত হয়ে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ঐতিহ্যময় ধারা সৃষ্টি করেন জালাল ও কবীর। এঁরা হিন্দু-পারসি মিলনের মঙ্গল গীত রচনা করেন।

ভারতীয় জীবন দর্শনে মোক্ষলাভের বিষয়টি একটি প্রধান অনুষঙ্গ। মোক্ষলাভ হয় তিনটি মার্গকে অবলম্বন করে। এগুলো হচ্ছে, কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। কর্মমার্গ সর্বপ্রাচীন। জ্ঞানমার্গের উদ্ভব হয় মাঝ পথে। সবার শেষে ভক্তিমার্গের উদ্ভব হয়; আর ভক্তিমার্গের সাথে যুক্ত হয় প্রেম। বেদসমূহে কর্মমার্গের কথা বিধৃত। ভগবদগীতায় কর্মামর্গের উৎকর্ষ ঘটে। সেখানে বলা হয় কর্মমার্গে মোক্ষলাভ সম্ভব এবং কর্মকে ব্যাখ্যা করা হয় নিষ্কাম কর্মরূপে।[৫০]

মোক্ষলাভের দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি ছিল তাদের বক্তব্য। মোক্ষ লাভের উপায় সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব, তন্ত্র, লোকায়ত (চার্যাক) প্রভৃতি ধর্মীয় দার্শনিক মতপদ্ধতির সূচনা হয়। বৈদিক বিধি-বিধানের ধারণা কর্মভাবনার সাথে সমন্বিত হয়। কর্মকে বিবেচনা করা হয় কার্য ও কারণের সম্পর্করূপে।

মুক্তির তৃতীয় পথ হচ্ছে ভক্তিমার্গ। ভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে ব্যক্তিগত দেবতাকে প্রেমের সঙ্গে উপাসনার নাম ভক্তি। এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে যে, পরমারাধ্যের গুণাবলি অবগত হবার পর তার প্রতি যে অনুরাগ জন্মায় তার নাম ভক্তি। ভক্তি হচ্ছে ধর্মের আবেগগত দিক। এর মূল মানুষের অনুভূতি প্রবণতায় নিহিত। অনুরূপভাবে জ্ঞান মানুষের ধীশক্তিতে এবং কর্ম মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে নিহিত।

কর্ম জ্ঞান ভক্তি এ তিনটি মানুষের মধ্যে সর্বদাই ক্রিয়াশীল। কিন্তু সময় এবং সামাজিক পরিবেশ পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একটির প্রাধান্য বেশি হবে এটা স্বাভাবিক। বৈদিক যুগে ভক্তির যে ক্ষীণ ধারার সূত্রপাত ঘটেছিল কালক্রমে ইসলামি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে ও সংমিশ্রণে তা এক মহাপ্লাবনে রূপ নেয়। ড. তারা চাঁদের বর্ণনা কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করে বলা যায়, গুরুভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম তত্ত্ব। শিয়াদের দ্বারা এর সূচনা এবং শিয়াদের থেকেই তা সুফিরা গ্রহণ করেন। কিন্তু এ কথা বলতেই হয় যে, গুরুভক্তি একটি প্রাচীন ভারতীয় ধারণা, আরো অতীতে না গিয়ে সূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহে তা পাওয়া যায়। গুরু ও ব্রহ্মচারীর (ছাত্র) মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক নিয়মাবলি সেখানে বর্ণিত হয়েছে। ছাত্রকে বলা হয়েছে যে, যেন গুরুকে আপন পিতা অপেক্ষাও অধিক মান্য করে, শিক্ষা গ্রহণকালে তাঁর প্রতি সর্বোতভাবে অনুগত থাকে এবং সারাজীবনই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। এই উপদেশাবলি প্রাচীন ভারতের জীবন দর্শনেরই বহিঃপ্রকাশ। এবং এটা প্রাক-ইসলাম সংস্কৃতি।[৫১]

গীতা ভক্তিবাদ সম্পর্কিত প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থ। কৃষ্ণ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তার প্রতি অটল বিশ্বাসই তাকে লাভ করা যায়। ভক্তকে ভগবান পরম দয়া করেন। ভগবানের দৃষ্টিতে ভক্তমাত্র সমান-কেবল ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর লাভ সম্ভব। মহাভারতের শান্তিপর্বে ঘোষিত হয়েছে ভক্তিধর্ম-কর্মমার্গীয় ধর্ম ও বৈদিক অনুষ্ঠানমূলক ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সংহিতা অনুসারে ভক্তি হচ্ছে, "আমি পাপী অসহায়, অকিঞ্চিৎকর, তুমি আমার উপায় হও।"[৫২] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর তার ভক্তকে তিনি পাপি হলেও কায়মনে আরাধনাকারীকে পুণ্যবানরূপে গণ্য করেন, অর্থাৎ ঈশ্বর দয়াশীল, ক্ষমাশীল, ভক্তকে ক্ষমা করা তার মহান ব্রত। আমরা আল-কোরআনের দর্শনেও দেখবো আল্লাহ দয়ার্দ্র এবং ক্ষমাশীল।

অষ্টম-নবম শতকে ভারতে ইসলামি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বিশেষ তাৎপর্যবহ। দক্ষিণ ভারতে তখন বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের সংঘর্ষ চলছিল। বিশেষত হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের। রাজনৈতিকভাবেও সামন্তদের মধ্যে বিবাদ বিষম্বাদ চলছিল; জনগণ কিছুটা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছিল। এমতাবস্থায় ভারতে ইসলামি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে, নবম শতকে মুসলিম বাহিনী ভারতের পশ্চিম উপকূল ও দক্ষিণ উপকূলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাব বলয়ে ভারতীয় ভক্তিমার্গে নতুনমাত্রা যুক্ত হয় এবং ভক্তি উচ্ছ্বাসময় ও বহুবিধ ধারায় পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। কি ছিল এই ইসলামি সংস্কৃতিতে?

ভারতীয় মানসে কর্ম ও চিন্তাদর্শের সূচনা শ্রুতি বা বেদ উপনিষদ থেকে, আর মুসলিম মানসের উৎসরণ হয়েছে আল-কোরআন থেকে। ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব হচ্ছে আল্লাহর একত্ব। অর্থাৎ আল্লাহ এক, তার কোনো শরিক নাই। ইসলামের গণতান্ত্রিক, মানবিক, ইহজাগতিক ও মর্যাদাসূচক বাণী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিদায় হজ্জ্ব উদ্‌যাপনকালে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ঘোষণা দেন, সকল মানুষ এক আদমের সন্তান, মানুষ সমমর্যাদার অধিকারী। মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই, সাদা-কালো কোনো ভেদাভেদ নাই। তাঁর এই অভিভাষণ আধুনিক বিশ্বে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বয়ে আনে।

সমাজ জীবনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ ও মর্যাদাসূচক উদারনৈতিক মানবীয় কর্মকাণ্ডের প্রভাবে হাজার বছর ধরে আচরিত হিন্দুধর্মের সামাজিক বিভেদসমূহ ভেঙ্গে যাবার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। হিন্দুরা ধর্মের নামে মুসলমানদের চেয়ে অনুদার ছিল বিশেষত কর্মজীবী মানুষের বেলায়। ইসলাম ধর্মের অচলায়তন ছিল বহু দরজাবিশিষ্ট ও মুক্তদ্বারসম্পন্ন।[৫৩] তাতে প্রবেশ ও প্রস্থান করার স্বাধীনতা ছিল সর্বৈব। অপরপক্ষে এই বিজয়ীদের সাথে আসেন সুফিবাদী পণ্ডিতমণ্ডলী। সুফিদের উৎপত্তি ও দার্শনিক মতবাদের পেছনে মানুষে মানুষে সমমর্যাদার ঘোষণা থাকায় তারা ভারতবর্ষের লোক সাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সুফিবাদীরাই ভারতে ইসলাম প্রচার ও ইসলামি সংস্কৃতিকে দৃঢ়মূল করেন।[৫৪]

ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতাগুলির অন্যতম। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী, পদ্মা, যমুনা নদীবিধৌত সুবিশাল কৃষিভূমি এবং হিমালয় পর্বতমালা ও ঘনবনাঞ্চল সমৃদ্ধ মানুষের আদিম সভ্যতার সোনালী ভৌগোলিক অঞ্চল। এই আসমুদ্রহিমাচল উর্বর ভূমিমাতা যুগে যুগে হাতছানি দিয়েছে বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর মানুষকে—এসেছে নানা জাতপাতের মানুষ, উত্তর-পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে তারা অনুপ্রবেশ করেছে দলে দলে। ভারতবর্ষ দিয়েছে নিয়েছেও-পৃথিবীর এমন কোনো সমাজ-সংস্কৃতি বা রাষ্ট্র নেই যারা ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সম্পদের দান নেয় নি। বলা যায় এটা ভারত বর্ষের অহংকার। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সমন্বয়ধর্মী। ইতিহাসের ঊষাকাল থেকেই ভারতবর্ষে পরস্পরবিরোধী সভ্যতাসমূহের সমাবেশ ঘটেছে। এতে সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত আচার-বিশ্বাস, কলা, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতির সমন্বয় ঘটেছে। পৃথিবীর নানা ভৌগোলিক অবস্থান থেকে আগত সংস্কৃতি স্রোতের সহাবস্থানের ভিতর দিয়ে এর সংহত রূপটি গড়ে উঠেছে।

প্রাগ-ইতিহাস কাল থেকে সাত শতক পর্যন্ত বিকাশমান হিন্দুধর্ম সংগঠিত হয় উত্তর ভারতে। প্রাচীন ধর্ম-শাস্ত্রসমূহ উদ্ভূত হয় সেখানে। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, চার্বাক ইত্যাদি দার্শনিক মতবাদসমূহের উৎপত্তির উৎসস্থান উত্তরভারত। আট থেকে পনের শতক পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার সংগঠিত হয় দক্ষিণ ভারতে। এখানে বৈষ্ণব ও শৈব সন্তগণ তাদের ভক্তিবাদ প্রচার করেন, শঙ্কর, রামানুজ

তাদের চিন্তাদর্শ প্রচার করেন। শঙ্কর তার উত্তরসূরিদের চিন্তাদর্শের সাথে মুসলিম ধর্মশাস্ত্র, সুফিবাদ ও মরমিবাদের সংমিশ্রণ ঘটান।[৫৫]

ভক্তিবাদী রামানুজের জন্ম হয় ১০১৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে। তিনি শঙ্করের একত্ববাদ ও মায়াবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। বেদান্ত দর্শনের পটভূমিতে ভক্তিবাদের সংস্থাপন ছিল রামানুজের লক্ষ্য। তাঁর মতে, ব্রহ্ম হচ্ছে প্রকৃতিতে ও গুণে এক অনতিক্রম্য মহত্বে ভূষিত পরম বাস্তব। তিনি দোষমুক্ত এবং অসংখ্য মহৎ গুণের এক অনতিক্রম্য মহত্বে ভূষিত পরম বাস্তব। তিনি দোষমুক্ত এবং অসংখ্য মহৎ গুণের আধার। তিনি সৃষ্টি করেন, সংহার করেন ও রক্ষা করেন। তাঁর মতে, আত্মা ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করে। প্রথমে সে ত্যাগ ও কর্মের দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং একাগ্রতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে ভক্তিলাভে সমর্থ হয়।[৫৬] রামানুজের সমসাময়িক নির্ম্বাক ভক্তিবাদকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান।

দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে সেতুস্বরূপ ছিলেন রামানন্দ। তিনি ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৫৭] ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ও উদার নৈতিক চিন্তা দুই ক্ষেত্রেই নতুনমাত্রা যুক্ত হয়। তার দুই শিষ্য তুলসি দাস রক্ষণশীল মতাদর্শের প্রবক্তা এবং কবীর উদার মানবতাবাদের প্রতিভূ। রামের ভক্তি গীতিতে তুলসি দাস অতুলনীয়। অপরপক্ষে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের জন্য, বিশেষত হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য এক নতুন ধর্ম রচনায় উদ্যোগী হন কবীব।

কবীর (আনু : ১৩৯৮-১৫১৮ খ্রি.) ছিলেন বিখ্যাত মরমি সাধক। কবীর বহু সুফি ও সাধুসন্তের সাথে মেলামেশা ও মত বিনিময় করেন। তাঁর প্রদত্ত মতবাদ তখনকার সুফি মতাদর্শের সাথে এতটাই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে তাঁকে সুফিদের থেকে পৃথক ভাবাই কঠিন ছিল। মনে করা হয় তিনি ব্রাহ্মণ বিধবার পরিত্যক্ত সন্তান; মুসলমান তন্তুবায় দম্পতি কর্তৃক প্রতিপালিত অথবা তন্তুরায় দম্পত্তির আপন সন্তান। কবীর মরমি ধর্মচিন্তা প্রচার করতেন। মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতি নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হলহ হয়, মুসলমানরা কবর দিতে চায় এবং হিন্দুরা দাহ করতে চায়। এই বিবাদটা তাৎপর্যবহ; কেননা কবীরের শিক্ষা এতটাই উদার ও নিবপেক্ষ ছিল যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই তাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবি করতো।

কবীর তাঁর প্রাণের সব কথাই প্রকাশ করেছেন কবিতা ও গানে। কবীরের গান বা দোহা ভারতবর্ষে আজও পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয়। কবীর বলেন-আমি ধর্মের অনুসারী নই, আমি ধর্মহীনও নই, আমি কৃচ্ছ্রসাধক নই, বাসনার অনুরাগীও নই আমি। আমি নরকে যাই না, স্বর্গের দিকেও চাই না, আমি সকল ধর্ম সম্পাদন করি, তথাপি আমি কর্মবিরাগী।[৫৮] কবীরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও ধ্যান-ধারণা, আচার-ক্রিয়া থেকে বোঝা যায় কবীর সুফি সাহিত্যের কাছে গভীরভাবে ঋণী। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের প্রতিই তিনি আহ্বান জানান, তারা যেন সকল সৃষ্ট জীবের

প্রতি সম্মান দেখায় এবং রক্তপাত থেকে বিরত থাকে। কবীর দুঃখিত হন যে, হিন্দুরা রামকে ডাকে, মুসলমানরা ডাকে রহমানকে। তবু উভয়ে যুদ্ধ করে ও একে অন্যকে হত্যা করে এবং সত্যকে কেউ জানে না।[৫৯] কবীরের গানের উদার মানবতাবাদের প্রভাবের ফলে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-প্রথার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ও অনাস্থা প্রকট হয়ে উঠে। কবীরের এক দোহায় আমরা পাই :

> মা কো কহাঁ ঢুঁড়ো বন্দে, ম্যয় তো তেরে পাসমে।
> না ম্যয় দেবল না ম্যয় মসজিদ, না করে কৈলাস মে ॥

অর্থাৎ স্রষ্টা বলছেন, আমাকে বাইরে বৃথা খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? হে ভক্ত, আমি তোমার পাশেই রয়েছি। আমি না থাকি মসজিদে না থাকি দেবালয়ে, কৈলাসে আমার স্থান নয়, কিংবা কাবা ঘরেও আমি নই।[৬০]

বাঙলায় সুফিবাদের বিস্তার

বাংলাদেশে সুফিবাদের সূচনাকাল একাদশ শতক। শাহ সুলতান রুমি (আগমন ১০৫৩ খ্রি.) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সফিবাদ নিয়ে আসেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন, সমগ্র ভারত উপমহাদেশে প্রথম সুফি মরমিয়া বাণী বাহক ইনি।[৬১] বাংলাদেশে যাঁরা আগমন করেন, যেমন বাবা আদম শহীদ, শাহ সুলতান মাহিসওয়ার, মখদুম শাহদৌল্লা শহীদ, বায়োজিদ বোস্তামি, শেখ ফরিদ, শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজি, শাহ জালাল, শেখ শরফুদ্দীন প্রমুখ বিশেষ স্মরণীয়।

ইসলাম অধ্যুষিত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময় শত শত সুফি-দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করেন।[৬২] তাঁরা নানা তরিকার অনুসারী ছিলেন। বিশেষত বাংলাদেশে আগমনকারী সুফিরা চিশতিয়া ও সোহরাবর্দীয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বহিঃদেশ থেকে আমদানিকৃত মতবাদ হলেও বাংলাদেশ সুফিবাদ বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়। কালক্রমে সুফিবাদ সমগ্র বাংলাদেশে এমনকি গ্রামীণ জনপদেও বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের বহুস্থানে সুফিদের খানকাহ-দরগা নির্মিত হয়। কোথাও কোথাও আজও যার নজির বিদ্যমান। গোড়াতেই বাঙলার মাটি ও মানুষের এবং প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের সুবাদে সুফিবাদ একটি নতুন চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এর প্রধান কারণ ছিল, হাজার বছর ধরে আচরিত বাঙলার লোকধর্ম, বৌদ্ধ উর্বর সমাজমন, বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম যা ছিল পূর্বকৃত-তার সংশ্লেষণ। যার ফলে বাঙলার মাটিতে নতুন চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের মরমি চেতনার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

তের শতকের গোড়া থেকেই চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দী তরিকাভুক্ত সুফিদের মাধ্যমে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত বাঙলায় তার প্রচারাভিযান জোরদার করে। এ দেশে ঐ সময় শঙ্কর পরবর্তী বাচস্পতি মিশ্র (নবম শতক), মধুসূদন, স্বরসতী (একাদশ শতক), শ্রীহর্ষ (বার শতক), মাধবাচার্য (চৌদ্দ শতক) প্রমুখ

দার্শনিক অদ্বৈত দর্শন প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। এ ছাড়া চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব দর্শন, বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ, তন্ত্রসাধনা এবং যোগদর্শনসম্মত দেহতত্ত্ব সাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সুফিবাদ বাঙলায় প্রবেশের পর থেকে সহজিয়া সাধন পন্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাঙলার সংস্কার, লোকাচার, বিশ্বাস ইত্যাদির সাথেও সুফিবাদের সম্মিলন ঘটে।

বাঙলার সুফিবাদ ছিল উত্তর ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার সুফিবাদের বিস্তৃতি। ফলে এখানকার সুফিরা ঐ সমস্ত উৎস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কিন্তু কালক্রমে ঐ সুফিবাদ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলাদেশের সুফিরা হিন্দুর যোগ-ভক্তি, বৈষ্ণব সহজিয়া, বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৌদ্ধ মরমি চিন্তাধারার আরো অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসে। প্রাচীন ও সমকালে আচরিত চিন্ত াদর্শ যার উপর তান্ত্রিক যোগী এবং বৌদ্ধ সহজিয়া বা নাথপন্থিরা বহু শতক ধরে নির্ভর করেছিল। এভাবে ইসলামি অতিন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে স্থানীয় রাজকীয় ধারণা ও কামনার সংশ্লেষ হয়ে দাঁড়ায় অনিবার্য। অমৃতকুণ্ড নামে নাথ মতাদর্শের অনুসারীদের সেখানে ব্যবহৃত সংস্কৃতি ভাষায় লেখা একটি তান্ত্রিক ধর্ম পুস্তক তের শতকের প্রথম দিকেই অতিন্দ্রিয়বাদীদের মনকে আকর্ষণ করেছিল। সে সময় আলি মর্দান খলজির রাজত্বকালে লক্ষণাবতির ইমাম ও প্রধান কাজি রুকনউদ্দীন সমরকন্দি বইটি আদিতে ভোজর ব্রাহ্মণ (ব্রজব্রহ্ম) নামে পরিচিত কামরূপের একজন ধর্মান্তরিত যোগীর সাহায্যে আরবিতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বইটি বহুবার আরবি ও ফারসিতে অনূদিত হয়। মধ্যযুগে বার বার বইটি আরবি-ফারসিতে অনুবাদ মুসলিম মানসে এর উপযোগিতার ইঙ্গিত বহন করে। বাঙলা ভাষায় এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি হচ্ছে শেখ জাহিদ প্রণীত আদ্য পরিচয়, সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান দীপ ও জ্ঞান চৌতিশা, সৈয়দ মতুর্জার যোগকলন্দর এবং আলি রজার জ্ঞান সাগর। তাদের সময়কাল ছিল পনের শতক থেকে আঠার শতক পর্যন্ত বিস্তৃত।[৬৩]

অমৃতকুণ্ড নামক যোগতন্ত্রের বইয়ের অনুবাদ কৃচ্ছ্রপরায়ণ হিন্দু ও বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে সুফিদের সান্নিধ্যে আনে এবং সুফিরা তাদের আধ্যাত্মিক চিন্তার সাথে পরিচিত হন। তারা হিন্দুর যোগ নিয়মের প্রশংসা করেন এবং এটা অনুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট হন।[৬৪] ফলে বাঙলার সুফিরা উত্তর ভারতীয় সুফিদের তুলনায় অধিকতর উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। যতই সময় অতিবাহিত হতে থাকে ততই তাদের কেউ কেউ ধর্মীয় প্রশ্নের মীমাংসায় এতো বেশি উদারতার পরিচয় দেন যে তাদের নিকট মুসলমান সুফি ও হিন্দু কৃচ্ছ্রসাধকের মধ্যকার প্রকৃত পার্থক্য কার্যত বিলনি হয়ে যায় এবং 'বাউল' নামে এক সর্বজনীন মানব-প্রেমসিক্ত উদারনৈতিক জীবনবাদী মতবাদের (সম্প্রদায়ের) উদ্ভবের মধ্য দিয়ে এদেশের প্রাণের, এদেশের মাটির, এদেশের জল-হাওয়ার এক নির্যাসিত রূপ স্ফুটিত হয়-যা একান্তভাবে বাঙলার ও বাঙালির নিজস্ব সম্পদ, যার উপমা বিশ্বচরাচরে নজির

বিহীন। এই বাউলদেরই সৃষ্ট সোনালি ফসল বাউল সাহিত্য। যা বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ শাখা; গভীর সংবেদনশীলতা ও মানবতাবাদেসিক্ত এর মর্মবাণী।

দক্ষিণ ভারতে যে সমন্বয়বাদী আন্দোলন শুরু হয় তা উত্তর ভারতে প্রসারিত হয়। পনের শতকের প্রারম্ভকাল থেকে মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাব ও বাঙলার ধর্মবেত্তাগণ প্রাচীন ধর্মব্যবস্থার কিছু কিছু উপাদান বর্জন করে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মবিশ্বাসকে সমীপবর্তী করার চেষ্টা করেন। একই সময় মুসলিম সুফি-সাধক, লেখক ও কবিগণের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম আচর ও তত্ত্বসমূহের সমন্বয়ের প্রবণতা দেখা দেয়। এই সময় উত্তরে হিন্দি, পশ্চিমে মারাঠি, পূর্বে বাঙলা সাহিত্যের ভাষারূপে উৎকর্ষ লাভ করে। এরই পথ ধরে রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত ও পঠিত হতে থাকে।

চর্যাপদের পর বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীকৃকীর্তন চৌদ্দ শতকের রচনা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের মহাভারত, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, শাহ মুহম্মদ সাগরের ইউসুফ জোলেখা, দৌলত উজির বাহরাম খানের লাইলী মজনু বাঙলার মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য রস জুগিয়েছিল। বাঙলার মুসলমান শাসকগণ সংস্কৃত থেকে রামায়ণ, মহাভারত বাঙলায় অনুবাদ করার জন্য পণ্ডিত নিয়োগ করেন। হোসেন শাহে পৃষ্ঠপোষকতায় ভাগবতের অনুবাদ করেন মালাধর বসু। মালাধর বসু তাঁর কাছে 'গুণরাজ খান' উপধি প্রাপ্ত হন। কবীন্দ্র অসংখ্যবার এই মুসলিম শাসকদের উদারনীতির প্রশংসা করেছেন। মুসলিম কবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির পদুমাবত বাঙলায় অনুবাদ করেন 'পদ্মাবতী' নামে।

হিন্দু ও ইসলামি ভাবধারা পরস্পরের সমীপবর্তী হওয়ায় চৌদ্দ ও পনের শতকে সমস্ত ভারতবর্ষে ভক্তিবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। আনুষ্ঠানিক হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যেকার অসহিষ্ণুতা দূর করার প্রয়াসে ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন একেশ্বরবাদের ধারণা এবং সেই সঙ্গে একথাও প্রচার করেন যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা ধর্মীয় আচারের চেয়ে শ্রেয়। যে কোনো জাতি, বর্ণ বা ধর্মবিশ্বাসের প্রতিটি মানুষের পক্ষে ভক্তি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব। এ ব্যাপারে সুফি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার পদ্ধতিও ঈশ্বরের নৈকট্যলাভের পক্ষে সুফি মতবাদ তাদের প্রভাবিত করে।

সুফিবাদী চিন্তাদর্শ : চৈতন্যের ধর্ম-দর্শন ও সমাজচিন্তা

ষোল শতকে বাঙলার ভাবজগতে আবির্ভূত হন চৈতন্য। তাঁর জীবনকালে অর্ধশতকেরও কম। চৈতন্য ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ২৯শে জুন মৃত্যুবণ করেন।[৬৫] একজন অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে চৈতন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ঈশ্বর সাধনা বাঙলার জনজীবনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চৈতন্য

হিন্দু পুরোহিতদের আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং তিনি মনে করতেন প্রেম বা ভক্তির দ্বারা জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে যে কোনো মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে।[৬৬]

চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। পিতৃপ্রদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নিমাই, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি, মহাপ্রভু প্রভৃতি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। মাতা শচীদেবী। নবদ্বীপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ শেষ করে বাড়িতে টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। অচিরেই তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী, পুরির বাসুদেব সার্বভৌম ও কাশির প্রকাশনন্দ সরস্বতীকে বিদ্যার প্রতিযোগিতায় পরাজিত করন। ২৩ বছর বয়সে পিতৃপিণ্ড দানের জন্য গয়ায় গমন করেন। সেখানে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত ঈশ্বর পুরির কাছে 'দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে' দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর চৈতন্যের মনে প্রবল ভক্তির ভাব উদয় হয়। কৃষ্ণ প্রেমে আসক্ত হয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অধ্যাপনা ত্যাগ করে নিজে নাম সংকীর্তন শুরু করেন এবং অন্যদেরও নাম সংকীর্তনে উৎসাহিত করেন। তাঁর সঙ্গে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস শ্রীবাস, পণ্ডিত মুকুন্দ দত্ত প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্ত যোগ দিলে বৈষ্ণব প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এ সময় চৈতন্যদেবের কার্যকলাপকে হিন্দু ধর্মের বিরোধী বলে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক নবদ্বীপের তৎকালীন শাসক চাঁদ কাজির নিকট অভিযোগ উত্থাপিত হয়। চাঁদকাজি বৈষ্ণবদের কীর্তন বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী চৈতন্য নামকীর্তন প্রচার আরও জোরদার করেন, ফলে কাজি তাঁর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। এ ঘটনার পর চৈতন্যের খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য সংসারের মায়া ত্যাগ করে (২৬শে জানুয়ারি ১৫১০) কাটোয়ায় গমন করেন। সেখানে কেশব ভারতি নামক একজন প্রসিদ্ধ আচার্যের কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু শিষ্যের নাম রাখেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য পুরি, দাক্ষিণাত্য এবং ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শন করেন। তিনি বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব ও গোপাল ভট্টকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁরা 'ছয় গোঁসাই' নামে পরিচিত হন। চৈতন্যের নির্দেশে 'ছয় গোঁসাই' বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ হন। চৈতন্য কাশি, প্রয়াগ, মাথুরা ও বৃন্দাবন ভ্রমণ করেন। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ায় আগমন করেন। তিনি এক বছর নিলাচলে অবস্থান করেন এবং শেষ আঠারো বছরে (১৫৩৩ পর্যন্ত) পুরিতে বসবাস করেন।

ইসলামের বিশ্বাসী সরলীকৃত রূপ ও গণতান্ত্রিক আদর্শসমূহ এদেশের হিন্দু সমাজের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে চৈতন্য এই ব্যাপারটির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেন। সমাজের এক অনিবার্য প্রয়োজনেই চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। ড. সত্যবতী গিরি বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ-গ্রন্থে লিখেছেন :

শ্রীচৈতন্যের আলোকসামান্য জীবন ও তাঁর ভক্তির একনিষ্ঠতা ও প্রাবল্য সমগ্র বাঙালি জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বাঙালি হয়ে পড়েছিলে আরও বেশী রক্ষণশীল, জাতিভেদ প্রথার প্রাচীর তুলে নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে আরও বেশী গাঢ়তর করে তুলেছিল। ধর্ম বিকৃত হয়েছিল প্রাণের স্পর্শশূন্য ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে। দেবোপসনা পরিণত হয়েছিল ভক্তিহীন আচার-পরায়ণতায়, কখনও কখনও নীরস বিশুষ্ক জ্ঞান চর্চায়। বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে সমকালীন সমাজের সেই অদ্ভুত আধারকে রূপ দিয়েছেন।[৬৭]

চৈতন্যের বাণী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সম্প্রীতি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। তিনি এগিয়ে এসেছিলেন সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার বাণী নিয়ে :

বৈষ্ণবের জাতিভেদ করিলে প্রমাদে।
বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে ॥

চৈতন্যের বাণী কেবল হিন্দুদের জন্য নয়-হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্যই। তাঁর মতে প্রেম ও ভক্তি, গীতি ও নৃত্য এসবের মাধ্যমেই সমাধি লাভ সম্ভব এবং এর ভেতর দিয়েই ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। বর্ণ ও মত নির্বিশেষে সব মানুষ এ উপাসনা অধিকারী।

হিন্দু সমাজের উপর মুসলমান চিন্তাধারার একটি বিপ্লবাত্মক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মে। ইসলামের অগ্রগতির মুখে হিন্দু-সমাজ রক্ষার জন্য তিনি সমাজ জীবন থেকে সবরকম অনাচারের মূল্যেৎপাটন ও এক উদার মতের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন এবং সমাধানের পথ অনুসন্ধানের জন্য যোগীদের আস্তানায় যান। তিনি মুসলমান পির দরবেশের আস্তানায়ও যান। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায় যে, বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে জনৈক পিরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তার সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং এই আলোচনায় তিনি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তার নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেন। এই আলোচনা থেকে এই অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত যে চৈতন্য ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও সুফিবাদ সম্পর্কে সুপরিচিত ছিলেন এবং সুফিদের সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাদেরকে সমান মর্যাদা দিয়ে 'দাস' অর্থাৎ সেবক এই উপাধি প্রদান করেন।

চৈতন্য শিক্ষা দেন 'চণ্ডাল' (নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু) চণ্ডাল নয়, যদি সে কৃষ্ণ নাম জপ করে; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় যদি সে অধর্মের পথ অনুসরণ করে।' তাঁর, শিক্ষা অনুসারে 'কৃষ্ণ ভগবান এবং সর্বোত্তম সত্য। জগত তাঁর মধ্যে এবং তিনি জগতের সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। সুফিদের প্রেমের (ঈশক) ধারণার সঙ্গে চৈতেন্যের রাধা মতবাদের সাদৃশ্য বিদ্যামান। চৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে রাধা ও কৃষ্ণ শাশ্বতভাবে এক কেবল প্রকাশের জন্য তারা দুইরূপ ধারণ করেন।

চৈতন্যের আবেগদীপ্ত প্রেম ছিল বৈষ্ণব মতের একটি নতুন বৈশিষ্ট্য। অতিন্দ্রিয়বাদী মরমি সাধক চৈতন্যের জীবনে সুফিদের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি ধর্মসভায় সংকীর্তন বা নাম কীর্তনের রীতি (ঈশ্বরের নামকীর্তন) প্রবর্তন করেন-খুব সম্ভবত মুসলমান সুফিদের জিকরের অনুসরণে। নামকীর্তনে চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া সুফিদের সামা'র প্রভাবের স্পষ্ট প্রমাণ। সামা'য় সুফিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেন এবং মহাবিষ্ট অবস্থায় নাচেন। চৈতন্য ও তাঁর অনুসারীরা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কৃষ্ণের নামকীর্তন করেন ও আবেগের আতিশয্যে নৃত্য করেন।

চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত-কৃষ্ণ সাধনার চিরন্ত ন সুখ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করা হয়। এতে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। চণ্ডালসহ যে কোনো নিম্নবর্ণের লোকদেরও চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মে শিষ্যত্ব গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়।

চৈতন্য প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করে তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের আদর্শে বৈষ্ণব ধর্মকে নবরূপ দান করেন। তাঁর মত অনুসারে ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বর লাভ সম্ভব। ঈশ্বর প্রেমময় ও করুণার আধার। প্রেমাস্পদ ও সর্বজীবে মায়া ও মমতারূপে তার প্রকাশ। ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদের ন্যায় ভালোবাসলে তাকে লাভ করা যায়। এ যেন ইসলামের সুফি ও মরমিবাদেরই আর একরূপ। চৈতন্য বর্ণাশ্রম প্রথাকে অস্বীকার করে গীতার ভক্তিবাদকে নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করে হিন্দু ধর্মের ক্ষয়িষ্ণুতাকে রোধ করে তাকে নব প্রণোদনা দান করেন।[৬৮] তাঁর উদ্ভাবিত বৈষ্ণব ধর্মে একটি সামাজিক তাৎপর্য বিদ্যমান। জাতিভেদে প্রথায় জর্জরিত হিন্দুরা ইসলামের সাম্য নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেল বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে চৈতন্য তা রোধ করতে সক্ষম হন। ধর্ম সাধনায় কীর্তন, শোভাযাত্রার প্রবর্তন এবং সর্বোপরি জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করায় বৈষ্ণব তত্ত্ব সমাজের নির্যাতিত মানুষের কাছে প্রবল আবেগ সঞ্চার করে এবং নিপীড়িত বাঙালি হিন্দু সমাজ আতিশয্যের সাথে চৈতন্যের এই ধর্ম-দর্শন গ্রহণ করেন। এমন কি বৈষ্ণব ধর্মের উদারমানবতা ও ভক্তিবাদের আতিশয্যে অনেক মুসলমানও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। মোটকথা বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও সহজিয়া মতবাদ, যোগবাদ, সুফিবাদ একাত্ম হয়ে চৈতন্য প্রবর্তিত ও প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম সর্বব্যাপী মানবতাবাদের আদর্শ হয়ে ওঠে।

বস্তুত বাংলাদেশে চৈতন্য তথা বৈষ্ণব চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম এবং ইসলামের জীবনমুখী মানবতাবাদ বাঙলার মানসভুবনে এক উদার ও সমন্বিত জীবন চেতনার জন্ম দেয়। ইসলামের সাম্যের আদর্শ প্রচলিত বর্ণাশ্রম বিভক্ত সমাজকে যেমন নাড়া দেয়, তেমনি হিন্দু সংস্কৃতির উন্মুক্ততা ও নমনীয়তা মুসলিম মানসে ভক্তি ও প্রেমের উৎসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়। দুইয়ের মিলনেই সৃষ্টি হয় উদার মানবতাবাদের আবহ।[৬৯] চণ্ডীদাস, চৈতন্য, লালন, রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্র-নজরুল এরই ধারাবাহিকতার বাতাবরণ।

তথ্যানিদের্শ

১. বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সালাহউদ্দীন আহমদ, সাহিত্য প্রকাশ, (ঢাকা : ১ম প্রকাশ, ১৯৯২) পৃ. ১১
২. ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, মূল : ড. তারাচাঁদ, অনু. করুণাময় গোস্বামী, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ৯৪
৩. বাঙলার ধর্মজীবন, মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৭। পৃ. ২৮৮। তিনি লেখেন :

পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শ বছরের মধ্যে বর্তমান বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি এক অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। ... পাল আমলকে ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতি-গঠনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। পাল আমলকে ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতি গঠনের প্রভাবকালরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাংলা লিপি এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্যের আদিরূপ অবহট্ট-চর্চাপদের উদ্ভব এবং পূর্ব-ভারতীয় শিল্পকলার উদ্ভব ও পূর্ব-ভারতীয় সমাজ গঠনের সঙ্গে সমকালীন। পৃ. ২৮৮।

৪. বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব) ড. নীহাররঞ্জন রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, মুক্তাধারা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২০২
৫. হোসেন শাহী আমলে বাংলা, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ২০০১, পৃ. ৫৭। বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে (১৪৯৪-৯৫) আমরা পাই, 'সুলতান হোসেন শাহ হচ্ছে রাজাদের তিলক চিহ্ন।... রাজা তাঁর বাহুবলে পৃথিবী শাসন করেন। তার প্রদত্ত নিরাপত্তার ফলে প্রজারা নিয়মিতভাবে সুখ ভোগ করে।'
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৭. প্রাগুক্ত। 'হোসেনের ধর্মীরীতি সংকীর্ণতা ও গোড়ামিমুক্ত ছিল বলে প্রতিয়মান হয়। সহিষ্ণুতা ও উদারতা ছিল হিন্দুদের প্রতি তাঁর মনোভাবের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ লাভ করেছিলেন। ... নবদ্বীপের কোতওয়াল ছিলেন জগাই ও মাধাই। আবার তার মন্ত্রী গোপীনাথ বসু, ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুকন্দ দাস, দেহরক্ষীদের প্রধান কেশব মাতা ছত্রী এবং টাকশাল অধ্যক্ষ অনুপ ছিলেন হিন্দু।' পৃ. ৫৭
৮. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মূল : ড. মু. আ. রহিম, অনু: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃ. ২০০। উদ্ধৃতি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯) ছিলেন বাঙ্গালি কবিদের সবচেয়ে উদার পৃষ্ঠপোষক ও বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে খুবই উৎসাহী। ... হোসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লঙ্কর পরাগল খান তাঁর দরবারে হিন্দুধর্ম ও দর্শনে আলোচনায় অতিশয় আগ্রহ প্রদর্শন করেন। এটা তাঁকে মহাভারতের বাংলা অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করে; যাতে সাধারণ লোকেরা এ গ্রন্থের ধর্ম বুঝতে পারে। ... সুলতান হোসেন শাহের উত্তরাধিকারীগণ বাংলা সাহিত্যের কবিগণের প্রতি উদার পৃষ্ঠাপোষকতাদানের নীতি অব্যাহত রাখেন।'
৯. গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, মু. হাবিবুর রহমান, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ৫২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
১১. বাংলাদেশের সন্ধানে, মোরাশ্বের আলী, মুক্তধারা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ ১৯৯১, পৃ. ৮০
১২. এস, ওয়াজেদ আলী রচনাবলী, সম্পাদনা, সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ. ৩৩২
১৩. খোন্দকার রিয়াজুল হক, মরমী কবি পাঞ্জু শাহ : জীবন ও কাব্য, একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ. ১৭
১৪. আবদুল হালিম, মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ৮৮
১৫. সংসদ বাংলা অভিদান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ১ম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬২, পৃ. ৭৮৫
১৬. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,
১৭. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
১৮. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ১৫৯
১৯. মুহম্মদ এনামূল হক রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সম্পাদনা-মনসুর মুসা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১, পৃ. ৫৮
২০. খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
২১. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ১৮২
২২. খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
২৩. তৃপ্তি ব্রহ্ম, লোকজীবনে বাংলার মৌলিক ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা, কোলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ১৯৩
২৪. এম, এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ : মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃ. ৬৬
২৫. তৃপ্তি ব্রহ্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-৯৩
২৬. খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
২৭. এম, এ রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
২৮. আবদুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
২৯. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৩০. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৩১. এম, এ. রহিম 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৩২. তারাচাঁদ, ভারতীয় সংকৃতিতে ইসলামের প্রভাব, অনুবাদ,-করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ৪৩
৩৩. তারাচাঁদ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৩৪. আবদুল হালিম, মুসলিম দর্শন : চেতনা ও প্রবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৩৫. আবদুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৩৬. তারাচাঁদ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৩৭. এস, ওয়াজেদ আলী রচনাবলী, ভবিষ্যতের বাঙালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১
৩৮. এস, ওয়াজেদ আলী, ভবিষ্যতের বাঙালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩
৩৯. এস, ওয়াজেদ আলী রচনাবলী, ভবিষ্যতের বাঙালী, পৃ. ৩৩৪-৩৫

৪০. এস, ওয়াজেদ আলী রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭
৪১. তারাচাঁদ, ভারতীয় সংস্কৃতি ইসলামের প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৪২. ঐ, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, পৃ. ৪৪-৪৫
৪৩. তৃপ্তি ব্রহ্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
৪৪. সেলিম-আল-দীন, মধ্যযুগের বাংলা নাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ৩২৬
৪৫. খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৪৬. তৃপ্তি ব্রহ্ম, লোকজীবনে বাংলার লৌকিক ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৯, পৃ; ১৭৫
৪৭. প্রাগুক্ত, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, পৃ. ১৮৫-৮৮
৪৮. তারাচাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৪৯. ঐ, পৃ. ১০৪
৫০. ঐ, পৃ. ১১২
৫১. ঐ, পৃ. ১২২। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, পৃ. ১১৫-১২২
৫২. ঐ, পৃ. ১৪
৫৩. তৃপ্তি, ব্রহ্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৫৪. তারাচাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৫৫. ঐ, পৃ. ৬৫
৫৬. ঐ, পৃ. ৬৮
৫৭. ঐ, পৃ. ৯৯
৫৮. ঐ, পৃ. ১০১
৫৯. ঐ, পৃ. ১১২
৬০. মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, ১ম সংস্করণ, মহসীন এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ. ১৭
৬১. খোন্দকার রিয়াজুল হক, মরমী কবি পাঞ্জু শাহ, জীবন ও কাব্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২০
৬২. এম, এ, রহিম, অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৬৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, হোসেন শাহী আমলে বাংলা, অনুবাদ : মোকাদ্দেসুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১০১, পৃ. ২২
৬৪. এম এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
৬৫. সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃ. ৫৮
৬৬. তারাচাঁদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
৬৭. সত্যবতী গিরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
৬৮. সালাহউদ্দীন আহমদ, বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ৩০
৬৯. তৃপ্তি ব্রহ্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

বাউল মত ও বাউল গান

সাম্যপন্থি, মানবপ্রেমী এবং খানিকটা সংসার বিবাগী বাংলার এক সাধক-সম্প্রদায় বাউল পদবাচ্যে ভূষিত। বাঙলার হাজার বছর আচরিত লোকধর্ম, উদারনৈতিক চিন্তাদর্শ, বৌদ্ধতান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধন-ভজন, ইসলামের সুফি ও মরমিবাদসিক্ত মানবপ্রেম, বৈষ্ণব সহজিয়ার প্রেমোন্মত্ততা ও যোগতান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের মিশ্রণের এক সমন্বিত রূপ হিসেবে বাউল মত ও বাউল সাধনার উদ্ভব। বাউলরা সাম্যপন্থি এবং উদার মানবতাবাদী হিসেবে পরিচিত। বাউলদের সাধনা গুরুবাদী এবং একই সঙ্গে মানবতাবাদী। তাদের সাধনায় গুরু বা মুর্শিদের ভূমিকা গুরুত্ববহ ; গুরু ভিন্ন সাধন-ভজন বৃথা, গুরু নির্দেশিত পথেই তাদের পথ চলা।

বাউল মতবাদ সকল প্রকার ভাবাবেগ ও কূপমণ্ডূকতার উর্ধ্বে, তারা স্বচ্ছ মানবতাবাদে বিশ্বাসী বস্তুবাদী জীবন দর্শনের অধিকারী। কোনো প্রকার কুসংস্কার ও সম্প্রদায়গত অন্ধত্ব বাউলকে স্পর্শ করতে পারে না। বাউল মত সম্পূর্ণত লোকজীবন থেকে উৎসারিত। জীবন্ত মানুষের সেবা অর্থাৎ 'মানুষ তত্ত্ব' বাউলদের সাধন-ভজনের প্রধান লক্ষ্য। শাস্ত্র, জাতিভেদ, ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, বাউল অগ্রাহ্য করে ; বাউল মাটির পৃথিবীতেই ব্রহ্মাণ্ডের সাধন করে 'ভাণ্ডে করে ব্রহ্মাণ্ডের সাধন'। বাউল সাধনায় নারী গুরুত্বপূর্ণ ও পূজার্হা। ফলে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ অসার হয়ে পড়ে এবং তাদের চিন্তাদর্শে প্রস্ফুটিত হয় হিংসা-দ্বেষমুক্ত সমন্বিত সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা।

বাউল মত বাঙলার লোকধর্মের বিশেষ এক সাধন-পদ্ধতি। বাঙলার হাজার বছরের সমাজ-সমীক্ষা, সমন্বিত চিন্তাদর্শের এক লোকায়ত দর্শন। লোকজীবন থেকে উৎসারিত মানবহিতৈষণার সৌধমালা বাউল সাধনার ভিত। বাউল সাধনা মানবতাবাদী সাধনা। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এক শ্রেণীর মানুষ এ সাধনাকে জীবন ও জগতের উপায় বলে ভেবেছেন। প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান পরিহার করে একটি

স্বতন্ত্র মতাদর্শের মাধ্যমে পরম সত্যকে খুঁজে পাওয়াই তাদের সাধনার লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদের আছে সাধন পদ্ধতি ; আছে শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকর্ম ; আছে তত্ত্ব ও দর্শন। জগত ও জীবন সম্পর্কে বাউলদের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এই ক্রিয়াকর্ম, সাধন-ভজন এবং তত্ত্ব জিজ্ঞাসা তারা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। বাউলরা মনে করে মানব দেহের গঠন ও তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কর্মযজ্ঞ সংগঠন হয় ; সুতরাং শরীরের গঠন প্রকৃতি, তার জৈবিক কর্মযজ্ঞ তার সাধন-ভজনের লক্ষ্য। এ জন্যই বাউল সাধনাকে দেহতত্ত্বমূলক সাধনাও বলা হয়। বাউলের দেহতাত্ত্বিক সাধনার মধ্যে মিথুনক্রিয়া ও যোগসাধনার প্রভাব আছে। বাউল মতাদর্শের প্রধান কথা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা। তারা তাদের সাধন-ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কামকে সংযত করে। সন্দেহ নেই বিষয়টি দেহ-মনের এক ধরনের পীড়নের মধ্য দিয়েই সম্ভবপর। সুতরাং এ সুকঠিন সাধন সাধনার জন্য গুরু (নির্দেশক) অপরিহার্য।

বাঙলার লোকগীতির অন্যতম ধারা হচ্ছে বাউল সঙ্গীত। এ সঙ্গীত বিশেষ একটি মতপদ্ধতি ও জীবন দর্শনের প্রণালী বিশেষ। বাংলার জনজীবনের ও জনমনের ক্রম পরিণতির সাথে বাউল সাধনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছে। লোকসংস্কৃতির বিপুল-বিশাল ভাণ্ডারের মধ্যে লোকসাহিত্য চর্চার অনুষঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাউল গনের চর্চা শুরু হয়েছিল এবং আজও তা ক্রমপর্যায়ে চলছে।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে আমরা প্রথম বাউল শব্দটির সন্ধান পাই : 'মুকুল মাথার চুলে নাংটা যেন বাউল/রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।' 'চৈতন্য চরিতামৃতে' মাত্র চারটি পংক্তিতে পাঁচবার 'বাউল' শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। পংক্তি চারটি কাব্যিক ব্যঞ্জনাময়। বাউল মতের প্রাচীনত্বের বিষয়ের আলোচনায় পংক্তি চারটি কৌতুহলোদ্দীপক। কেননা,এই পংক্তি কয়টি যে সময়কালে রচিত ও পরিবেশিত সেই ষোল-শতকের কোনো বাউল গানের সন্ধান আজও পর্যন্ত মেলে নি। পংক্তি চারটি :

বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল,
বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

এ পদ্যাংশের মার্মিকতায় আমরা বাউলদের কর্মকাণ্ড ও চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যের একটা চালচিত্র জানতে পারি। বাউল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে গবেষক ও পণ্ডিতমণ্ডলী নানা রকমের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণভাবে বাউল অর্থে আমরা জানি উদাস ভাব, অর্থ-সম্পদের প্রতি নির্মোহভাব, ধর্মকর্ম, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ এ সবের ঊর্ধ্বে বাউল। কারো মতে বাউল শব্দটি এসেছে হিন্দি 'বাউর' শব্দ থেকে, এর অর্থ পাগল। বাউল সর্বদা আত্মমগ্ন, বহির্জগতের কোনো প্রভাব অর্থাৎ

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মীয়-সামাজিক কলহ-বিবাদ তার উপর পড়ে না। তার ভাবনা-চিন্তা নিজেকে ঘিরে ; অর্থ সম্পদের প্রতি সে সর্বদাই উদাসীন। সে হচ্ছে ভাবের পাগল। অনেকে সংস্কৃত ব্যাকুল ও বাতুল শব্দ থেকে বাউল শব্দের উদ্ভব বলে মনে করেন। বাতুল বা ব্যাকুল অর্থও পাগল। তবে 'বাউল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। নামটি বাউলদের স্বপ্রদত্ত নয়। পনেরো শতকের শেষার্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় এবং ষোল শতকের শেষার্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে 'ক্ষেপা' ও 'বাহ্যজ্ঞানহীন' অর্থে 'বাউল' শব্দের আদি প্রয়োগ পাওয়া যায়। চৈতন্যের কাছে প্রেরিত অদ্বৈতাচার্যের উপর্যুক্ত হেঁয়ালিতেও 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ আছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো বাউলকে 'ক্ষেপা' বলে। কেউ বলেন 'বাউর' (এলোমেলো, বিশৃঙ্খলা, পাগল) থেকেই 'বাউল' নামটির উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য উত্তর ভারতের 'বাউরা'-এর সঙ্গে আমাদের 'বাউল,–এ যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবু 'আকুল' থেকে 'আউল' এবং ব্যাকুল থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ বলেন–এ মতের উদ্ভব যুগে দীন-দুঃখী, উলঝুল একতারা বাজিয়েদেরকে লোকে 'বাতুল' বলে উপহাস করত। 'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' নামের উদ্ভব। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'বাউল' শব্দটি 'ধাউল' শব্দজ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'ধাউল' আরবি 'ধাউলিয়া' (ওলির বহুবচন) সম্ভূত। আবদুল হালিমের মতে 'আউল' শব্দটি 'ধাউয়াল' শব্দজ। আগমের আরবি পরিভাষা হিসেবে 'ধাউয়াল' শব্দটি গ্রহণ করে মুসলমান মাগমতাত্ত্বিকেরা 'ধাউয়াল' বা 'ধাউল' নামে পরিচিত হয়। অবশ্য 'ধাগম'–এর আরবি পরিভাষা 'ধাউয়ার'–এর 'ধাউল' রূপে বহুল প্রয়োগ বাউল গানে দেখা যায়। উপরোক্ত এ কয়টি ব্যাখ্যার কোনোটিই উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবে 'ব্যাকুল' বা 'বাতুল' থেকেই 'বাউল' নামের উদ্ভব বলে অনুমান করা যায়। আমাদের এ অনুমানের পক্ষে একটি যুক্তি এই যে, সমাজের উঁচুস্তরে বাউলেরা কোনো কালেই শ্রদ্ধা বা মর্যাদার আসন পান নি। তাই মনে হয়, ব্যাকুল (ভাবোন্মত্ত) কিংবা 'বাতুল' (অপদার্থ) অর্থে উপহাসচ্ছলে তাদের এই নামকরণ হয়েছে। আর 'ধাউয়াল' থেকে আউল শব্দের উদ্ভবের সম্ভাব্যতাও সহজে অস্বীকার করা যায় না। আবার বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নামটিও আউল চাঁদ। হয়তো আউয়ালবাদী (আগম-বাদী) বলেই তাঁর নাম আউল চাঁদ। কিংবা গোড়ার দিকে আউল চাঁদের অনুসারীরাই 'আউল' বলে পরিচিত।[১]

বাউল মত বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি সর্বোপরি বাঙলার জীবনদর্শনের সর্বগ্রাসী জননন্দিত মত। এ মত পৈত্রিক কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায় থেকে আগত নয়–এ মত ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বঙ্গ ব-দ্বীপে নির্মিয়মান বাঙলাভাষী জাতিগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের নির্জাস থেকে উদ্‌গত পরমতসহিষ্ণুতাজাত এক উদারনৈতিক মত। বাঙলার লোকধর্মের কাঙ্ক্ষণীয় প্রণোদনা থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বাউল মতের উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে। শাস্ত্রবিরোধী, সামন্ত

সমাজের শোষণ বিরোধী, অসম্মান-নিপীড়ন নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে বাউল মত সমাজে তার শক্তিশালী ভিত রচনা করেছে। তাই সে অলৌকিক ঈশ্বর, দেহব্যতিরিক্ত আত্মা, বেহেস্তাদি ও পরলোকের অপার শান্তির সম্ভাবনাকে অবজ্ঞা এবং প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে করেছে ইহবাদী-দেহবাদী।

মর্যাদার দিক থেকে বাউল মতে নারী-পুরুষ দু'জনকেই সমান মনে করা হয়। শাস্ত্রীয় সমাজে নারী যেখানে অবজ্ঞা-অবহেলা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সমুদ্রের গহীন-গহরে নিমজ্জমান ; সেখানে বাউল মত নারীকে কেবল পুরুষের পাশাপাশি সমান মর্যাদা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না–নারী যেখানে মা, সন্তান ধারণ-উৎপাদনে সক্ষম ; সুতরাং স্ত্রী স্বামীর কাছেও পূজ্য, সে মাতৃসমা-কন্যাবত আদরণীয়। শাস্ত্রীয় সমাজে নারী যেখানে বন্দিনী, বাউল মতে নারী মুক্ত, স্বাধীন ; বাউল পরিবারে কন্যা সমাদরে গৃহীত ; গান শেখানো, লেখাপড়া শেখানো এমন কি পুরুষের পাশাপাশি কাজ বা চাকরি করার বিষয়টি স্বতঃস্বীকৃত। সুতরাং সমাজ চিন্তার দিক থেকে বাউল মত প্রাগ্রসর ও ইতিবাচক।

আর্থ–সামাজিকভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন-নাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শোষিত-বঞ্চিতদের মানসকামনায় লোকধর্মের মোড়কে বাঙলায় বাউল মত অঙ্কুরিত হয়। লোকধর্মের মর্মকথা হচ্ছে মানবহিতৈষণা, সব মানুষের মঙ্গল বাঞ্ছা, মানুষের স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা, তার বাঁচার অধিকার–সে চোর হোক, ডাকাত হোক, সে নারী-হোক, পুরুষ-হোক, সে রাজা-হোক, প্রজা হোক, মানুষ হিসেবে সকলেরই সমান অধিকার। লোকধর্মের এই সর্ববাদী মানবপ্রেমের আচ্ছাদনটি পরিধান করে বাঙলার বাউল মতের প্রসারণ ঘটে। অর্থাৎ বাউল মত এমন এক জীবন দর্শন যা সর্বদাই মানবসমাজের জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যার সৃষ্টিই মানবহিতৈষণা থেকে, সমাজের প্রতি যার ইতিবাচকতাই মুখ্য, যার জন্ম লোকধর্মের সূতিকাঘরে। বাউল মত পৈত্রিক নয়, শাস্ত্রীয় নয়, ব্যক্তি তা অর্জন করেন সমাজ থেকে, সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। এই যে আমি বা আপনি আমাদের সবার মানসভুবনেই বাউল উপাদান বিদ্যমান, ব্যক্তিস্বার্থপরতা যখন আমাদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠে তখন বাউল দর্শন তার ইতিবাচকতা হারায় এবং সমাজে মাথাচাড়া দেয় অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা। বাউল গণতান্ত্রিক, সে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতি, তার কাছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ স্বাধীন, মুক্ত।

উনশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাউল শব্দের ব্যবহারে অর্থগত নিদৃষ্টতা দেখা দিলেও এ শব্দকে নানাজনে নানা অর্থে বিশ্লেষণ করেন। এস. এম. লুৎফর রহমান শব্দটির ব্যুৎপত্তির উৎস বিশ্লেষণ করে বাউল যে একটি সম্প্রদায় বিশেষ শব্দ তা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে দু'বার 'বাউল' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম অঙ্কে শ্রীদাম ও মধুমঙ্গলের কথোপকথনকালে, মধুমঙ্গলের রহস্যময় উক্তির জন্য শ্রীদাম বলছে–'বাউল কিত্তি নিরগ্গলং পলবসি ॥' অর্থাৎ ওরে বাউল, কেন অনর্গল প্রলাপ

ব'কছিস? দ্বিতীয় অঙ্কে নান্দীমুখী ও মুখরার মধ্যে কথোপকথনকালে, মুখরাকে রাধার অবস্থা জিজ্ঞেস করতে নান্দীমুখী বলছে–'কোরসং চেটঠই রাহী?' রাধা কিরূপ চেষ্টা করছে? জবাবে মুখরার উক্তি–'বাউল বিঅ কিম্পি পলবই?'– বাউলের ন্যায় প্রলাপ বকছে। অর্থাৎ বাউলের ন্যায় রহস্যময় কথা বলছে। উভয় স্থানেই 'বাউল' শব্দটি সম্প্রদায় বাচক।'[২]

রহমান বাজির, বাজ্জিল, বাজ্জল শব্দসমূহকে বাউল শব্দের আদিরূপ বলে মনে করেন। তিনি দেখান যে, বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধকের ব্যবহৃত, 'ব্রজী' শব্দ থেকে সম্প্রদায়বাচক বাউল শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। তাঁর ব্যাখ্যা :

বজ্রযানী বৌদ্ধরা 'বজ্র সত্ত্বে'র উপাসক ছিলেন। বজ্রসত্ত্বের অপর নাম 'হেরুক'। তিনি ভগবান। তাঁকে পরম আনন্দ স্বরূপেও বজ্রযানী বৌদ্ধরা কল্পনা করেছেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ মহাযোগিনী তন্ত্ররাজ-এর প্রথম পটলে বলা হয়েছে :

ইত্যাহ ভগবান বজ্রী মহাবীরেশ্বর তথাগতঃ।
সর্ব্ববীর সমাযোগাৎ বজ্রসত্ত্ব পরং সুখং॥

পরম সুখ স্বরূপ এই 'বজ্রসত্ত্ব' 'ভগবান বজ্রী'র উপাসকগণ ইবজ-ধর। 'বজ্রসত্ত্বই বজ্রধরদের পরম গুরু। তিনি এ দেহেই অধিষ্ঠিত। তাই কৃষ্ণাচার্য বলেছেন :

স বজ্র গু [রু] কা [অ] বাঅ মণ মিলিঅ বিফুলই
তহি সো দূরে।
সো এহু ভঙ্গে মহাসুহ নিব্বাণ এথুরে॥

'মহাসুখ' রূপে বজ্রগুরু' শরীরে 'বীজ' স্বরূপা। তাঁকে দেহে রক্ষা করাই সাধনা। যে মানব দেহস্থ ভগবান বজ্রী বা উক্ত বজ্রসত্ত্বের সাধনা করেন– তিনি-ই সিদ্ধিলাভ করলে বজ্রধর নাথ পদবাচ্য। আর যাঁরা এ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন– তাঁরাই বজ্জিল, বাজির, বাজিল, বাজুল বা একালের পরিভাষায় 'বাউল'। অতএব, বজ্রসত্ত্বে উপাসক 'বজ্রী' শব্দ থেকে সম্প্রদায়বাচক 'বাউল' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা যায়। ব্যুৎপত্তিটি এরূপ–

v-বজ্ (গমন করা) + এ =ব্রজ >
সম্প্রদায়বাচক সংস্কৃত বজ্রী
অপভ্রংশ বজ্জির > বাজির +
বজ্জিল > বাজিল > বাজুল > বাউল।[৩]

আহমদ শরীফ বলেন, 'সম্প্রতি অধ্যাপক এস. এম. লুৎফর রহমান তাঁর 'বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা' নামের প্রবন্ধে 'বাউল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নতুন তথ্য দান করেছেন। তিনি অবহট্ট রচনায় ও চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত বাজিল, বাজুল, বাজির, বাজ্জিল শব্দগুলোকে বাউল শব্দের পূর্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বজ্রী > বজ্জির > বাজির > বজ্জিল > বাজিল > বাজুল > বাউল। অবশ্য বজ্রযানী বৌদ্ধ যদি 'বজ্রকুল' নামে অভিহিত বলে অনুমান করা সম্ভব হয়,

তাহলে বজ্রকুল থেকে 'বাউল' হওয়া আরো সহজ। যেমন বজ্রকুল > বজ্জউল > বাজুল > বাউল। যাহোক, বাউল যে বজ্রযানী নির্দেশক, সে-সম্পর্কে আমাদেরকে নিঃসংশয় করার গৌরব অধ্যাপক লুৎফর রহমানের প্রাপ্য।'

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের সময়কাল (৯ম-১০ম শতক) থেকে বাউল শব্দের ব্যবহার চিহ্নিত করা যায়। নাথপন্থায় বাউলের উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবযুগে শব্দটির ভিন্নার্থক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আদি বাঙলায় শব্দটির রূপ ভিন্ন হলেও প্রকৃত অর্থে বাউল বলতে ভাবের উন্মাদ বা বিবশ ব্যক্তিকেই বোঝায়।

বাউল একটা সম্প্রদায় বা শ্রেণীর মানুষ। একটি সম্প্রদায়কে নির্দেশ করতেই বাউল শব্দের ব্যবহার। আনুমানিক প্রায় এক হাজার বছর থেকে একটি শ্রেণীকে বা ধর্ম-সম্প্রদায়কে বোঝাবার জন্যই 'বাউল' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। এদেরকে একটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা যায় কোন্ ভিত্তিতে সে প্রসঙ্গে বলা যায়, এরা কোনো বিশেষ ধর্মকে আদর্শ বলে মনে করে না। এরা সর্বদা আপনভাবে বিভোর হয়ে থাকে, দেব-দেবি পূজা, আচার, আল্লা, মসজিদ কোনো কিছুই এরা মানে না, এরা নিজেদেরকে এসবের ঊর্ধ্বে বলে মনে করে। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, সাধারণ সমাজবদ্ধ মানুষের থেকে কিঞ্চিত পৃথক।

বাউল মতের উদ্ভব সম্পর্কে আহমদ শরীফ বলেন : বাউলদের জনশ্রুতিজাত ধারণা, স্বয়ং চৈতন্যের একটি গুহ্য সাধন প্রণালি ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক। রূপ, সনাতন, নিত্যানন্দ, জীব প্রমুখ বৈষ্ণব সাধকগণের পরকীয়া সঙ্গিনী ছিল। চৈতন্য স্বয়ং মুসলমান আউল চাঁদরূপে পুনরাবির্ভূত হয়ে এই সাধন প্রণালি সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। আউল চাঁদের পুত্র রাম শরণ, তাঁর পুত্র দুলাল চাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে লোকশ্রুতি আছে। সম্ভবত আউল চাঁদের শিষ্য মাধব বিবি এবং মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র এই সাধন তত্ত্ব জনপ্রিয় করেন। আউল চাঁদ 'ফকির ঠাকুর' নামে খ্যাত এবং কর্তাভজা মতের আদি গুরু বলে পরিচিত। বাউলদের লিখিত শাস্ত্র, ইতিহাস বা দর্শন নেই। এ জন্যই পরোক্ষ তথ্যের আলোকে অনেকটা অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

আসলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া রসিক বৈষ্ণব। প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকে সাধনা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই হয়তো শুরু হয়েছিল, কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালেই এ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য প্রসার ঘটে। তারই একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আউল চাঁদ। আর অপর শাখার প্রবর্তক ছিলেন মাধব বিবি। এই শাখার বিস্তৃতি ঘটে সম্ভবত বীরভদ্রের চেষ্টায়। এটিরই লোকপ্রচলিত নাম 'বাউল' সম্প্রদায়। যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল আর যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দু-সমাজভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে।

'বাউল' শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ সন্দেহ নেই। সমাজ বন্ধনমুক্ত নির্মোহ এবং উদাস প্রকৃতির অর্থগম্য নানামাত্রিক শব্দের বিবর্তনের ফলে বাউল শব্দটির উৎপত্তি ঘটাই স্বাভাবিক। বাউলরা গৃহী নয়, তারা অর্থ সম্পদের প্রতি লালসাহীন, তারা সন্তান উৎপাদন করে না– তারা গান গায়, গানের মধ্যে তাদের সাধন-ভজনের নীতি ও বিধানাবলী ব্যক্ত করে। তারা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি জাতপাত ও ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে। হিন্দু-মুসলিম যে সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, বাউল ধর্মে দীক্ষিত হবার পর তারা জাতপাতের কথা সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলে।

বাঙলার লৌকিক চিন্তাদর্শের জীবনবেদ বাউল সাধনা। হাজার বছরের জীবনাচার ও মানবীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ী চিন্তার মর্মবাণী নিয়ে বাউল মতের উদ্ভব ও বিকাশ। এই মত পদ্ধতির বীজ পোতা হয় ভারত বর্ষের স্বীয় মাটিতে উদ্ভাবিত যোগতন্ত্রে, এর অঙ্কুরোদগম ঘটে বৌদ্ধ সহজিয়ার মানবীয় উর্বরতায় এবং এর বাল্য-কৈশোর-যৌবনত্ব–পৌঢ়ত্ব অতিবাহিত হয় বাঙলার বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফি-মরমিবাদের আবহে। উদারনৈতিক মানবতা ও বিশ্ব মানবমৈত্রীর অনুষঙ্গটি বাঙলার একান্ত নিজস্ব যা মানবপ্রেমিক নজরুল চণ্ডীদাস থেকে শ্রীচৈতন্য হয়ে লালন-রবীন্দ্রনাথে পরিপূর্তি ঘটে। আরো কতিপয় বাঙালি মনীষার মধ্যে এখানে উল্লেখ করতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের নাম। বিশ্বমানবতাবাদের আকাশে এঁরা এক একটি আলোকবর্তিকা ; নক্ষত্রমণ্ডলীর এক এক সদস্য এবং নক্ষত্র হচ্ছে 'রবি-বাউল', রবীন্দ্রনাথ। এ যেন মানবমণ্ডলীর এক সৌরজগত। বাউল সাধকদের সমস্ত আলোর বিচ্ছুরণ পড়েছে গিয়ে রবি বাউলের মস্তিষ্কে– তাঁর অন্তরের সান্নিধ্য পেয়ে বিকিরণ দিচ্ছে সমগ্র মানব-সমাজে, যেমন রবির কিরণে পৃথিবী জীবন্ত, তেমনি রবীন্দ্র কিরণে আজ মানব সমাজ আলোকিত। বস্তুত, বাঙালি সমাজে তথা বিশ্ব সমাজে মানবতাবাদী চেতনা স্ফুরণের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস-লালন-রবীন্দ্রনাথ, নজরুল একই সাজুয্যে গ্রথিত।

বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাউল মত। জৈন-বৌদ্ধ, হিন্দু মুসলমানের মিলনে হয়েছে বাউল সম্প্রদায়, তাই পরমতসহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, সহনশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনের ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এদের বৈশিষ্ট্য।

নানাবরণ গভীরে ভাই একই ররণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম, একই মায়ের পূত।

মানুষ নির্বিশেষে এমন উদার দৃষ্টিতে দেখা যে জীবন বোধের দ্বারা সম্ভব, তার উৎস যে-ধর্মমত বা মরমিয়াবাদ তা কখনো তুচ্ছ হতে পারে না। বাউল ধর্মে বৈরাগ্য নেই। বাউল মত বাঙলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম, একান্তভাবেই বাঙালির মানস ফসল। সমাজের উপরতলার লোকের ধর্ম হলে এই মতবাদ যে কেবল

বাঙালির জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত তা নয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে উদার মানবিকতায় জন্যে বাঙালিকে শ্রদ্ধেয় করে তুলত।

বাউল মত ও বাউল গানের উদ্ভবকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এর ঐতিহ্য এক হাজার বছর হলেও ১৬২৫-৭৫ সালকে মোটামুটি বাউল ধর্মের উদ্ভবকাল ধরা হয়েছে ; যদিও এ সময় কালের কোনো বাউল গানের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় নি। এমন কি উনিশ শতকের পূর্বের কোনো প্রামাণ্য বাউল গানও সংগ্রহ হয় নি। বাউল গবেষণার পথিকৃৎ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন, '১৬৫০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিনশত বছর বাউল গানের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতির শেষ অবস্থাকাল'। আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন 'উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ'।[৪] আবুল আহসান চৌধুরী বলেন, 'লালন তাঁর অতুলনীয় সঙ্গীত-প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে বাউল গানের একটি স্বতন্ত্র ঘরানা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে বাউল গানের মহত্তম জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাউলের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিতে লালনের গান প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত। লালনকে তাই বাউল সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হিসেবে চিহ্নিত করা চলে'।[৫]

বাউল মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতবর্ষ তথা বাঙলার হাজার বছরের সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তন ও বিচিত্রতর ধর্ম-দর্শন ও মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমন্বিত রূপ হিসেবে। মানবতার আকুতি নিয়ে সংগঠিত হয়েছে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), অর্থ-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশের সূত্রে সংগঠিত হয়েছে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব ; বাঙলায় সংগঠিত হয়েছে মানবতারই আর এক আকুতি নিয়ে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন (ষোল শতক) এবং উনিশ শতকে বাঙলার নবজাগরণের সূচনা হয়েছে ; এই ঐতিহাসিক কাল-পর্বে বাউল ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশ। আমরা জানি বাউল মতবাদের একটা আদর্শিক ভিত্তি মানবতাবাদ।

এস. এম. লুৎফর রহমান বলেন, 'বাউল মতবাদ ভরতীয় উপমহাদেশের বিশেষত পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত মতবাদের সঙ্গে তন্ত্র, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, সাংখ্য, যোগ, বৈষ্ণব সহজিয়া মত এবং সুফিবাদী ধ্যান-ধারণায় সংমিশ্রণে বিকশিত। এ জন্য একে কোনো নতুন ধর্ম না বলে নতুন মতবাদ রূপে চিহ্নিত করাই সংগত। বাউল মতবাদের আদি উদ্ভব বাঙলার বৌদ্ধ জনসমাজ'।[৬] বাউল মতের মার্মিকতাকে অনুধাবন করতে গিয়ে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন :

> কোনো অনুমানাত্মক কিছুকে তারা মানে না, তাদের মতে শাস্ত্র পুরাণ দেব মূর্তি মন্ত্র তীর্থ উপবাস এ সব আসলে অনুমান, এই ইহজগৎ আর কামনা-বাসনা, স্বপ্ন ও মুক্তি পিপাসা রয়েছে এর পরতে পরতে– রহস্য ও মরমিয়া বিশ্ব। খোদা বা ঈশ্বর আছেন মানব জীবনের শরিক হয়ে, তাই মানুষ ধরে সাধনা করতে হবে। তাঁদের গানে বলা হচ্ছে :

মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ রতন ধন।
কর সেই মানুষের অন্বেষণ॥

এই মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয়ে যায় মনের মধ্যে :সে কেন অন্য তত্ত্ব মানবে? সে কেন ব্যস্ত হবে সাবেক স্বর্গ-নরক ধারণায়। তাই তার প্রতিপন্ন :

আল্লার বাড়ি যদি মাটির দুনিয়া হয়
তবে মানুষ মরে কোন্ বেহেস্তে যায়?

বেহেস্ত বা স্বর্গ প্রাপ্তি যদি কাঙ্ক্ষণীয় না হয় তবে এসব লৌকিক সাধকদের লক্ষ্য মানুষের মুক্তি। সে মুক্তি মানে মোক্ষম প্রাপ্তি নয়–অজ্ঞানতা, কুসংস্কার থেকে মুক্তি। মাটির ঢিবি ও কাঠের মূর্তি পূজা, অপদেবতা বা উপদেবতায় বিশ্বাস, দর্গাতলায় হত্যে দেওয়া বা কবচতাবিজ ধারণ এ সবেরই বিরুদ্ধাচারণ করা এদের ব্রত। বিচারশীল আর তর্কপ্রবণ বাউল ফকিররা বহুলাংশেই গুরুবাদী কারণ গুরুই কায়া সাধনার পথ ও পদ্ধতি বাতলে দেন।[৭]

বাউলেরা রাগপন্থি। কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগসাধনাই বাউল পদ্ধতি। ইন্দ্রিয়-নিরোধ, বিষয় ত্যাগ, কিংবা বৈরাগ্য এদের লক্ষ্য নয়। তবু প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাবে মুনি, আজীবিক, ভিক্ষু, সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব-বৈরাগী প্রভৃতির মতো বাউলে ভিক্ষাজীবী বৈরাগী আছে। সে হিসেবে বাউল দু'প্রকার : গৃহী ও বৈরাগী। বর্তমানে এরা বহু উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। হযরতি, গোবরাই, পাগলনাথী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেব ধনী, জিকির, ফকির, বাউল, আউল, কর্তাভজা, সাঁই, ন্যাড়া, বলরামী, শম্ভুচাঁদী, রামবল্লভী প্রভৃতি নাম থেকে তাদের সম্প্রদায়ের প্রবর্তকের নাম ও সাধন-পন্থার আভাস পাওয়া যায়। এদের সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার ও ধর্মদর্শনের কোনো লিখিত ইতিহাস বা শাস্ত্র গ্রন্থ নেই। তাই এসব মতের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির খবর পাওয়া দুস্কর।

বাউল সাধনার মর্মকথা বাউল কবির ভাষায় এরূপ :

সখি গো, জন্মমৃত্যু যাঁহার নাই
তাহার সঙ্গে প্রেম গো চাই।
এবং
উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।

বাউল কবিদের মধ্যে লালন শাহ, শেখ মদন, গঙ্গারাম, পাগলা কানাই, পাণ্ডুশাহ, পদ্মলোচন (পোদো), যাদুবিন্দু, দুদ্দু শাহ, পাঁচু, চণ্ডীগোঁসাই, রশীদ,

হাউড়ে গোঁসাই, গোপাল গোঁসাই, চণ্ডীদাস গোঁসাই, ফুলবাসুদ্দীন, ঈশান, বাখের শাহ্, এরফান শাহ্, সৈয়দ শাহনুর, মিয়াধন, শীতলং শাহ্, আতর চাঁদ, তিনু, শ্রীনাথ, শেখ কিনু, কাঙাল হরিনাথ, রাধারমণ দত্ত, হাসন রাজা, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ জনপ্রিয়।

বাউলদের মত পদ্ধতির নিশানা জানার জন্য লিখিত কোনো সংবিধান নাই, কোনো পুথি-পুস্তক বা দলিল-দস্তাবেজ নাই। এদের আচারগত তত্ত্বীয় বক্তব্য প্রকাশিত হয় তাদেরই রচিত গানে। বাউল এক প্রকার লৌকিক সাধনা ; নানা মত ও পথের সংমিশ্রণে এই গূঢ়, মরমি এবং মানবতাবাদী সাধনতত্ত্বটি গড়ে উঠেছে বাঙলার নিজস্ব লোকধর্মের নির্যাস থেকে। বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়ার সাধনতত্ত্বের সাথে বাউল সাধনার সাযুজ্য প্রবল। বাউল তত্ত্বের দেহসাধনা ও মিথুন ক্রিয়া রূপতান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনা ও বৈষ্ণব সহজিয়ার অনুরূপ। বাউলদের মতে মানবদেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক। মনের মানুষ তাদের কাছে এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা। তারা আজন্ম মনের মানুষ খুঁজে বেড়ান। তবে তারা এও জানেন যে মনের মানুষ রূপী পরম আরাধ্য ও পরম প্রিয় এই দেহেই অবস্থান করেন। বাউলদের মূলকথা হচ্ছে দেহ বা মানবদেহ প্রকৃতবস্তু। দেহের মধ্যে বাস করে দেহাতীত। তারা বলেন, 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে'। সুতরাং বাউলরা তাদের পরম প্রিয়কে, তাদের আরাধ্যকে দেহের ভেতরেই সন্ধান করেন। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> বাউলদের বিচিত্র প্রকার দেহ দর্শন আছে। নারী-দেহকেই তাঁহারা মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করেন (পাঞ্জু শাহ কর্তৃক 'মেয়ে'র গৌরব ঘোষণাত্মক পদ বা মেয়ে ভজতে পারলে, পারে যাওয়া যায়, প্রভৃতি পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের দেহতত্ত্বের মতে, স্ত্রী ধর্মের তিনটি দিনে নারী দেহে 'সহজ মানুষ' 'মনের মানুষ' বা 'অধর চাঁদে'র আবির্ভাব হয়। চতুর্থ দিনেই মনের মানুষ পালাইয়া যায়। সাধক নারীদেহ অবলম্বন করিয়া তিনদিন ধরিয়া ত্রিবেণী ধাবায় বসিয়া মনের মানুষরূপী মৎস্য শিকার করিবেন। সহজ অর্থে, স্ত্রী ধর্মের বিশেষ দিনে স্ত্রী পুরুষের বিশেষ দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সঙ্গত হইলে বাউল সাধনার সিদ্ধি নিকটতর হইবে।[৮]

মিথুনাত্মক যোগসাধনা বাউল গানে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। চারিচন্দ্র-ভেদ কিংবা মিন-ধরা এই রূপকের ভেতর দিয়ে বাউল সাধনার মূল বিষয়টি বাউল গানে বিবৃত হয়েছে। মৈথুনতত্ত্ব মূলত সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন জৈবিকতত্ত্ব। ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন ইতিহাসে এবং সেমেটিক দর্শনে (আরবি ধর্ম শাস্ত্রে) মানব-মানবী অথবা আদম-হাওয়া কাহিনীর মধ্যেও এ মৈথুনতত্ত্ব নিহিত। শুধু মানুষ নয় ; সমগ্র জীবজগত এ তত্ত্বের অধীন। সুতরাং মৈথুনতত্ত্ব মূলত সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন জৈবিক তত্ত্ব।

বাউল মতবাদে মৈথুনতত্ত্বকে সংযম সাধনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে দেখানো হয়েছে– এটা মানব সমাজের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ নয় মোটেই।[৯]

তিরাপিনির তীর ধারে
মীনরূপে সাঁই বিহার করে–

বাউলের 'অধর মানুষে'র এই হলো গুপ্ত পরিচয়। লালনের গানে এই মীনরূপ সাঁইকে ধরার প্রয়োজন ও কৌশল বর্ণিত হয়েছে :

সময় বুঝে বাঁধন বাঁধলে না
জল শুকাবে মীন পালাবে পস্তাবিরে মনকানা
মাস-অন্তে মহাযোগ হয়
নীরস হতে রস ভেসে যায়
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল্ দেখলে্ না ॥

বাউল শ্রেষ্ঠ লালন শাহ তার গানের কোথাও বাউল শব্দটির ব্যবহার করেন নি। তবে তার অন্যতম শিষ্য দুদ্দু শাহ বাউল এবং বৈষ্ণব এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করে বুঝিয়েছেন :

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই
বাউল ধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই।
বিশেষ সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব
পঞ্চতত্ত্বে করে যপ তপ
তুলসী-মালা অনুষ্ঠান সদাই।
বাউল মানুষ ভজে
সেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃতে মজে
নারী সঙ্গ তাই।

অর্থাৎ বৈষ্ণবরা মালা-তিলক-কণ্ঠিধারী, পঞ্চতত্ত্বে বিশ্বাসী। বাউলদের সাধনা হলো :

যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন
জীবনই তীর্থ ধর্ম পথ
এই কথা বাউলের মত–'দুদ্দু শাহ'।[১০]

লালন কিন্তু এ ব্যাপারে নির্বিকার। তিনি 'বাউল' 'বৈষ্ণব', 'ফকিরি' এসব কোনো কিছুর উল্লেখ করেন নি। লালন যেমন তার সম্প্রদায় বা জাত সম্পর্কে সকলকে আঁধারে রেখেছেন, তেমনি ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রেও পুরো পর্দা টেনে দিয়েছেন ; এতে এটাই প্রমাণিত যে তিনি এসব সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতার অনেক উর্ধ্বে। তিনি মানুষকে দেখেছেন অন্তর দিয়ে, মানবহিতৈষণা থেকে, তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে পৌছেছিলেন আলোকবর্তিকায়। লালনের

গান হলো যুক্তি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিবাদ সমন্বিত। তাঁর গানের মার্মিকতা, তাঁর জীবনযাপন, মানব সমাজের মহত্তম চিন্তাদর্শ, আজকের দিনের বিশ্বায়ন ও একপল্লীর ভাবনার ইতিবাচক দিক-নির্দেশনা।

বাউলদের সাধনায় গুরু বা মুর্শিদের ভূমিকা মুখ্য। বাউল বলেন : 'ভবে মানষ গুরু নিষ্ঠা যার সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার'। তাদের গুরু নির্দেশ দুইরূপে এক মানুষ রূপী গুরু, দুই স্রষ্টারূপী গুরু। তাদের তত্ত্ব হচ্ছে মানুষ গুরুর মাধ্যমে পরম গুরুর সন্ধান করা। তাঁরা বলেন :

গুরু– রূপ ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে।
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জানিত করে॥

বাউল সাধনায় ঘুরে ফিরে আসে সীমা-অসীমের সম্পর্ক। প্রেম সাধনার মধ্য দিয়ে তারা অসীমকে সীমায় বোধগম্য করতে চান। বাউলরা উদার মানবতাবাদী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। বাউল সাধনার মৌল বিষয় হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের নাগপাশে আবদ্ধ না থেকে স্রষ্টার সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ; যা সুফি সাধনারও প্রতিপাদ্য। তাদের মতে স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও নিবিড়–সে জন্য মসজিদ, মন্দিরের আনুষ্ঠানিকতা তারা পরিহার করতে প্রয়াসী। অর্থাৎ বাউল প্রচলিত ধর্মমতগুলোর বিরোধী। তারা আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা প্রথ্যাখান করেছেন। বেদ-পুরাণ, বাইবেল, কোরআন-এর তাত্ত্বিকতাকে আংশিক গ্রহণ করলেও তার আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছেন।[১১]

'বাউল' কথাটি প্রধানত উম্মাদ, ক্ষিপ্ত, প্রেমোন্মাদ অথবা ভাবোন্মাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুফি– সাধকরা প্রেমের পথে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনায় রত। ঈশ্বর প্রেমে আত্মবিস্মৃত 'ফানা' অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবই তাদের সাধনার মূল ভিত্তি। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের উপর সুফি প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। বাঙলার বাউলদের গানের মধ্যেও সুফি সাহিত্যের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট সুফি ও মরমিবাদের প্রভাবে ভারতবর্ষব্যাপী সহজ সাধনার অর্থাৎ সহজ পথের উদ্ভব ঘটেছিল এবং বহুসংখ্যক সাধুসন্তের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে বাঙলার চৈতন্য দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কর্মকাণ্ড ব্যাপক ও সুদুরপ্রসারী। বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে চৈতন্যের প্রভাব অবশ্য স্মরণীয়।[১২]

দৈহিক শুচিতা প্রত্যেক ধর্মেরই এক অন্যতম অনুষঙ্গ। অনুমান করা হয় এ বোধেরই পরিণতি ঘটেছে দেহাত্মবাদে ও দেহতত্ত্বে। যোগ, সাংখ্য, বৌদ্ধ ও সুফি সাধনতত্ত্বে দেহকে বিশেষ মূল্য দেয়া হয়েছে– দেহের আধারে যে চেতনা সেই-ই তো আত্মা ; এ নিরাকার আত্মার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা শারীরতত্ত্বে মানুষকে করেছে কৌতূহলী। এ থেকে মানুষ বুঝতে চেয়েছে–দেহ নিরপেক্ষ আত্মার অনুভূতি যখন সম্ভব নয়, তখন আত্মার রহস্য ও স্বরূপ জানতে হবে দেহযন্ত্র বিশ্লেষণ করেই। এ

ভাবেই যৌগিক প্রক্রিয়া সাধনতত্ত্বে অসামান্য গুরুত্ব পেয়েছে। তাই এ দেশে আধ্যাত্ম সাধনায় যোগ্যভ্যাস একটি আবশ্যিক আচার। বৌদ্ধযুগে এর বহুল চর্চা দেখা যায়। পাল শাসনামলে বাঙলায় বৌদ্ধ মতের একটি শাখায় বিশেষত সুফি প্রভাবে বাউল মতের প্রসার ঘটে বলেই পণ্ডিতরা মনে করেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বহুতর মিশ্রণের এক অপূর্ব সমন্বয়ে গঠিত এই বাউল মত। এতে একাধারে বৌদ্ধ ধর্ম, শৈবমত, বৈষ্ণব মত, সুফিমত প্রভৃতি নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে প্রত্যেকেরই কিছু ছাপ বাউল মতে বর্তমান। সহজিয়া বৈষ্ণবদের ধর্মের ভিত্তিমূলে রয়েছে যোগতান্ত্রিক জীবনবাদ। এই যোগতন্ত্রকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব দর্শনের বিকাশ। বাউল সাধনার মূলেও রয়েছে এই যোগতান্ত্রিক জীবনবাদ। যোগতান্ত্রিক সাধনার পথ অবলম্বন করেই বাউল মনের মানুষ খুঁজে ফেরেন। এ দুই ধারার অনুশীলিত ও অনুসৃত পথেরই যোগনদার সুফিবাদ। আর এই তিন ধারায় যোগ সাজশ বা সেতুবন্ধন তৈরি করে মরমি চিন্তাদর্শ। এদিক থেকে বৈষ্ণব দর্শন,বাউল দর্শন ও সুফিবাদের আকার বা প্রকারগত কোনো পার্থক্য নেই–এ তিনেরই মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। যে সমাজ পরিবেশ-পরিমণ্ডলে সুফিবাদের উৎপত্তি তার চেয়ে আরো বেশি মানবীয় গুণে গুণান্বিত ভারতীয় সমাজে তার বিকাশ ও বিস্তার–এ জন্যই সুফিবাদ ভারতে অনুপ্রবেশের ফলে আরো মানবীয় ও সংবেদনশীল চরিত্র অর্জন করে। আর সেজন্য বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফিবাদের প্রভাব অসামান্য।

বাউল মত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন–'আমাদের দেশের ইতিহাস প্রয়োজনের মধ্যে নয়, মানুষের অন্তরতম গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে আসছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি। এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এ মিলনে সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা হয় নি। এই মিলনে গান জেগেছে। সেই গানের ভাষা ও সুর মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাঁধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়। বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল, কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়।'

'আত্মবোধ' প্রবন্ধে তিনি চমৎকার এক অভিজ্ঞার কথা বর্ণনা করেছেন যা বাউল মত সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> কয়েক দিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কি আমায় বলতে পার?'। একজন বললে, 'বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না।' আর-একজন বললে, 'বলা যায় বই কি–কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাস করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর

লোককে, সবাইকে শোনাও না কেন?' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ? কেউ কি আসছে?' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।
...হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষায় এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশের পথ চলতে চলতে শোনা যায়–এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোন অক্ষরবোধ হয় নি সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সুরের সারিগান :

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা তাদের মত ও পথের কথা, তাদের সাধনতত্ত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছেন চর্যাসাহিত্য। চর্যাপদগুলো বাঙলা গানের আদিরূপ, বাঙলা গীতি কবিতার আদি এবং বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতির অমূল্য দলিল। বৈষ্ণব সহজিয়ারা সৃষ্টি করেছেন বাঙলা সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার বৈষ্ণব পদাবলী ও শ্রীচৈতন্যকে ঘিরে তৈরি করেছেন জীবনচরিতমূলক সাহিত্য। বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফিবাদের প্রেরণায় মধ্যযুগের কবিরা প্রণয়ন করেছে, পুথি, দোভাষী পুথি, কেতাবি সাহিত্য এবং বিপুল-বিশাল কাব্য-সাহিত্য।

প্রত্যেক ধর্মেই সমাজহিতৈষণা আছে। মানুষের উন্নতির জন্য সমাজ শৃঙ্খলার জন্য, সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য ধর্মমতগুলো প্রতিষ্ঠিত। বাউল কোনো ধর্ম নয়, বাউল একটা মত পদ্ধতি– কিন্তু সমাজহিতৈষণার উদ্দেশ্য নিয়ে এই মতের উৎপত্তি। বিভিন্ন মতপার্থক্য সত্ত্বেও একটা সমন্বয়ের রূপ বাঙালির মজ্জাগত। এই সমন্বয় চিন্তারই সর্বাত্মক প্রকাশ বাউল মত।[১৩] বাউলরা সন্ন্যাস গ্রহণ করে না। তাদের সাধন-জ্ঞান, ক্রিয়াকর্ম তাদেরকে এক ধরনের গৃহবাসী করে তোলে। জীবনের প্রতি তারা নিরাসক্ত নয়–জীবনকে তারা জানতে চায় বুঝতে চায়। তাদের গানের ভাষা খেয়ালীপূর্ণ, আলো-আঁধারিতে ঘেরা। গানের ভাষা সমাজ-সংসারের নৈমিত্তিক ঘটনা থেকে নেয়া হলেও এবং গানের উপমা, প্রতীক, রূপক আমাদের চাক্ষুষ বস্তুনিচয় থেকে গ্রহণ করা হলেও আসলে তা প্রহেলিকাময়, সঙ্কেতপূর্ণ ও ইঙ্গিতবহ। এই গানের ভাষায়ই প্রকাশিত তাদের বিধি-বিধান ও গুহ্যাতিগুহ্যতত্ত্ব।[১৪] তাদের মত হলো মুক্তি না চাওয়া। দেহের ভিতর থেকেই দেহের ভেতর যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে তার অনুসন্ধান করা। সমস্ত-ভেদ-বিভেদের ঊর্ধ্বে তারা প্রেমের সাধনায় আত্মমগ্ন। তারা নিজকে চিনতে পরামর্শ দেয়। কবি বলেন :

আপনারে আপনি চিনতে পারলে রে
যায় অচেনারে চেনা।

পংক্তিদ্বয়ের মূল বক্তব্য আত্মতত্ত্ব। সক্রেটিসের সেই নিজেকে জান (Knowledge Thyself)। যদিও ভারতীয় দর্শনে ও সুফিতত্ত্বে 'আত্মনাম সিদ্ধি' অর্থাৎ আত্মাকে জানার আহ্বান রয়েছে। কবি আরো গভীবে প্রবেশ করেছেন :

আত্মা আর পরমাত্মা
ভিন্ন-ভেদ জেনোনা।

পরমাত্মার সাথে মানুষের মিলনাকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। বৈষ্ণবীয় সহজ সাধনারও একই আকুতি। মানবাত্মারূপী রাধার সর্বদাই কামনা কৃষ্ণরূপের পরমাত্মাকে কাছে পাবার।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম গ্রন্থে বাউল গানের উদ্ধৃতি টেনে মনের মানুষ তত্ত্বের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ। ; জ্ঞানে-কর্মে ভাবে যে পরিমাণ সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই– অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাহির-বিক্ষিপ্ত আপনা-হারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম পথিক ভিখারির মুখে :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলাম :

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল :

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থণা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

বাউলরা সকল গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডূকতার উর্ধ্বে। জাতপাতের কোনো মূল্য নেই তাদের কাছে। তারা সর্বকল্যাণকামী, তারা সমগ্র মানব সমাজকে এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের কাছে মানুষই বড়, মানুষই শ্রেষ্ঠ।'সবার উপরে মানুষ সত্য'–এর মর্মবাণী বাউল তত্ত্বেরও মর্মবাণী। বাউলরা কর্মকে অস্বীকার করে নি–কিন্তু সে অস্বীকার করেছে বাসনাকে– ইচ্ছাকে। যেমন, লালন নিজে কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর জীবিকার অন্যতম উৎস ছিল আখড়ার পানের বরজ। ভিক্ষাবৃত্তিকে লালন অপছন্দ করতেন। তার বক্তব্য ছিল, উত্তম চাষ, স্বাধীন বাণিজ্য, পরাধীন চাকরি, নিদানে ভিখ, অলস নাদানের কার্য ভিক্ষা।[১৫] অনাসক্ত কর্ম-কথাই বাউলের সারকথা। এখানে গীতা উপনিষদের সঙ্গে সে অভিন্নমত। তার পথ সহজ সাধনার পথ। তার কর্ম ফলাসক্তিহীন সহজকার্য।[১৬]

বাউলের সাধনা ও সঙ্গীত কয়েক শতক ধরে বাঙালি-মানষে প্রেরণা সঞ্চার করে আসছে। এই বাউলদের নিয়ে আলোচনা-গবেষণা চলছে নানা মাত্রায়। বাউলদের মত ও পথকে জানার জন্য চেষ্টা চলছে নিরন্তর। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই খানে যে, 'বাউল' শব্দটি সাধারণত শিথিল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই 'বাউল' নামের খোলসের ভেতরে সঙ্গীতাশ্রয়ী অন্যান্য মরমি সাধন পথের অনুসারীরাও অনায়াসে ঢুকে পড়েন।[১৭] সুধীর চক্রবর্তী বাঙলার বাউলের সংজ্ঞায়ন সম্পর্কে লিখেছেন :

> আমি বোঝাতে চাইছি বাঙলার বাউল বলতে কোনো স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে ধারণা পাওয়া জটিল কাজ। তাদের স্বরূপ স্বভাব ও ক্রিয়াকরণ যেন নানা কাপড়ের টুকরোয় বানানো দরবেশী পোষাকের মতো বিচিত্র ও বর্ণিল। নানা ধারা মিলে মিশে বাউল ধারণা গড়ে উঠেছে। আজ তাকে প্রত্যক্ষ সংজ্ঞার সীমায় বাঁধা ঠিক হবে না। মধ্যপন্থী ও বিবেচক পণ্ডিতরা তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে মধ্যযুগীয় বাংলায় নানা রকম লোকায়ত ও শাস্ত্রবিরোধী ধ্যানধারণা বাউল মতের পরিবর্ধন ও প্রসাধনে সাহায্য করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থ, তন্ত্র ও সুফিবাদ মিলে মিশে এক অদৃশ্য দ্রবণে জন্মেছে বাউল ফকিরদের রূপময় জগৎ। আত্মার চেয়ে দেহ, জাতিবর্ণ দ্রোহ, মন্দির মসজিদের চেয়ে গুরুর নির্দেশ, শাস্ত্রের চেয়ে আত্মঅনুজ্ঞা– এই দেশে তো নতুন নয়। হয়ত সেই লোকায়তিক পরম্পরায় এক সমৃদ্ধ উদ্ভাস বাংলার বাউল। সাধারণভাবে ক্রিয়াকরণ, গানের অন্তর্জগৎ বা আচরণ থেকে বাউলদের সকলে চিনে নিতে পারেন। কিন্তু তারা আত্মসাবধানী, সন্ধ্যাভাষী, ইঙ্গিতবাহী। আপন মর্মকে তাঁরা ধর্মের ক্রিয়াপরতায় বোঝাতে চান না, তবে তাদের বহির্বাস খুবই ইঙ্গিতধর্মী ও সুনির্দিষ্ট।[১৮]

এ রকম মতের প্রচলন আছে যে, বৈষ্ণব মতই বিবর্তিত হয়ে বাউল মতের সৃষ্টি করেছে। আর ফকিরি মত অভিধায় যে মতের প্রচলন বাঙলায় রয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ইসলামি সমাজের চিন্তাকে। বস্তুত বৈষ্ণব, বাউল ও ফকিরি এই মতত্রৈয়ীর সাযুজ্যতা রয়েছে বহুলাংশে। এ তিন মতেরই মূল কথা মানবপ্রেম, হিংসা–দ্বেষমুক্ত, শোষণমুক্ত, গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ। বাঙলার সমাজ জীবনে একটি বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিবেচনা করেছেন অনেক পণ্ডিত। যদিও বাউল নামের অন্তরালে নানা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর গায়ক, সাধক এমন কি ভণ্ডবেশধারী নানা শ্রেণীর মানুষকে আবিস্কার করা যায়। অনেকে আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁইকে চারটি লৌকিক সম্প্রদায় বলে বিবেচনা করেন।[১৯] তবে বাউল যে একটি লৌকিক মত পদ্ধতি এবং একটি লৌকিক সম্প্রদায় এ কথার প্রমাণ আমরা নানাভাবে পেয়ে থাকি। বাঙলায় আচরিত বাউল অভিধায় খ্যাত লোকধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষ লালন। মার্ক্সবাদের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাদাতা যেম প্লেখানভ ; তেমনি লালন দর্শনের বিশ্লেষক তার যথাযোগ্য উত্তরসূরি দুদ্দু শাহ। দুদ্দু শাহর অনেক গানের বক্তব্যে আমরা লালনের গানের মার্মিকতা উপলব্ধি করতে সামর্থ্য হই। লালন–দুদ্দু এ মহান দুই লোককবির আবিস্কার হচ্ছে মনের মানুষ বা মানুষ তত্ত্ব। এই মনের

মানুষ বা মানুষ তত্ত্বের সারকথা হচ্ছে মানুষের প্রতি গভীর প্রেম ও ভালোবাসা। সেই ফরাসি বিপ্লবের অমঘতা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আর এক প্রতিরূপ এই 'মনের মানুষ তত্ত্ব'।

বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিতে সতের-আঠারো-উনিশ শতক কেটেছে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, ধর্মবোধ-মানবতাবোধের টানাপোড়েনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে। মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ, উচুঁ-নিচু প্রভেদ, ইসলামের সুফিবাদের উদারতা এবং হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের পীড়ন বাঙলার সমন্বয়বাদী সমাজের কোলে লালিত লোকধর্মের বিকাশ বেগবান করেছিল। ঔপনিবেশিক ভাঙা-গড়ায় ধনি অভিজাত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও গার্হস্থ্য জীবন সমাজ কাঠামোর এ ত্রিস্তরেই ধর্মধারণা নানামাত্রিক রূপ নিচ্ছিল। লালন শাহ'র একেবারে সমবয়সী রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের অক্ষয়কুমার দত্ত এবং গ্রামীণ লোকসমাজের গর্বে উদগত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের নানামাত্রা যোগ করছিলেন। তাঁদের ধর্মসমন্বয়ের মহত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ছিল কিঞ্চিৎ ভাবাবেগের তাড়না। রামমোহন প্রচার করলেন নিরাকার একেশ্বরবাদ। রামকৃষ্ণ জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপ করলেন 'যত্রজীব-তত্রশিব'। ঐতিহ্যবোধ-শাস্ত্রজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব পরলোকতত্ত্ব এসব বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংশয়ে দোদুল্যমান বাঙলার সমাজকাঠামো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ-খ্রিস্টান পাঠশালায় পঠিত ইতিহাস আমাদের শিক্ষিত সমাজকে করেছিল বিভ্রান্ত। বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং ধর্মচিন্তকরা বুঝতে পারেন নি বাঙলার লোকধর্মের মানবমুখিনতার শক্তি কথখানি বিপুল ও বিশাল ; কেয়ার করা হয় নি সন্ত কবীর-নানক-দাদু-রজ্জবের এবং সুফিসাধকদের সঙ্গে বাউল চিন্তার পারম্পার্যতার বিষয়টিকে। লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, দুর্বিন শাহ'র গান এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিবর্তমান সমাজ-ইতিহাসের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসমাজের গর্ভে সৃষ্ট লোকধর্মের মৌল দর্শনটি তাদের গানের বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রাগ্রসর এক সাম্যের সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা বাউল গানের মর্মবাণীতে বিধৃত। তবে বাউলের গুরতত্ত্ব এবং মৈথুনতত্ত্বের দর্শন সমাজের প্রাগ্রসরতার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা কিনা তা ভেবে দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও বাউলগান এমন কি বাউল জীবনও কেবল বাঙালি সমাজ নয় বিশ্বসমাজের কাছেও আজ আগ্রহশীল ও উৎসাহব্যাঞ্জক ; এর কারণ আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে। বাউলের প্রতীক-প্রতিমা একতারা-দোতারা আজ বিশ্ব-সমাজের বুদ্ধিজীবী-নাগরিক সমাজের গৃহসজ্জার উপাদান। এরও কারণ শেকড় সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখা আবশ্যক বলে মনে হয়।

বলা চলে বাউল সাধনা এক সচ্ছ ও হিংসা-দ্বেষমুক্ত গণতান্ত্রিক সাম্যের সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষাপুষ্ট। বাউলরা ঈশ্বরভক্তি বা সর্বজীবে দয়ার চেয়ে মানুষে

মানুষে ভালোবাসা, মানুষের প্রতি বন্ধুত্ব, মানুষে মানুষে সাম্য, মানুষের স্বাধীনতায় বেশি আগ্রহী। ইউরোপে আঠারো শতকের শেষপাদে ঘটে যাওয়া ফরাসি বিপ্লবের (১৭৭৯ খ্রি.) মৌল দর্শন 'সাম্য-মৈত্রি-স্বাধীনতা'রই আকাঙ্ক্ষা বাউল দর্শনের মৌল বিষয়। শুধু বাউলই নয় বাঙলায় সৃষ্ট অন্যান্য লোকধর্ম যেমন কর্তাভজা, সাহেব ধনী, বলরামী, লালন শাহী, মতুয়া সম্প্রদায়, সহজিয়া বৈষ্ণব প্রভৃতির মতাদর্শে বিধৃত রয়েছে মানবচেতনার, মানবপ্রেমের বেগমান ধারা।

বাউল মতে যে প্রাগ্রসর সমাজ চিন্তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বাউলের বক্তব্য হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা, মানুষকে শ্রদ্ধা করা। 'মানুষ থুয়ে খোদা ভজো এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে' এটা বাউলের বক্তব্য। মানুষকে অবহেলা করে, মানুষকে অসম্মান করে খোদাপ্রেমে গদগদ হওয়া বাউলের নীতি বিরুদ্ধ। বাউল দুদ্দু বলেছেন, 'যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তে বাউল'। বাউলের এই উদার ভালোবাসা এবং মুক্ত মনের দর্শনের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলোর ভয় সর্বদা। তাই তো রংপুর জেলায় বাঙালিপুরের মৌলবি রেয়াজউদ্দিন আহমদ 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' জারি করে সতর্ক করেন, এই বলে যে :

> বাউল বা ন্যাড়াদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্গের অধিকাংশ লোকেই অবগত আছেন ; তাহাদের দ্বারা মোছলমান সমাজের যে ভীষণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দীর্ঘকাল হইতে বাউল ন্যাড়াগণ মোছলমানের চক্ষে ধুলি দিয়া তাহাদের ঘৃণিত আচার ব্যবহার গুপ্তভাবে করিয়া মোছলমানী সমাজের মেরুদণ্ডকে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। ইহারা ভিতরে অমোছলমান, বাহিরে মোছলমানী নামে নাম, মোছলমান মহল্যায় বাস, মোছলমান কন্যাগণের সহিত বিবাহসাদী ও মোছলমানের সকল প্রকার সামাজিকতায় ভুক্ত। এই অপরিচিত অপ্রকাশ্যভাবে ইহাদের মোছলমানের সহিত মেলামেশার ফলে দলে দলে অশিক্ষিত মোছলমান ইহাদের ধোকাবাজী বুঝিতে না পারিয়া সনাতন এছলাম ধর্মকে ও পবিত্র কোরানকে ত্যাগ করতঃ কাফের মোরতেদ হইয়া যাইতেছে।... এখনও কি তুমি বাউল ফকিরদিগকে মোছলমান বলিয়া জানিবে? এই কি তোমার এছলামী ঈমান ও মোছলমানী প্রাণের টান? তোমার বেখবরী ও হেশকারী হেতু তোমার অধীনস্থ কোন মোছলমান যদ্যপি বাউল মত গ্রহণ করিয়া পবিত্র এছলাম হইতে খারিজ হয় সেজন্য কি তুমি খোদা ও রছুলের নিকট দায়ী নহ?

সুপ্রাচীনকাল থেকে লালিত ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির উদারতা এবং ইসলামের সুফিবাদের গর্ভে হাজার বছর লালিত বাঙলার সংস্কৃতির সমন্বয়ী চেতনা একত্রে গ্রাস ও হজম করেছিলেন লালন শাহ, দুদ্দু শাহ। হিন্দু ও ইসলাম এই দুই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সমন্তরালে শাস্ত্র, আচার, কর্তৃত্ব, সমস্ত ক্লেদ, কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতাকে পদদলিত করে লোকসাধারণের জন্য হিংসা-দ্বেষমুক্ত এক আসন রচনার প্রয়াস তাঁরা করেছিলেন ; এটা ছিল বাঙলার সমাজ আকাশে হাজার বছর লালিত মানবতাবাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁদের অর্জন। বাউল প্রতিপন্ন হয়ছিল ধর্ম

ও সামাজিক অনৈক্যের কঠোর যুক্তিবাদী সমালোচকে। এবং একই সাথে তারা প্রচার করেছিলেন শান্তির, সমন্বয়ে ও সাম্যের বাণী। এ প্রসঙ্গে শক্তিনাথ লিখেছেন:

> এ মতবাদীগণ প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসীদের বৈদিক, আনুমানিক, শরীয়তী হিসাবে উল্লেখ করে, নিজেদের সনাতনপন্থী, বস্তুবাদী, মারফতী, সাধু বলে পরিচয় দেয়। বাহ্যিকভাবে নানা পার্থক্যের মধ্যেও কতকগুলি বিশ্বাস এবং সাধনা এদের ঐক্যসূত্র রচনা করেছে। লালন এবং দুদ্দু নির্দেশিত এই অন্তরঙ্গ পরিচয় হল–১. নির্মিত বা কল্পিত দেবতা, অপদেবতা, মৃতব্যক্তি বা কবর পূজা না করে, এরা 'মানুষতত্ত্ব' মেনে জীবন্ত মানুষের সেবা-পূজা করে, ২. শাস্ত্র, ব্রত-উপবাস, জাতিভেদ, কল্পিত ঈশ্বর বা পরলোক, জন্মান্তর, উপাসনা অগ্রাহ্য করে বাউল ইহকালে/মর্তে 'ভাণ্ডে করে ব্রহ্মাণ্ডের সাধান', ৩. দেহরস এবং ব্রজঃবীজের রসায়নে তারা অমৃত খোঁজে, ৪. সাধনায় নারী গুরুত্বপূর্ণ এবং পূজার্হা এবং ৫. প্রচলিত মূল্যবোধ বিপরীত সত্য হয়ে যায় এখানে।[২০]

বাউল চিন্তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য দিক এই যে, তারা নৃবিজ্ঞানের এবং জীববিজ্ঞানের চিরায়ত সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানবদেহ সৃষ্টির জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে উদ্ধৃত করে, মানুষে মানুষে সৃষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভেদকে যুক্তিযুক্তভাবে অগ্রাহ্য বা খণ্ডন করে তারা মানুষকে এক ও অবিভাজ্য জাতি হিসেবে ঘোষণা দেয়। কৌতুহলের ব্যাপার এই যে, নৃবিজ্ঞান কিন্তু অনেক গবেষণা করে একথা প্রমাণ করেছে যে মানুষ এক উৎস থেকে সৃষ্ট এবং মানুষে মানুষে অবয়বগত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে পার্থক্য তা জীবন সংগ্রামের তাগিদে মানুষকে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার কারণেই সংগঠিত হয়েছে। কাজেই বলা চলে এসব লোককবি এই বিজ্ঞান-সত্যকেই লোকভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

বাউলের অন্বিষ্ট তার মনের মানুষ-'মানুষ তত্ত্ব'। এই মনের মানুষ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বাউল সমগ্র মানব সমাজের সুখ-শান্তি-স্বাধীনতার অন্বেষণ করে। বাউল মত বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতি–ফোকলোর। এটা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয় সেজন্য পিতা বাউল হলেই পুত্র বাউল পদবাচ্যে ভূষিত হতে পারে না। এটা তাকে অর্জন করতে হয় ; ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এ মতবাদ সঞ্চারিত হয়। এটা ব্যক্তি তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় অর্জন করে। সামাজিক অসাম্য, ধর্ম তথা ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব বাউল মত সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেই সামন্তসমাজ এবং বর্জুয়া সমাজের দোসর ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, মোল্লা-মৌলবী পরিবেষ্টিত ধর্মান্ধগণ বাউল মতের প্রতি সর্বদা খড়গ হস্ত। বাঙলার ইতিহাসে বাউলদের বিরুদ্ধে নিরন্তর অবজ্ঞা, অত্যাচার ও নিপীড়নের অজস্র প্রমাণ রয়েছে।

বাঙলার সমাজ আকাশে বাউল মতের উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কে নিৎসন্দেহে বলা চলে হাজার বছর আচরিত সামন্ত শোষণের জাতাকল ও তার দোসর ব্রাহ্মণ্যবাদ-মোল্লাতন্ত্র তথা ধর্মান্ধতার নাগপাশ থেকে মুক্তির প্রয়াসে ঘটেছিল।

অর্থাৎ সমাজ-মানসের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি বাউল মত। দুদ্দু শাহ্ তাঁর এক গানে বাউল হবার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

তাইত বাউল হইনু ভাই
এখন বেদের ভেদবিভেদের
আর তো দাবীদাওয়া নাই।

এ যেন জাতাজাতির ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের মুখে ঝাটা–অর্থাৎ এখন বাউল হয়েছি সুতরাং জাতাজাতির ভেদবিভেদের আর বালাই নাই। এতে প্রমাণ মেলে যে বাউল সম্পূর্ণতই জাতিভেদ বিরোধী, সে অখণ্ড মানবতাবাদে বিশ্বাসী। জাতিভেদের চিহ্ন যারা করেন তারা যে সংকীর্ণ ও হীনস্বার্থে করেন বাউল তার বক্তব্যে যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই তা প্রমাণ করেন। বাউল গান লোকায়ত বাঙলার অনন্য দলিল। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুশাসন, শ্রেণী শোষণ, নির্মম দারিদ্রের কষাঘাত, সামাজিক ভেদবিচারের নির্মম উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লোকসমাজের পক্ষে বাউলের বিদ্রোহ। বাউল গান একান্তভাবেই বাঙলার লোকসমাজের মানস-আকাঙ্ক্ষার ফসল।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ বাউলকে নতুন সৃষ্ট দেশীয় রাগিনী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ গানের কোনো নির্দিষ্ট স্বরলিপি নেই, সুরের ক্ষেত্রেও গায়ক স্বাধীন। বাউল গান সহজ সাধনার গান, এ গানের সুরও সহজ। বাউল গান বাঙলার বিশুদ্ধ লোকগীতি। এ কারণেই অঞ্চলভেদে বাউল গানের সুর, গীত-রীত ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়। জনসাধারণ শব্দ গান, ভাবগান, ফকিরি গান, ধুয়া গান প্রভৃতি নামে বাউল গান আস্বাদান করেন। একতারা, বায়া ও গোপীযন্ত্র একান্তভাবেই বাউল গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। খমক, দোতরা, নূপুর, প্রেমজুরী, জুরি, সারিন্দা, বাঁশি প্রভৃতি লোকবাদ্যও বাউল গানে ব্যবহৃত হয়। নৃত্য ও কথকতা বাউল গানের প্রথাগত অঙ্গ। গায়কের সাজসজ্জা, নৃত্য, অঙ্গভঙ্গি, স্বরক্ষেপণ, গীতরীতি, লয় এবং তাল ফেরতার বৈশিষ্ট্যে বাউল গান শুধু শ্রাব্য নয়- কখনো কখনো তা দৃশ্য নাট্য হয়ে ওঠে।[২১]

বাউল গানের ভাণ্ডার বিপুল-বিশাল। প্রায় চারশ' বছর ধরে এ গান রচিত ও চর্চিত হচ্ছে।[২২] বাউল সাধনার মৌল লক্ষ্য সমন্বিত চিন্তাদর্শ, উদারনৈতিক মানবতাবাদ, সমাজহৈতিষণা ও মানবহিতৈষণা। বাউল গান বর্তমান সমাজের ও ভবিষ্যৎ সমাজের মাঙ্গলিক চিন্তার উপাদান যোগায়। এসব সাধকরা এমন কি চেয়েছিলেন যে, তাদের গান আজো আমাদের আকৃষ্ট করে, প্রলুব্ধ করে, তাদের গানের কথার ভাষায় কি এমন মধুর রঞ্জন ছিল যে আমরা বার বার ফিরে যাই তাদের দ্বারপ্রান্তে। যদি এ গান কেবলই নান্দনিকতার বিষয় হতো তাহলে আর এত কথার ফুলঝুড়ি কেন? না তাদের গানে কেবল নান্দনিকতা নয় তাদের গানে রয়েছে সমাজ, সমাজমন, মানুষ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষে মানুষে সাম্যতা, মানবপ্রেম, মানবতা, মানবতাবাদ।[২৩] বাউল গানের প্রায় চারশ' বছরের

ইতিহাস থেকে শত শত সাধকের নাম আমরা জানতে পারছি গবেষকদের অনুস্থিৎসায়।

বাউল সাধক ও গায়কের একটি সুসংঘবদ্ধ জীবনপঞ্জি আমরা আজও প্রণয়ন করতে পারি নি। তবে এ কথায় আজ সবাই ঐক্যমতে এসেছেন যে, এঁদের মধ্যমণি হচ্ছেন কবি লালন শাহ। লালন আঠারো শতকে জন্মগ্রহণ করে প্রায় উনিশ শতকের শেষ আবধি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন (১৭৭৪-১৮৯০)। লালনের কালপর্বের পূর্বাহ্নে আমরা বাঙলার ইতিহাসে রাজনৈতিক পরাজয় এবং এক ভয়ার্ত দুর্ভিক্ষের চিত্র (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা ১১৭৬,১৭৭৪ খ্রি.) প্রত্যক্ষ করি। ভয়াবহ এ দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল ইংরেজ বণিক-শাসনের লুণ্ঠন, নির্যাতন এবং শোষণমূলক ভ্রান্ত প্রশাসনিক নীতি। লালনের সমকাল বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে যেমন দুর্যোগময়, তেমনি বিকাশমান। দেশ তখন পরাধীন; সাত সমুদ্দুর তের নদী পারের এক বণিকগোষ্ঠীর কতিপয় অর্থ লোলুপের আগ্রাসনের স্বীকার আমরা। দেশের এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লালন সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে, একজন লোককবি হিসেবে দেশের এই হতদরিদ্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন, যার স্বীকার তিনি নিজেও। এস. এম. লুৎফর রহমান লিখেছেন :

> আলোচ্য লোক-কবি উনবিংশ শতাব্দীর যে লোক-মানস ও সংস্কৃতির প্রতিনির্ধি--তা'ছিল তৎকালীন সমাজেরই সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন। 'অর্থনীতিই ছিল ভিত্তি– রাজনীতি ও সংস্কৃতি তার উপরিসৌধ। তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল আবার প্রচণ্ড প্রভাবের এবং প্রতিক্রিয়ার।' তার কারণ মার্কস-এর কথা'য় 'জড়জগতে বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদন-পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক-রাজনৈতিক এবং ধ্যান-ধ্যারণার সমস্ত গতিই নিয়ন্ত্রয়ণ করে। ফলে, কোন কবি কোন সমাজের যে-নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তা' দিয়েই তাঁর ধ্যান-ধারণা বিন্যস্ত হয়। তিনি, হয় তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন, নতি স্বীকার করেন ; অথবা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।
>
> এই দৃষ্টিকোণ থেকে লালন-প্রতিভার প্রেক্ষাপট আলোচনা করা প্রয়োজন। তার আগে স্মরণীয়, লালন শাহ (১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে বা তার নিকটবর্তীকালে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভূমি যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রাম। তিনি ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে(বা তার নিকটবর্তী কালে) গ্রাম ত্যাগ করেন এবং নবদ্বীপে উপনীত হন। নদীয়ায় তিনি সাত বছর অতিবাহিত করেন এবং এখানেই প্রথম গান রচনা শুরু করেন। তারপর দশ বছর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ ক'রে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে (বা তার নিকটবর্তী সময়ে) কুষ্টিয়ায় আসেন এবং ছেঁউড়িয়ায় আখড়া নির্মাণের পর স্থায়ীভাবে সাধনায় ও গান রচনায় নিয়োজিত হন। তাঁর মৃত্যু ১৮৮৮ কিংবা ৯০ খ্রিস্টাব্দে। তাহ'লে মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে লালন-প্রতিভার উন্মেষ এবং ১৮৯০ তে তার অবসান। প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীই লালন-প্রতিভার ব্যাপ্তিকাল। আর উনবিংশ শতাব্দীর-ই সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে লালন প্রতিভার বিকাশ।[২৪]

হিন্দু ও মুসলিম সমাজের লৌকিক পরিমণ্ডলে লোককবিগণ বৈদিক, লৌকিক এবং ইসলামি সংস্কৃতির উপাদানের মিশ্রণে বাউল গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল বাউল দর্শন ও বাউল গানের সুরকে আত্তীকরণ করে বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশ এবং বাঙলা ভাষার প্রতি নিবিড় ভালোবাসা বাউলের। বাঙালি জাতিয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বাউল গান। লালন বলেন, 'শিখবি যদি আরবি বুলি বাঙলা খান নেওগা পাশ করি'। দুদ্দু শাহ বলেন, 'মাতৃভাষা ত্যাজে সবাই/আরবি ভাষা শিখলে রে ভাই/তাতে ভাই ফায়দা তো নাই অবশেষে।' বাউল কবি আলেপ মাতৃভাষা অবহেলা করে যারা আরবি ভাষা শিখেছে তিনি তাদের বলেছেন 'দিন কানা'। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের কবি মহিন শাহ মাতৃভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর এক গানে বলেছেন, 'আমরা ভাষার স্বাধীন চাই'। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাউল গান ব্যাপক প্রেরণা যুগিয়েছিল। ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাউল গান ছিল প্রেরণাদায়ী ঐতিহ্যের প্রতীক। আজও আমরা লালন শাহ, আবদুল করিম প্রমুখের গানে প্রাণের স্পর্শ অনুভব করি। বাউল গান বাঙালির প্রাণের গান।

লালনের প্রথম পরিচয় আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ এই কবির গান ও বাউল সুরে কোথাও যেন তার আত্মিক মিল খুঁজে পান। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির গণ্ডি থেকে যখন কার্যব্যাপদেশে (জমিদারি তদারকির জন্য) কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এবং পাবনার শাহজাদপুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন– পদ্মা ছেড়ে কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর বাঁকে বোট চলছে চিরায়ত নিয়মে বৈঠা বেয়ে, লগি ঠেলে, দাড় টেনে বা পাল উড়েয়ে ; সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যে কবিব চিত্তে শিহরণ জাগে, কবি মুগ্ধ হন। পদাবলীসিক্ত কবির বৈষ্ণবমন– তার উপর নদীর পাড়ে, পাড়ায়, গ্রামে, একতারা দোতারার টুংটাং শব্দ, অচিন পাখির হৃদয়গ্রাহী- চিত্তহরী সুরের গুঞ্জন কবিকে যেন অচিন লোকে নিয়ে যায়, কবির যেন পুনর্জন্ম সাধিত হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে বাউল গান ও সুরের আত্মিক পরিচয় ঘটে। শিলাইদহের প্রকৃতি, বাউল গান ও কবি লালন শাহর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতখানি তা আমরা কবির নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে জানতে পারি :

১. বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউলের গানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকেলে আধুনিক।
২. তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরিব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারে।
৩. পৃথিবী যে কি আশ্চর্য সুন্দরী এবং কি প্রশস্তমান এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এখানে না এলে মনে পড়ে না।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি যে সব অভিনব অসাধারণ গান লেখেন তার সুরকাঠামোয় বাউল গানের স্পন্দন ও উদ্দীপনা তিনি অসামান্য নৈপুণ্যে ব্যবহার করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত গোরা উপন্যাসে লালনের খাঁচার ভিতর অচীন পাখী কমনে আসে যায়, গানটির প্রথম দুই ছত্র ব্যবহার করেছিলেন। ১৩২২ সালের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘ মাসে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালনের ২০ টি গান প্রকাশিত হয়। রবীন্দনাথ লালনের ২৯৮টি গানের দুইটি নকল খাতা সংগ্রহ করেছিলেন। সে খাতা দুটি এখন শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রসদনে' রক্ষিত আছে।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ 'রবি-বাউল' নামে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। কবি তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গপত্রে লেখেন : 'শ্রীমান দীনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্য কাব্যটিকে রবি-বাউলের একতারার মত সমপর্ণ করিলাম।' তাঁর স্বীকারোক্তি ; 'আমার নিজের লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি ; এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিনীর সঙ্গে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউল সুর ও বাণী কোন এক সময় আমার মধ্যে সহজে মিশে গেছে।'[২৬]

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সুফি-সাধক পির-দরবেশ-ফকিরদের অবদান এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর হয়েছে। এসব মরমি সাধকরা তাদের চারিত্রিক গুণাবলির জন্য সকল শ্রেণীর জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তারা যে ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন, সেটা ছিল পরমতসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য; মানবতার ইতিহাস, যা বাঙলার মন ও মানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যে ধারাটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে সেটি সংঘাত বা বিরোধের ধারা নয় ; সেটি হলো সমন্বয়ের ধারা। এ ধারায় কবি লালন শাহ নবতর মাত্রাযুক্ত করেন। বাঙলা কাব্য ধারায় কবি লালন শাহের মধ্যে আমরা এমন একটি অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পাই যা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষাপুষ্ট। বিশ্বমানবতার জয়গান তার কাব্যকলার প্রতিটি পংক্তি। তাঁর কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা :

ভক্তের দ্বারে বাধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই।

সরলিকৃত তাঁর এই কাব্যিক ব্যঞ্জনার মধ্যে ঘোষিত হয়েছে মানুষের জয়গান। কবীর, নানক, তুলসীদাস, দাদু প্রমুখের মতই ধর্মীয় বিভেদকে তুচ্ছ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপ্ন দেখেছেন লালন। তিনি ছিলেন বিশ্বমানব প্রেমিক। তাঁর গানে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐতিহ্য ব্যবহারের ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পারিক উপলব্ধি, সমন্বয় ও মিলনের প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে রচিত হয়েছে।

লালনের চিন্তাদর্শে বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ তথা সাধনার ধারাকে সমন্বয় করার প্রয়াস দেখা দেয়। ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্ব, হিন্দু ধর্মের ব্রহ্মতত্ত্ব, অবতারবাদ বা জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন।[২৭] ভগবান সম্পর্কে নির্বিকার বৌদ্ধদের দেহতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল বলে মনে করা হয়। তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় তিনি এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন বিষয় সংবলিত গানগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করলে মনে হয় প্রথমে তিনি ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার করে পরে তা থেকে সরে গিয়ে সর্বজনীন মানবতাবাদে প্রত্যয়শীল হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ (সাঃ), শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য দেবকে তিনি আল্লাহ বা ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণের অবতার বলে গ্রহণ করেছিলেন।[২৮]

বাউল মতে, চিরন্তন মানবসত্তা নিগূঢ় তাৎপর্যে এক ও অবিভাজ্য। এ মতে মানুষে মানুষে কোথাও কোনো পার্থক্য নেই। লালন বলেন :

এক চাঁদে হয় জগত আলো
এক বীজে সব জন্ম হলো
লালন বলে মিছে কল
ভবে শুনতে পাই॥

এত বড় উদার আদর্শ, বিজ্ঞান-সত্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে মেলে না। ধর্ম-জাতি-বর্ণের সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে বাউল। এ প্রসঙ্গে আবুল আহসান চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন : 'রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য আয়োজিত 'ছাত্রসভা'র এক অধিবেশনে (১৩১৬) প্রদত্ত ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে লালনের উল্লেখ করেছিলেন। এখানে তিনি লালন সম্পর্কে 'কিছু জানি' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান হিন্দু জৈন মত-সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় হইয়াছে। এ বিষয়ে সকলেরই মন দেওয়া উচিত'।

বাউল যে বস্তুবাদী এবং সে কারণে তারা সমাজবাদীও বটে একথা শক্তিনাথ ঝা (বস্তুবাদী বাউল : ১৯৯৯) যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রমাণ করেছেন। লালন বলেন, 'এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে। যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান, জাতিগোত্র নাহি রবে।' এখানে দেখা যাচ্ছে লালন এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখছেন যে সমাজ হবে জাতিগোত্রহীন, এ সমাজ যে দ্বিধান্বিত তা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন :

১. কেউ বলে মক্কায় যেয়ে হজ করিলে যাবে গোনা,
কেউ বলিছে মানুষ ভজে মানুষ হ-না।
২. কেউ বলে পড়লে কালাম ভেস্তখানায় পায় সে আরাম,
কেউ বলে সেই সুখের ঠাই কারো কায়েম রয়না।
৩. কেউ বলে মুর্শিদের ঠাই খুঁজিলে পাই আদি ঠিকানা
লালন ভেড়ো তাই না বুঝে হয় দোটানা।[২৯]

গানের এসব কথায় তিনি সমাজমনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করে বস্তুবাদী সমাজ দর্শনের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়েছেন। লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর অসারতার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন :

মুহম্মদের জন্ম যদি হতো এ দেশে।
বেহেশতের কোন ভাষা হতো, বলতো এসে॥
হিব্রুতে ইঞ্জিল তাওরাত,
আবেস্ত ভাষায় 'খোদার' মত,
সংস্কৃতে বেদান্তের বয়েৎ
লেখা আছে সবিশেষে॥
কেন কূপমণ্ডূক হও রে ভাই,
হিসেবে করে বোজ সবাই,
খোদার সত্ত্বার কোথাও খোঁজ নাই,
অধীন দুদ্দু ভেবে বলে॥[৩০]

এমন প্রাগ্রসর বক্তব্য এ গানে উঠে এসেছে যেখানে মার্কস-এঙ্গেলস-এর কমিউনিজমেব দর্শনকেও হার মানিয়েছে। 'অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সার সংকলনই বাউলদের দর্শন। সর্বপ্রকার অনুমান পরিহার করে প্রত্যক্ষ ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাকেই এরা মূল্য দেয়। বাউল তাত্ত্বিক হাইপোথেসিসে বিশ্বাসী নয়, যারে দেখে যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাই বাউাল গ্রহণ করে। সে অনুমান মানে না, বর্তমান মানে। সুতরাং বাউল ভাববাদ বিরোধী বস্তুবাদী কুলের সন্তান।'[৩১]

মৈথুনশক্তি বৃদ্ধি, সন্তান জন্ম নিরোধ, চারচন্দ্র ভেদ এদের সাধ্য সাধন। দেহমিলন বিজ্ঞান, কামশাস্ত্র ভারতীয় বস্তুবাদের অবদান। অতিতে এসব মতাদর্শের প্রবক্তা কাপালিকরা বস্তুবাদী বলে নিন্দিত এবং লাঞ্ছিত হতেন। প্রাচীন ভারতে, দেহ সুখভোগ শাস্ত্রের নাম ছিল কাপালিক। কাপালিকদের দেহকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের অনুসরাণ করে বাউল সাধক। সোম সিদ্ধান্ত এবং চার্বাক দর্শনের মতো মোক্ষ বা মুক্তিকে উপহাস করা হয় বাউল মতে। কাপালিকদের মতো বাউলেরা আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে শাস্ত্রীয় ধর্মাচারকে। ভারতের বস্তুবাদী দর্শনের প্রবক্তা চার্বাদেক বা লোকায়তিকরা। চার্বাকের মতে বর্ণভেদ নেই, তারা মৃত্যুকে ভয় করে না, তাদের বিবেচনায় পাপপূণ্য কিছু নেই, কর্মফল নেই, স্বর্গ-নবক নেই, পরলোক নেই, জন্মান্তর নেই, ধর্মাধর্ম নেই, ঋষি নেই, দেবতা নেই অর্থাৎ প্রত্যেক্ষের বাইরে কিছু নেই। চার্বাকদের এ দৃঢ় প্রত্যয়টিই হচ্ছে ভারতীয় বস্তুবাদ। উপমহাদেশে অসুর জাতির ইহবাদী দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন বৃহস্পতি। হিন্দু বৈষ্ণবদের (বাউল) একাংশ, মুসলমান বাউল ও সুফিগণের (চিস্তিয়া) এক অংশ বৃহস্পতিবার বিশেষ দিন হিসেবে পালান করে আদি গুরু বৃহস্পতিকে স্মরণ করে। আজ পণ্ডিতরা একজন বৃহস্পতির পরিবর্তে বৃহস্পতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করছেন। চার্বাক প্রমুখ বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। প্রাচীন বার্হস্পত্য গোষ্ঠীর মতো বাউল এক সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী। বাউল

মাটি, কাঠ, পাথরের কোনো মূর্তি বা দেবতার পূজা করে না। অচেতন মূর্তি পূজাকে বিদ্রূপ করে বহু বাউল গান রচিত হয়েছে। মানুষ ছেড়ে যারা কাঠ, খড়, মাটিকে পূজা করে বাউল তাদেরকে বিদ্রূপ করে।[৩২] বাউল কোনো ধর্মীয় ব্রত, পূজা, অনুষ্ঠান, উপবাস করে না। ধর্মানুষ্ঠান, প্রার্থনা বাউল জীবনাদর্শ বিরোধী। দুদ্দু শাহ 'হ্যাপা', 'হিন্দুদের ঠোকাঠুকি' এবং মুসলমানদের সব মেকী পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি নাম, মালা, ডোর, কৌপিন, ধর্মীয় পোশাককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন।[৩৩] লালন তার জীবৎকালেই বাঙলার বিদ্বৎসমাজের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত সাপ্তাহিক গ্রমবার্ত্তা প্রকাশিকায় (১০ম ভাগ, ১৭শ সংখ্যা, ভাদ্র ১ম সপ্তাহ : আগস্ট ১৮৭২ ; পৃ ৩) লালন প্রবর্তিত লোকধর্মের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের চিত্তাকর্ষক সংবাদ মুদ্রিত হয় 'জাতি' শীর্ষক এক সংবাদ নিবন্ধে :

> সকলেই ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মসভার নাম শুনিয়াছেন। গৌরসভা নামে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আর এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার নির্দিষ্ট স্থান নাই। গৌরবাদী বক্তা এক ২ পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া সভা করিয়া গৌরাঙ্গের চরিত ও লীলাদি বর্ণন করে, স্ত্রীপুরুষ ৩/৪ শত লোক এক ২ সভায় উপস্থিত থাকে। ইহারা স্বধর্ম্মের মধ্যে, জাতিভেদ স্বীকার করে না, কুরি, কামার, কুমার, তেলি, জালিক, ছুতার প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে আহার করে। এই দলে মুসলমান আছে কিনা জানিতে পারা যায় নাই। লালন শাহ নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম্ম আবিস্কার করিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব। ৩/৪ বৎসরের মধ্যে এই সম্প্রদায় অতিশয় প্রবল হইয়াছে। ইহারা যে জাতিভেদ স্বীকার করে না সে কথা বাহুল্য। এখন পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, এদিকে ব্রাহ্মধর্ম জাতির পশ্চাতে খোঁচা মারিতেছে, ওদিকে গৌরবাদিরা তাহাকে আঘাত করিতেছে, আবার সে দিকে লালন সম্প্রদায়িরা, ইহার পরেও স্বেচ্ছাচারের তাড়না আছে। এখন জাতি তিষ্টিতে না পারিয়া, বাঘিনীর ন্যায় পলায়ন করিবার পথ দেখিতেছে।

এটা প্রকাশিত হয় লালনের মৃত্যুর ১৮ বছর আগে। এ সংবাদের তিনটি বাক্য সমকালে লালনের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং লালন প্রবর্তিত বাউল সম্প্রদায় সংগঠনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। লালনকে এখানে প্রতিপক্ষ হিসেবেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখানে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম এবং রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মকেও সমস্যা বিবেচনা করা হয়েছে। এস.এম. লুৎফর রহমান লালনের অন্যতম শিষ্য দুদ্দু শাহ'র জীবনী আলোচনায় লালন প্রবর্তিত বাউল মত প্রসঙ্গে এক চিত্তাকর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি লেখেন :

> কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা দেখতে পান, এক্ষেত্রে লালন শাহ ফকীর নামক জনৈক বাউল-গুরুর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। তাঁর বিপুল অনুসারী সমগ্র কুষ্টিয়া, নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী, চব্বিশ পরগণা, বর্তমান, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। অতএব, তাঁকে প্রতিহত করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় এ-মতবাদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তিনি অবশ্য এও জানতে

> পারেন-লোকটি বড় সহজ নয়। তাঁর সঙ্গে বহু মোল্লা, মৌলবী, মুন্সী, আলেম বাহাছ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছেন। পরাজিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ পেছু হটে এসেছেন ; কেউ কেউ তাঁর মতবাদই গ্রহণ করেছেন। খাঁটি শরীয়ৎপন্থী ইসলাম ত্যাগ করে মেনে নিয়েছেন- লালন শাহী বাউল মত।
> এ পরিপ্রেক্ষিত দুধ মল্লিক বিশ্বাস লালন শাহকে বাউল মত প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য বন্ধু হাজী হাসান ও ফতোয়ার কেতাবাদিসহ বাহাছের জন্য ছেঁউড়িয়ায় গমন করেন। লালনের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ তর্ক যুদ্ধ হয়। দুধ মল্লিক বিশ্বাস সদলবলে পরাজিত হন এবং স্বয়ং বাউল মতবাদে দীক্ষা নেন।

এস. এম. লৎফর রহমানের এ বক্তব্য যেমন লালনের পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ দেয় তেমনি তা এও প্রমাণ করে যে লালন তৎকালের লোকসমাজে তাঁর মতপদ্ধতি প্রকাশের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী ভিত রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তথা ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরআন, বেদ, বেদবিধি এবং বৈদিকতার বিরুদ্ধে বাউল মতবাদ বিরুদ্ধবাদী মতবাদ হিসেবেই ছিল তৎপর। বাউল সাধকেরা নিজেদের অবৈদিক ও বেদ বিরোধী বলে পরিচয় দেয়। বেদবিহিত ধর্মাচার ও মতাদর্শ পরিত্যাগ না করে বাউল হওয়া যায় না। বেদের নিন্দা, বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার এবং বৈদিক আচার লঙ্ঘন করা ছিল প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদীদের বৈশিষ্ট্য। নজরুলের মতো বাউলরাও মনে করে যে, 'মানুষ এনেছে গ্রন্থ'। নদিয়ার বেলেডাঙ্গা নিবাসী সাধক সচ্চিদানন্দ, 'নারী' বিষয়ক কবিতায় লিখেছেন যে 'নারীরা শাস্ত্রকর্তা হলে পুরুষদের বৈধব্য, একাদশী পালন করতে হতো'। সুতরাং শাস্ত্র মানুষ রচিত গ্রন্থ। প্রাচীন বস্তুবাদ কেবল শাস্ত্রকে সমালোচনা করে ক্ষান্তই হয়নি ; ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে পুরাপুরি প্রত্যাখ্যান করে তবেই নিশ্চিত হয়েছিল।[৩৪] তাদের বিশ্বাস্য তত্ত্ব পাওয়া যায় জীবিত মানুষের কাছেই। সুতরাং মানুষ তত্ত্ব দিয়ে তারা শাস্ত্রকে খণ্ডন করেন। বেদ বিরোধিতার অন্তরালে তারা সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রের বিরোধিতা করেন। আবার সংসার, ইন্দ্রিয়কে বাদ দিয়ে সত্য লভ্য নয় একথা বাউল দর্শনে বলা হয়েছে। চার্বাকদের লৌকিক ভাষা-ব্যবহার ছিল শাস্ত্র ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ। তেমনি বাউল গানে আরবি, ফার্সি ভাষার মোহের বিরুদ্ধে কটাক্ষ আছে। লালন বাঙালিকে আরবি শেখার আগে বাঙলা ভাষা ভালো করে শিখে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। দুদ্দু শাহ বলেন, 'মাতৃভাষা ত্যাজে সবাই/ আরবি ভাষা শিখলে রে তাই,/তাতে ভাই ফয়দা তো নাই অবশেষে॥'[৩৫] বাউল আলেপ একটি গানে বলেছেন, 'বাংলা ফেল আরবি জানা, তাকেই বলে দিনকানা।'[৩৬] মাতৃভাষার প্রতি বিপুল ভালোবাসা বাউলের, তাদের মন্ত্রণাদিও বাঙলায় রচিত। এই যে লৌকিক জীবন, লোকভাষা, লোকসমাজ, লোকসমাজের মনোবাঞ্ছা স্থান-কাল-সমাজ নির্বিশেষে সাম্যভাবাপন্ন, বন্ধুভাবাপন্ন। এরই গর্ভে উদগত বাঙলার লোকধর্ম, এরই পারিপার্শ্বে লালিত-পালিত-বিকশিত বাউল মত তার এক উজ্জ্বলতম শাখা। লালন তার প্রধান

উদগাতা ও পৃষ্ঠপোষক। লালন শাহ'র বক্তব্যে বস্তুবাদ ও বিশ্বজনীন মানবতাবাদের পরিচয় ফুটে উঠেছে। লালন বলেন :

মাটির ঢিবি কাঠের ছবি/ভূতভাবে সব দেবা দেবী
ভোলে না সে এসব রূপি/ও মানুষ রতন চেনে॥
জীন-ফেরেস্তার খেলা/পেঁচাপেচি আলাভোলা
তার নয় হয়না ভোলা/ও যে মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে॥

এখানে কর্ম এবং মানব মহিমাকে সর্বোচ্চ আসন দেয়া হয়েছে। মাটি, কাঠ, পাথরের কোনো মূর্তি বা দেবতার পূজা বাউল করে না। বরং অচেতন মূর্তি পূজাকে বিদ্রূপ করে বাউল বহুগান রচনা করেছে। তার সাধন-ভজনে দেব-শাস্ত্র-মূর্তি অগ্রাহ্য হয়ে প্রাধান্য পেয়েছে মানবদেহ। লালনের জীবনদর্শন সমকালের মানুষকে ভাবিত করেছিল। তাঁর জাত-ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বিভিন্ন গানে জাত-বর্ণের অসারতা ব্যক্ত করেন।[৩৭]

লালন হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন তাঁর কাছে অবান্তর, অর্থহীন, কেননা জাত-ধর্ম সে মানে না, অখণ্ড সৃষ্টিকর্তার প্রত্যয়টিও তার কাছে অর্থহীন। আমরা কবীরের দোহায় পাই, 'হিন্দু মুখে রাম কহি মুসলমান খোদাই। /কহৈ কবীর সো জীবতা সৈঁ ফদে না জাই' অর্থাৎ 'হিন্দু মরে রাম রাম করে, মুসলমান মরে খোদা খোদা করে, এসব ভেদবুদ্ধির মধ্যে যে না পড়ল সেই বাঁচাল'।

বাউল দেহতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের বিশ্বাস্য তত্ত্ব পাওয়া যায় জীবিত মানুষের কাছেই। সুতরাং মানষতত্ত্ব দিয়ে তারা শাস্ত্র খণ্ডন করেন। আমরা আগেই বলেছি প্রাচীন বস্তুবাদ কেবল শাস্ত্রকে সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হয় নি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে পুরোপুরি প্রত্যখ্যান করে তবেই নিশ্চিত হয়েছে। বাউল প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতগুলোর মূল্যহীনতা প্রতিপাদন করে, শাস্ত্রগুলোকে আনুমানিক বলে বর্ণনা করে। সংসার পরিত্যাগ করে যে সব সাধু-সন্ন্যাসী দেহকে কষ্ট দেয়, জীবন ও ভোগকে প্রত্যাখ্যাত করে এবং অলৌকিক ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ায় তাদের ভ্রান্ত বলে বাউল।[৩৮] আহমদ শরীফ লেখেন :

> বাউলেরা রাগপন্থী। কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগসাধনাই বাউল-পদ্ধতি। ইন্দ্রিয়-নিরোধ, বিষয়-ত্যাগ, কিংবা বৈরাগ্য এদের লক্ষ্য নয়। তবু প্রাচীন ভারতিক ঐতিহ্য প্রভাবে মুনি, আজীবিক, ভিক্ষু, সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব-বৈরাগী প্রভৃতির মতো বাউলেও ভিক্ষাজীবী বৈরাগী আছে। সে হিসেবে বাউল দু'প্রকার : গৃহী ও বৈরাগী। বর্তমানে এরা বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। হযরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেব ধনী, জিকির, ফকির, বাউল, আউল, কর্তাভজা, ন্যাড়া, বলরামী, শম্ভুচাঁদী, রামবল্লভী প্রভৃতি নাম থেকে তাদের সম্প্রদায়ের প্রর্বতকের নাম ও সাধনপন্থার আভাস পাওয়া যায়। এদের সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার ও ধর্মদর্শনের কোনো লিখিত ইতিহাস বা শাস্ত্রগ্রন্থ নেই। তাই এসব মতের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির খবর পাওয়া দুস্কর।[৩৯]

বাউল মতবাদের বিকাশ হয় সামন্তসমাজের স্বার্থান্বেষী শাসকশ্রেণীর প্রতিকূল মতবাদ হিসেবেই। বাউলরা প্রচলিত ধর্ম, জাতি বা বর্ণবৈষম্য, দেবদেবী, পূজা-আচার, নামাজ-রোজা, মন্দির-মসজিদ কণ্টকিত সামন্ত সমাজের ধ্যান-ধারণাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে এবং সেই ভাবধারাতেই আপ্লুত তাঁদের 'মনের মানুষ' এক নতুন মানবতাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সামন্তসমাজের নিপীড়িত জনমানসে তাই সেই মানুষটি আসন পাততে পেরেছিল। দরিদ্র, ভূমিহীন, নিঃস্ব চাষী ও তথাকথিত দরিদ্র সমাজ থেকেই বাউলরা এসেছিলেন। পারস্যের সুফিসাধক মনসুর হাল্লাজকে গোঁড়া শরিয়তিরা পুড়িয়ে মেরেছিল-কারণ তিনি বলেছিলেন 'আনাল হক'-'আমিই আল্লা' ঠিক তেমনি সমাজপতিদের হাতে লালন প্রমুখ বাউলের নিগ্রহের কাহিনীও প্রচলিত আছে। বাউল দর্শন মানুষমুখী, ইহজীবনমুখী, তবু কেন তাঁরা বিবাগী, কেন নিজেরা বলে ; 'ধামরা পাখির জাতি'। তার কারণ আচার-বিচারের প্রহরীঘেরা বর্ণবিভাজিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অচলায়তনে মুক্তমতি বাউলদের বাসা বাঁধবার কোনো সুযোগ ছিল না। এই 'মুক্তডানা' পাখির জাত ছিল সামন্ততন্ত্রী শেকলে বাঁধা মেহনতকারী মানুষের মুক্তিকামনারই প্রতীক ও প্রতিনিধি। ধর্মনেতারা ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে প্রাদেশীক ভাষা ব্যবহারে পাপের গন্ধ খুঁজেছেন, আরবি এবং সংস্কৃতি ভাষা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা–লোককবিরা গোড়াতেই ছিলেন এ মতের বিরুদ্ধবাদী, বৌদ্ধরা সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অস্বীকার করেছিল।

কবি পাগলা কানাই দরিদ্র কৃষকের সন্তান। জীবন ধারণের জন্য তাঁকে কৃষি কাজের উপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। তিনি সুফি সাধকের পথের অনুসারী। তাঁর গানে তত্ত্বকথার মাঝেও সহজ সুরের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায়। বাউলরা নিজেদেরকে এক পৃথক সম্প্রদায় বলেই মনে করেন। ইসলামি অনুশাসনের বিধিবদ্ধ তিরিশ রোজা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশের পরও দেখা যায় জাতের পরিচয়ই তার কাছে আসল পরিচয় নয়, কারণ বাউলরা সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির উর্ধ্বে থেকে মানবতার সাধনায় আত্মমগ্ন। এ উপলব্ধি পাগলা কানাইয়ের গানেও পাই :

> কেউ বলে দূর্গা হরি
> কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি
> তবু পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়।

পাণ্ডু শাহ সর্বজনীন মানবতাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। হিংসা-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহমুক্ত এক অসাম্প্রদায়িক সমাজ চেতনা ছিল তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল। তাঁর রচনায় পাই :

> দলীল পড়িয়া ভাই
> মৌলবী হলো তাই, হায় গো।
> মনেতে ভেবেছে এই ভেস্তে যাবে চলে।

আবার, ইঞ্জিল পড়ে কেউ
গর্দ আদমী হল সেও, হায় গো।
মোর দিন ভাল বলে ডংকা মেরে চলে।
ভগবত পড়ে কেউ
পণ্ডিত হল সেও হায় গো।
বলে সেও স্বর্গে যাবে, হিন্দু লোকের দলে।
নাচানাচি করে তায় পড়লো গোলমালে।

'ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা' এ ধারণা থেকে হিন্দু দর্শন বিশ্বকে ব্রহ্মময়রূপে বিচার করেছে। 'বিশ্বে' এবং ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই। এ মতের ভিত্তিতে দেখতে গেলে মানুষকে আমরা ব্রহ্মময়রূপে দেখি। মানুষের মধ্যে সেই ব্রহ্মের ঐশী শক্তি নিহিত। যে মানুষ নিজেকে জানতে পেরেছে, ব্রহ্মলাভ তার সহজে হয়েছে। এ ধারণাই উনিষদে ব্যক্ত হয়েছে– 'আত্মানংবিদ্ধ' 'আত্মাকে জানো'। আত্মাকে জানলেই সমস্ত সংশয়, সমস্ত বিভেদ থেকে মুক্তি পাবে। বাউলের দেহবাদ ঠিক একই কথা বলে। দুদ্দু শাহ বলেন :

যে খোঁজে মানুষে খোদা
সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খোঁজে
পায় তার উল॥

বাউল সাধকগণ সর্বতোভাবে দেহকে কেন্দ্র করে দেহের মধ্যেই থাকেন। দেহের বাইরের গেলেই মৃত্যু অবস্থায় পরিণত হবে। 'মরার আগে মরতে পারলে তার কি হয় রে মরণ'–জীবন চিন্তার এ এক গুরুতর রহস্য। দুদ্দু শাহ আরো বলেন :

জীবন তীর্থ-ধর্ম পথ
এই কথা বাউলের মত
বস্তুবাদী বাউল আদত
কেহ কেহ কয়।

পাগল না হলে উদাসী হওয়া যায় না। আসলে ব্রহ্মও যিনি, খোদাও তিনি। মধ্যযুগের একটি কবিতায় পাই :

হিন্দুর দেবতা হইল মুসলমানের পীর।
দুই কুলে লয় সেবা হইয়া জাহির।

মধ্যযুগে বাঙলার সমাজ আকাশে ধর্ম সমন্বয়ের যে আবহ সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে উদ্ভব ঘটেছিল ধর্ম ঠাকুরের, সত্যপির-গাজিপীরের, সত্যানারায়ণের, যাঁরা একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে সমভাবে শ্রদ্ধার্হ ও পূজ্য ছিল।

বৌদ্ধ সিদ্ধাগণের উত্তর-পুরুষ হচ্ছেন বাঙলার বাউল সম্প্রদায়। হাসন রাজা এই বাউল সম্প্রদায়েরই একজন অন্যতম সাধক। বাউলেরা এই গীতিমার্গের মধ্য দিয়েই আত্মমুক্তির সহজ পথ সন্ধান করে থাকেন। মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে হাসন

রাজা কতটা ক্ষিপ্ত ছিলেন তা তাঁর অনেক গানেই ফুটে উঠেছে। ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তাঁর কোনো সংকীর্ণতা তো ছিলই না বরং জীবনভরই তিনি উদারতা দেখিয়েছেন। এটা হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির একটি উৎকৃষ্ট দিক। বৌদ্ধউর্বর সমাজমনে, বৈষ্ণবের প্রেমের ভুবনে, সুফিদের উদারমানবতাবাদের যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ বাঙলায় বিরাজ করছিল তারই বহিঃপ্রকাশ হাসন রাজাসহ বিভিন্ন লোককবির গানের মর্মবাণীতে বিধৃত হয়েছে। এদের মধ্যে লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, ভোলা শাহ, শেখ মদন, তিনু ফকির, পাগলা কানাই, শিতালং শাহ প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হাসন রাজা ছিলেন এঁদেরই সমগোত্র। তাঁর বৈষ্ণব-রীতিপদ্ধতির একটি গান এখানে উল্লেখযোগ্য। নাম প্রেমের হাট :

প্রেমের বাজারে বিকায় মাণিক ও সোনা।
যে জন চিনিয়া কিনে, লাভ হয় তিন দুনা রে॥
প্রেমিকেরা প্রেম-বাজারে করে আনা যানা।
অপ্রেমিক তো যায় না কেহই, চোখ থাকিতে কানা রে॥
প্রেম-বাজারে গিয়ে যারা বানাইয়াছে খানা।
মরণ তাদের দূর হইয়াছে, সর্বদাই জিনা রে॥
হাসন রাজা প্রেম-বাজারে গিয়ে হইল ফানা।
নাচন বাদন করিয়া গায় প্রেমের এই গানা রে॥

বৈষ্ণবীয় ভাব-সাধনার একটি উল্লেখযোগ্য গান এটি। প্রেমের বাজারে রত্ন-মাণিকের ছড়াছড়ি। এই রত্নকে যে চিনে কিনতে পারে, প্রেমের বাজারে তার তিনগুণ লাভের সওদা। এ বাজারে অপ্রেমিকের কোনো ঠাঁই নেই। হাসন রাজা পরিহাস করে বলেন :

কারে বন্ধে করিবা পার মোল্লার ঝি
কারে বন্ধে করিবা পার॥
তোর বাপে করে নামাজ রোজা
আমি গোনাগার॥
তোমার বাপে দিনে রাইতে নামাজ রোজা করে
লোক সমাজে বসিয়া কেন নিন্দা করে মরে।
তোমার বাপে দিনে রাইতে করে এবাদত
মুই গোনাহ্গার না লই মোল্লার মত।
চোখ থাকিতে দিনের কানার মত নাহি চাই
সম্মুখে যে বন্ধ খাড়া মোল্লায় বলছে কৈ
হাসন রাজার আল্লারে মোল্লায় নাহি দেখে
আজলের আন্ধি লাগছে কট মোল্লার আখরে।

মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে হাসন রাজা কতটা ক্ষিপ্ত ছিলেন তা তাঁর অনেক গানেই ফুটে উঠেছে। ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তাঁর কোনো সংকীর্ণতা ছিলই না বরং জীবনভরই তিনি উদারতা দেখিয়েছেন। এটা হাজার বছরের বাঙালি

সংস্কৃতির একটি উৎকৃষ্ট দিক। বৌদ্ধউর্বর সমাজমনে, বৈষ্ণবের প্রেমের ভুবনে, সুফিদের উদারমানবতাবাদের যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ বাঙলায় বিরাজ করছিল তারই বহিঃপ্রকাশ হাসন রাজার গানের মর্মবাণীতে বিধৃত হয়েছে।

মোল্লা-মুন্সীর সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে হাসন। যে কোনো উদার মানসিকতা কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল ; যে কারণে সক্রেটিস, মনসুর হল্লাজ, লালন, নজরুল কায়েমীস্বার্থান্ধেদের কাছে প্রচণ্ড বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং অনেকের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে। হাসন রাজা তাঁর এক গানে বলেন :

'হাসন রাজায় কয়, নামাজ ছাইড়া দিছি
বেস্তে যাইবার ভয়।
নামাজ রোজা করলে বেস্তে যাইবেরে নিশ্চয়।
পরের মন্দ ছাড়িয়াছি দুজখেরি ডরে।
বেস্ত-দুজখ এরাফে প্রভু নিওনা গো মোরে॥

হাসন রাজা বেহেস্ত-দোজখ কোনোটিই চান না। এমন কি তিনি বেহেস্তে না যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য নামাজ রোজা ছেড়ে দিয়েছেন ; কেননা নামাজ-রোজা করলে নিশ্চিত তাঁকে বেহেস্তে যেতে হবে।

সুফিদের জিকির এবং বৈষ্ণবদের কীর্তনের যে আনুষ্ঠানিকতা তাতে কিন্তু এক ধরনের উম্মাদনা সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। জিকির বা কীর্তনে অংশ গ্রহণকারীরা অনেক সময়ই পাগল বা উম্মাদের মতো আচরণ করে। হাসন রাজা তার এক গানে বলেন :

পিরীতের মানুষ যারা, আউলা ঝাউলা হয়রে তারা।
হাসন রাজায় পিরীত করিয়া হইয়াছে বুদ্ধিহারা॥
হাসন রাজা আউলা হইয়ে, ডাকতে আছে মৌলা বলিয়ে।
নাচতে আছে ফালাইয়ে, হইয়ে প্রেম প্রিয়সীর মারা॥

এখানে পরমাত্মার সন্ধানী হাসন প্রায় উম্মাদ তার সানিদ্ধ্য পাবার প্রত্যাশায়। অনুরূপ আর একটি গানে পাই :

'বাউলা কে বানাইল রে হাসন রাজারে
বাউালা কে বানাইল রে।
বানাইল বানাইাল বাউালা তার নাম হয় মৌলা।
দেখিয়া তার রূপের চটক হাসন রাজা হইল আউলা।
হাসন রাজা হইছে পাগল প্রাণবন্ধের কারণে
বন্ধু বিনে হাসন রাজায় অন্য নাহি মানে॥

বাউল গানে সর্বদাই একটা বিতর্কের গন্ধ আছে। সুফিরাও তর্কের মধ্য দিয়ে ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াসী ছিলেন। সক্রেটিসকে হত্যা করা হয়েছিল লোকসাধারণের মধ্যে জীবন সম্পর্কে নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন এবং প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উসকে দেয়ার অজুহাতে। তিনি কিন্তু যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে গণমানুষের অধিকারের কথা, তাদের স্বাধীন জীবন নির্বাহের কথাই

লোকসাধারণের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা চার্বাকদের মধ্যেও একই প্রক্রিয়ার আভাস পাই। লোকায়তিকগণ শাস্ত্রীয় বক্তব্যের বৈষম্য, ভ্রান্তি, বিরোধীতা, অর্থহীনতা, অসঙ্গতিগুলি নির্দেশ করতেন। বাউলের মতে নামে বস্তুর গুণ থাকে না। লালন বর্খোজ বিনা নাম সাধনাকে বিফল বলেছেন। বীজ রোপণ না করে কেবল কথায় কৃষি হয় না, মিষ্টি দ্রব্যের নামে মুখ মিষ্টি হয় না, আলোর নাম করলেই দূর হয় না অন্ধকার। লালন বলেন :

না জেনে করণ-কারণ শুধু কথায় কি হবে।
কথায় যদি ফলে কৃষি, বীজ কেন রোপে॥
গুড় বললে কি মুখ মিষ্টি হয়
দ্বীপ না জ্বাললে আধার কি যায়
অমনি মতো আল্লাহ্ বলায়
আল্লাহ্ কি পাবে॥[৪০]

অর্থাৎ হরি নামে মেলে না হরি। লালন বলেন, 'বস্তু বিনে নামে কৌ পেট ভরে'। কবীর বলেছেন, 'রাম নাম উচ্চারণকারীরা রাম নামে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে বোঝেন'। বৃহস্পতির সমসময় থেকে অশাস্ত্রীয় শাণিত তর্কপ্রিয়তা ভারতী বস্তুবাদীদের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত হয়। বাউল ফতোয়ায় বাউলদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, 'ইহারা কোরানের আয়েতের বিপরীত অর্থ করে'। লোকচরিত্র অভিজ্ঞ বাউল এই ভাববাদী বিশ্বে আত্মরক্ষার জন্য রহস্যময়তার আবরণ সৃষ্টি করে। কখনও কখনও পাগলামির ভান করে মূলতত্ত্ব গোপন রেখে প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে। এ সম্পর্কে শক্তিনাথ ঝা লেখেন :

> সমস্ত বাউল দর্শন, সমাজ চিন্তা এবং সাহিত্য ভাববাদী দর্শন ও মূল্যবোধকে পূর্বপক্ষ হিসেবে রেখেই পরিকল্পিত হয়েছে। বাস্তবে শাস্ত্র ও ধর্মমতগুলি সমালোচনা করে বাউলকে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় ; আত্মপ্রসার করতে হয়। নিজস্ব ইতিবাচক দর্শনকে প্রকাশ্যে প্রচার করা যায় না ; তাই পরমত দূষণ ও খণ্ডনের নেতিবাচক পদ্ধতিগুলি বাউল সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। ইতিবাচক বক্তব্য সর্বদা অন্ত র্নিহিত পক্ষ। গুরুর কাছ থেকে প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিবাচক বাউল দর্শন লভ্য। এই বিচার বিতর্কের রীতি বাউল পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে,ভারতীয় ভাববাদ প্রবলতা লাভ করে, অভিনব এক ভঙ্গিতে বস্তুবাদ দর্শন ও নায়কদের আত্মসাৎ করেছে। শ্রদ্ধেয় বৃহস্পতি দেহবাদ অসুর ধ্বংসের জন্য ; বুদ্ধ হয়েছেন দসাবতারের অন্যতম ; নিরীশ্বর সাংখ্য ইত্যাদিকে দিয়ে বেদ স্বীকার করানো হয়েছে। ভাববাদী দর্শনের এই পরমত গ্রাসক্ষমতার সমধর্মী দৃষ্টান্ত বাউলদের মধ্যে পাওয়া যায়। বেদ, কোরান, ধর্মশাস্ত্রের স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করে, এ সমাজ নিজমত অনুকূলে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। কোরানের সমান্তরাল আর এক বাতেনী কোরাণ তারা গড়ে তুলেছে, নামাজ, রোজা, পূজার দেহবাদী ব্যাখ্যা করেছে, কৃষ্ণ, মহম্মদ, চৈতন্যাদির দেহসাধনার তথ্যাদি স্থাপন করেছে। বাহ্যিকভাবে যে কোনো ধর্মাচার, যে কোনো ভাববাদী বক্তব্য, অলৌকিকতা, সন্ন্যাসী ও পীরত্বের বাউল বিরোধিতা করে না, সবগুলিকে স্বীকার করে ক্রমাগত সে নিজের মতকে আবৃত করে চলে। বিশেষত লোকচরিত্র অভিজ্ঞ বাউল ভাববাদের এবং রহস্যময়তার আবরণ সৃষ্টি করে

আত্মরক্ষার বর্ম রচনা করে। অনেকে পাগলামির ভান করে। নিজের মতকে গোপন করা খাঁটি বাউলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ভাববাদী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার থেকেই বাউলের ভাববাদ প্রমাণিত হয় না। বরং এ ধরনের ভাববাদী শব্দাবলী নতুন ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত করেই বাউল ব্যবহার করে। এই রূপান্তরিত ব্যাখ্যা গুপ্ত।[৪১]

বাউল সমাজের কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের মহাবাণী হলো বর্তমান মানি, অনুমান মানি না। প্রত্যেক্ষ মানি, অদেখা মানি না। লালন বলেন, শুনতে নাই আন্দাজী কথা বর্তমান জান হেথা। দুদ্দু শাহ বলেন 'পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে, চক্ষু না দেয় অনুমানে।' সহজতত্ত্ব প্রকাশে মনুলাল মিশ্র বলেছেন যে, তাদের সত্য ধর্মে অনুমানের স্থান নেই, তারা বর্তমান পন্থি।

দেহেই ব্রহ্ম আছেন, তাকে দেখা যায় ;
তথাপি রাজের হল না সে জ্ঞান তাই ভাবে অনুমান
পরের কথা শুনবে কেনে পেলে বর্তমান (রাজের পদ)[৪২]

ফিকির চাঁদ (কাঙাল হরিনাথ মজুমদার) লিখেছেন, কল্পনায় রূপ দেখা যায় না, চোখ বন্ধ করলে কেবল অন্ধকার দেখা যায়। তাঁর মন্তব্য— 'যদি কল্পনা করে অরূপীয় রূপ দেখা যেত তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত কত কল্পনা করিত।'

বহুকালব্যাপী মানুষের খণ্ডিত উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতার সমন্বিত ফল দেহসাধনা তত্ত্ব। দশ ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব পৃথিবীর দেহ সাধকদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। দুদ্দু বলেছেন, 'দেহ ছাড়া জ্ঞান থাকে নাই', আকার ছাড়া সাকার না রয়, আকারেতে সাকার রয়', 'বস্তুকেই আত্মা বলা যায়। আত্মা কোন অলৌকিক বস্তু নয়'।

দিরুক্তি হলেও বলতে হয়, বাউল মত বাঙলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম, একান্ত ভাবেই বাঙালির মানস ফসল। বাঙালির লোকধর্মের উপাদানের সাথে যোগ, দেহবাদ, সুফি ও মরমিবাদের সংশ্রিণে এর উদ্ভব। বাঙালির উদার মানবিকতার এ এক পরম-সম্পদ। আরব-তুর্কি বিজয়ের পরে হিন্দু-মুসলমানের বিপরীতমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে, পরে উত্তর ভারতে এবং অবশেষে বাংলাদেশে প্রচলিত সমাজ কাঠামোয় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ আলোড়নের বাহ্যরূপ ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রয়াস। হিন্দুর মায়াবাদ ও তজ্জাত ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সুফিতত্ত্বই এসব আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের 'ভক্তিধর্ম' উত্তর ভারতের 'সন্তধর্ম' আর বাঙলার বৈষ্ণব ও বাউলমত সুফিবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মহিমা ভারতবাসী তথা বাঙালি-মানসে সেদিন যে আবেগ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল, তারই ফলে মন্দির ছেড়ে মসজিদের পথে না গিয়ে উদার আকাশের নিচে স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের এ নতুন প্রয়াস মাত্র। এ প্রয়াস অবশ্যই সুফিবাদের পেরণাজাত। তারা বুঝেছে যদিও 'হিন্দু ধাবই দেহরা মুসলমান মসীত'। সেখানে তো আল্লাহ নেই। কবীর ভাষায় তাঁদের মতে আল্লাহ বলছেন :

মো কহাঁ ঢুঁরো বন্দে মৈঁ তো তেরে পাসমে।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস মেঁ॥

জীবত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি। কাজেই আপন আত্মার পরিশুদ্ধিই আল্লাহ প্রাপ্তির উপায়। তাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাই এদের প্রাথমিক ব্রত। এঁদের আদর্শ হচ্ছে 'know theyself' আত্মনং বিদ্ধি–নিজেকে চেন। হাদিসের কথায় 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'। যে নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহকে চিনেছে। জীবনের পরম এবং চরম সাধনা নিজেকে চেনা। লালন বলেন :

যার আপন খবর আপনার হয় না।
আপনার আপনি চিনতে পারলে রে
যায় অচেনারে চেনা॥

সুফিতত্ত্বের সঙ্গে বাঙালির সাহিত্যক পরিচয় ঘটে প্রথমে রুমীর মসনভির মাধ্যমে এবং পরে হাফিজ প্রমুখের সৃষ্টির মাধ্যমে। ব্যবহারিক পরিচয় তো আগে থেকেই ঘটেছে। কেননা, ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রধানত সুফি-দরবেশ ও তাঁদের অনুচরদের মাধ্যমে। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতের অশোক, হর্ষবর্ধন, পরে আকবর প্রমুখ শাসক সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন। জাতিভেদ বিরোধী ছিল বৌদ্ধ, জৈন, বস্তুবাদী আজিবিক, আদিম জনজাতিগণ, লৌকিক তন্ত্র। মধ্যযুগের সংগঠিত ভক্তি আন্দোলন জাতিভেদ অগ্রাহ্য করেছিল। চার্বাক, বাঙলার কর্তাভজা, সাহেবধনী, খুশি বিশ্বাসী, মতুয়া, সহজিয়া বৈষ্ণব প্রভৃতি লোকায়ত গোষ্ঠী জতিভেদ বিরোধী আন্দোলন চালিয়েছেন। আব, আতস, খাক, বাদ এবং রজঃ বীজ/মূল বস্তুর সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত হয় মানবদেহ, প্রত্যেকটি মানব শিশু একই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় মাতৃজঠর থেকে জন্ম লাভ করে, বাতাস দ্বারা জীবন নির্বাহ করে। খাদ্য দ্বারা বড় হয়, পুষ্ট হয়, বেঁচে থেকে সুখ, শান্তি এবং আনন্দ ভোগ করতে চায়। প্রকৃতি-প্রতিবেশ জয়বায়ু ও পিতামাতার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বাহ্যিক আকার-আকৃতি, গায়ের রঙ সাদা কিম্বা কালো, উচ্চতা এবং সম্প্রদায়গত ও অবয়বগত পার্থক্য হয় মানুষে মানুষে। তাইতো বাউল কবি পাঞ্জু শাহ'র কণ্ঠে শুনি :

জেতের বড়াই কি/ ইহকাল পরকাল জেতে করে কি।
মনে বলে অগ্নি জ্বেলে দেব রে জেতের মুখি॥
এ জেতের বোঝা লয়ে মিছে মলাম বয়ে
চিরকাল কাটালাম আমি মানী মানুষ হয়ে,
মনের গৌরব কুলের গৌরব ধন্ধবাজী সব দেখি॥

ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদর পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে ওঠার জন্য বাউলেরা সাধনা করো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধকদের ও দার্শনিকদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারা সাম্য ও মানবতার বাণী প্রচার করে। তারা রুমী-হাফিজের

স্বগোত্র এবং কলন্দর, রামানন্দ, কবীব, দাদু ও রজ্জবের উত্তর সাধক। বাউল গুরু একাধারে কবি, দার্শনিক, মানবতাবাদী মরমি সাধক। তাদের গান লোকসাহিত্য মাত্র নয়– বাঙালির প্রাণের কথা, মনীষার ফসল ও সংস্কৃতিক স্বাক্ষর। চর্যাপদ, দোহা প্রভৃতি সব মরমিয়া রচনার মতো বাউলগানও সাধারণত রূপকের আবরণে আচ্ছাদিত। সে-রূপক দেহাধার, বাহ্যবস্তু ও ব্যবাহারিক জীবনের নানা কর্ম ও কর্মপ্রেচষ্টা থেকে সংগৃহীত। কারণ, 'all creation 's wonders excite the cry of love'. (Rumi)।

ইরানের সুফিমত ও ভারতের বেদান্ততত্ত্ব বাঙলার মাটিতে বাউলবাণীতে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছে। সুফি-বৈষ্ণবদের মতো গানের মাধ্যমেই বাউলদের সাধন-ভজন চলে, বাউল বলেন-'বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।' বাউল সাধনার মর্মকথা বাউলের ভাষায় এরূপ :

সখি গো, জন্ম মৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁহার সঙ্গে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এ উক্তির উৎকৃষ্টতম প্রকাশ ঘটেছে বাউলদের চিন্তা-ভাবনায়। এর প্রকাশ ঘটেছে বাউলদের শাস্ত্রবিমুখতায়, তাদের গুরুবাদে এবং চারিচন্দ্রভেদ সাধনায়। বাউলদের শাস্ত্রবিমুখতার দিকটি তলিয়ে দেখলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, বাউলদের নিকট তত্ত্বের জন্য মানুষ নয়। তাদের মতে মানুষ কোনো তত্ত্ব বা শাস্ত্রের অধীন নয়। শাস্ত্র কখনও মানুষের উপর স্থান পেতে পারে না। মানুষ সাধনার দ্বারা নিজেকে জানবে এবং এই নিজেকে জানা ও উপলব্ধি করার মাধ্যমে প্রকৃত আত্মার সন্ধান পাবে। বাউল পদ্মলোচন বলেন যে, মানুষের হৃদয়বিহারী গোঁসাই স্বয়ং পুরাণের বাইরের একটি নতুন পথের খবর মানুষকে দেন :

ও সে বেদের করণ ওলট-পালট করে
নতুন পথের খবর দিয়েছেন মোদেরে।
জীবে লাগিয়ে ধান্দা করিল বান্দা
বস্তা-বন্দী বেদ-পুরাণেরে।

তাহলে মানুষ মানুষকে পথ দেখাতে পারে। বাউলদের গুরুবাদে এ বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। গুরুকে বাউলরা দুইভাবে কল্পনা করেন। মানুষ রূপে এবং মানুষরূপী ঈশ্বররূপে। গুরু বা মুরশিদ যে এ জগতে পরম সম্পদ এবং ইশ্বর স্বয়ং যে গুরুর রূপে শিষ্যকে সাধন পথে পরিচালিত করেন বাউলদের তেমনি বিশ্বাস। তবে এ ইশ্বর বেদের ইশ্বর নন, বা মানুষ বহির্ভূত কোনো সত্তা নয়। মানুষই

সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরত্ব লাভ করে, গুরু রূপে অন্যদের শিষ্যত্ব প্রদান করে সিদ্ধির পথ দেখাতে পারে। তখন গুরুর রূপ কি হয় সে সম্বন্ধে লালন বলেন :

গুরু রূপে ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
ও তার কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জানিত করে।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ জ্ঞান করা বাউল মানে না। তাই ত তাদের গানে পাই, জগত বেড়ে জাতির কথা/ লোকে গৌরব করে, যথাযথা/লালন বলে জাতির ফাতা/ডুবাইছি সাধ- বাজারে। অথবা প্রশ্ন- 'যখন তুমি ভবে এলে/তখন তুমি কি জাত ছিলে/কি জাত হবা যাবার কালে/সেই কথা কেনো বল না।'

পথের পার্থক্য, মতের অনৈক্য এবং সাধন পদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও বাউল, বৈষ্ণব ও সুফিদের মধ্যে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পরিমাণগত মিল বর্তমান। তাই একের বাণীতে অপরের মনের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এক চরমক্ষণে দেহাধারস্থিত আত্মায় পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তখন পরমকে উপলব্ধির আনন্দে সবাই একই সুরে বলে 'আনল হল' কিংবা সোহম। এই অদ্বৈতসিদ্ধি আমরা বাউলে-বৈষ্ণবে ও সুফিতে প্রত্যক্ষ করি। রাগাত্মিকা ভক্তিতে শুনি মুই সেই, সুফিরাও বলেন আনল হক, বাউল বলেন, দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ, ডাকলে কথা কয়। বাউল যেমন বলেন :

এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন।
এই মানুষে রঙ্গে-রসে বিরাজ করে সাঁই আমার।
ক্ষেপা, তুই না জেনে... তোর আপন খবর যাবি কোথায়
অথবা আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধাঁয়
আমি যেরূপ দেখনা সেরূপ দীন দয়াময়। কিংবা
ডুবে দেখ দেখি মন তারে—কিরূপ লীলাময়,
যারে আকাশ-পাতাল খোঁজ এই দেহে তিনি রয়।...

রবীন্দ্রনাথও বলেন :

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
(আমি) তাই হেরি তায় সকল খানে।'
কিংবা—
আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় পানে চাই নি।
অথবা আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

এমন বোধেরই গাঢ়তায় জীবাত্মা-পরমাত্মার ব্যবধান ঘুচে যায়। ইরানের সুফিদের ও ভারতের বেদান্তত্তত্ত্ব বাঙলার মাটিতে বাউলবাণীতে প্রত্যড়্গা বিরাজ করছে। সুফি- বৈষ্ণবদের মত গানের মাধ্যমেই বাউলদের সাধন-ভজন চলে :

'বীণার নামাজ তারে তারে
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।'[৪৩]

প্রাতিষ্ঠানিক সব ধর্মই স্বর্গের লোভ ও নরকের ভয় দেখায়। ওমর খৈয়াম এগুলোকে খোসগল্প এবং ঘুম পাড়ানো কল্পনা বলেছেন। বাউল সুস্থ নীরোগ শরীর, দীর্ঘ জীবন এবং স্বাধীনতার পরিবেশকেই স্বর্গ, আনন্দকে মোক্ষ বলে মনে করেছে। দেহবাদ অনিবার্যভাবেই তাকে ইহবাদী করে তুলেছে। লালন পরলোকে বিশ্বাসী নন ; 'মলে গুরুপ্রাপ্ত হবো সে তো কথার কথা'। লালন ইহজীবনে সবকিছু জানতে চান। তিনি বলেন :

সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে ।
পাবি রে অমূল্য নিধি বর্তমানে॥
ভজ মানুষের চরণ দুটি, নিত্যবস্তু পাবে খাঁটি
মলে হবে সকল মাটি, ত্বরায় এভেদ লও জেনে॥
মলে পাব বেহেস্তখানা তা শুনে তো মন মানে না।
বাকির লোভে নগদ পাওনা
কে ছাড়ে এই ভুবনে॥

বস্তুবাদীর সার্থক উত্তর পুরুষ লালন। পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় বাউল ধারণাটিও বস্তুবাদী। বৃহস্পতি সূত্রে কথিত হয়েছে 'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়'। কোনো মানুষকে দুঃখ দেয়া বা তাদের ক্ষতি করা সাধারণত অনুচিত বিবেচনা করে বাউল। কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য যে কোনো কাজ করা অন্যায় নয়। শাস্ত্রীয় ধর্মাচার, সামাজিক অর্থহীন মূল্যবোধ অগ্রাহ্য করলে কোনো পাপ হয় না।

লৌকিক রাজা বা শাসন কর্তরূপী ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে প্রাচীন বস্তুবাদীদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু জগতের একজন স্রষ্টা বা কর্তা আছেন এ তত্ত্ব বস্তুবাদ অস্বীকার করেছিল। বাউল সমাজে ও সাহিত্যে ঈশ্বর, আল্লা, সাঁই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ সত্তাগুলো অস্তিত্ববান। দেহ বিশ্লেষণ করে দেহস্থ মূলবস্তু নির্ণয় করেছে তারা। লোকায়ত সূত্র :'শরীর মিদং মৈথুনাদেবোদভূতম ; শোণিতশুক্র পুরুষো মাতাপিতৃ নিমিত্তিক'। অবিকল এ জীব জন্মের প্রক্রিয়া বাউল সৃষ্টি ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন। বাউল মতে মানবজীবন দেব দুর্লভ। অপর পক্ষে ভারতীয় ভাববাদ ইহজীবন, দেহ, ইন্দ্রিয়ের কোনো মর্যাদা দেয় নি। মর্তজীবন পাপ স্খলনের পর্ব, যথার্থ সুখ স্বর্গে নির্দেশিত। অথচ ইহলোকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বস্তুবাদের মূল লক্ষ্য। বসরার বিশ্বাসী ভ্রাতৃবৃন্দ বেঁচে থাকাই মহত্তম আনন্দ বলে মনে করেছিলেন। ভারতীয় বস্তুবাদে নির্মল, উদার সুখবাদ গৃহীত হয়েছিল এবং চারুকলা, গান প্রভৃতি ৬৪টি কলার চর্চা, মানসিক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখগুলো স্বীকৃত হয়েছিল।

বাউলদের মনের মানুষ, মনুরা, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, ভাবের মানুষ বা অলখ সাঁই- এর সঙ্গে আদিবুদ্ধ, আদিনাথ, বোধিচিত্ত ও সচ্চিদানন্দতত্ত্বের মৌলিক ঐক্য রয়েছে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে হিন্দু-বাউলদের অনেক ব্যাপারেই সাদৃশ্য

রয়েছে। বিভিন্ন গুরুর মত বা নামানুসারে এরা বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বা সমাজে বিভক্ত, যথা কর্তাভজা, কিশোরী ভজা, বলরাম, শম্ভুচাঁদী প্রভৃতি। মুসলমান বাউলরা নেড়ার ফকির, আউল, সাঁই, হজরত, দরবেশ প্রভৃতি নামে পরিচিত ও বিভিন্ন গুরুপন্থি সমাজে বিভক্ত। দেহ নিরপেক্ষ আত্মার স্থিতি সম্ভব নয়, কাজেই দেহাধারেই আত্মাকে খুঁজতে হবে। এই ধারণা দেহতত্ত্বে আগ্রহ জাগিয়েছে। ফলে দেহের চর্চা ও দেহ সম্বন্ধীয় তথ্য উদঘাটন আবশ্যিক হয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাউল মত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে হয়েছে বাউল সম্প্রদায়, তাই পরমতসহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনের ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এদের বৈশিষ্ট্য।[৪৪]

বাউল ছিল ইন্দ্রিয় দমন বিরোধী। আবার নির্বিচার ইন্দ্রিয় চর্চা জীবাচার বিরোধী এতে আসে ক্ষয়, মৃত্যু, জরা। তাই দেহমিলন তত্ত্বের গুপ্তবিদ্যা সে শিক্ষা করে। গান ও অন্যান্য কলার চর্চা বাউলের পরম আনন্দ। মানসিক সুখ তার প্রার্থিত। দুদ্দু বলেছেন 'আত্মসুখ ব্যভিচার'। অন্যকে সুখ দেয়া ; অন্যকে সুখের অংশ দেয়া বাস্তবে বাউল অনুশীলন করে। নরনারীর স্বাধীন মিলনের সে সমর্থক, আনন্দই মনুষ্য জন্মের স্বাধীন অধিকার। নারী বাউল পন্থায় পূজার্হা। তার সেবা, সুখবিধান জীবনের কর্তব্য বলে বাউল মনে করে। ভারতীয় দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যগুলো বাউল দর্শনে অভিব্যক্ত হয়েছে। বেদ, পরলোক, ঈশ্বর, জাতিভেদ এসবই বাউল মতে প্রত্যখ্যাত হয়েছে। লালন নিজেকে 'বস্তু ভিখারী' বলেছেন। বাউল সমাজের সাধনাটি বস্তু-সাধনা, গানে 'বস্তুরক্ষা', 'বস্তুবাদী' শব্দগুলির বহুল ব্যবহার আছে। সে ধর্মাচার লঙ্ঘন করে। পুরোহিত, অনুমান অগ্রাহ্য করে। পুনর্জন্ম, পরলোক, পাপ-পুণ্যের দর্শনে সে অবিশ্বাসী। দুদ্দু শাহ বলেন :

> বস্তুবাদী বাউল আদ্য কেহ কেহ হয়
> না করে অনুমান ভজন করে না মুক্তির অন্বেষণ
> জীবনই সত্য নিরূপণ দীন দুদ্দু জানায়।

লালনের প্রভাবে বাঙলায় কালক্রমে শত শত বাউল কবির জন্ম হয়েছে এবং তারা রচনা করেছে সহস্র বাউল গান। বাউল গানের প্রভাব পড়েছে মুর্শিদি, মারফতি-মাইজভাণ্ডারি গানে ; ধুয়া-জারি, দেহতত্ত্বসহ এমন কি ভাটিয়ালি গানেও বাউলের প্রভাব কম-বেশি প্রতিফলত হয়েছে। বাউল গান বাঙলায় বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদার আবহ এনে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্ম ভেদ, সম্প্রদায় ভেদ যে জাতিভেদ নয় ; পৃথিবীর সকল মানুষ যে এক ও অভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্য একথা বাউল গানের মূল সুর।

মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সাম্যের বাণী, মানবহিতৈষণার বাণী বাউলরা বিগত কয়েক শতক ধরে প্রচার করছে। তাদের জীবনাচারও উদার মানবতাবাদের অনুষঙ্গি। এ কারণেই বাঙলার মানুষ আজও ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শান্তি ও

বিরোধহীন অবস্থায় একত্রে বসবাস করার আশা পোষণ করে এবং সাধারণ মানুষের মনে এখনও ঔদার্যভাব লক্ষ্য করা যায়। অদূরভবিষ্যতে বাউল সাধনার অবস্থান কি হবে জানা না গেলেও তারা ইতোমধ্যে বাঙলার মানসভুবনে মানবতাবাদের যে ভিত নির্মাণ করেছে, মানবতাবাদের যে বীজ তারা বপন করেছে, আমাদের লোকসমাজ এবং লোকধর্মকে যে উজ্জ্বলতা দান করেছে, তার আলকবর্তিকা আমাদের লৌকিক ঐতিহ্য হিসেবে যে দীর্ঘকাল বিরাজ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।'[৪৫]

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষের মতো বাউল রয়েছে। ওয়াহাবী-ফরায়েজি ও আহলে হাদিস আন্দোলনের ফলে মুসলমান বাউলের অনেকে উনিশ-বিশ শতকে শরীয়তি ইসলামে ফিরে এসেছে, তেমনি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু বাউল-সন্তানও ব্রাহ্মণ্য আচার বরণ করেছে। নইলে বাংলার বিশেষ করে মধ্য, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের, এক কথায় পদ্মার ওপারের নিম্নশ্রেণীর বাঙালির মধ্যে বাউলের সংখ্যা নগণ্য ছিল না।[৪৬]

এদেশে ইসলাম বিস্তারের সূচনা থেকে হিন্দু-মুসলিম এ উভয় সম্প্রদায়কে একই আদর্শের আলোকে পরিচালনা করার সাধনা দেখা দিয়েছিল। সে সাধনা কবীর, নানক, চৈতন্যদেব, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যে বিভিন্ন রূপে পরিগ্রহ করে। ধর্মীয় জগতে এসব মহামানবের সাধনা হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ছিল। বস্তুতঃপক্ষে এ সাধক দল পাণ্ডিত্যের গভীরে না পৌঁছেও তাঁরা এদেশের জনসাধারণের মনে যে ঐক্য-চেতনার দানা বাঁধতে সমর্থ হয়েছিলেন তা তাঁদের গভীর মানব-প্রীতিরই নিদর্শন।

এসব সাধু-সন্ত হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষ যে এক খোদার সৃষ্টি এ সত্য জনমনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সব সম্প্রদায়ে শাস্ত্রীয় আচারসর্বস্ব মতবাদ পরিত্যাগ করে তার মূল সূত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল শাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়, বিধানের চেয়ে মানুষ বড়। সংঘাত নয়, ধ্বংস নয়, শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য আমরা সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে এসব সাধু-সন্তের আরাধ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে পারি। লালন, দুদ্দু, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ বাউল কবির জীবন সাধনার অনুসরণে আমরা যদি সব কিছুর উর্ধে মানুষকে স্থান দিতে সক্ষম হই তাহলে বর্তমান সমাজের হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি অনেক কমে যাবে যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যনির্দেশ

১. খোন্দকার রিয়াজুল হক, মরমি কবি পাঞ্জুশাহ : জীবন ও কাব্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, (প্রথম প্রকাশ ১৯৯০), পৃ. ২৮১

২. এস. এম. লুৎফর রহমান, বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান, ঢাকা : ধরনী সাহিত্য সংঘ, (প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ২২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, দ্বিতীয় সংস্করণ, (কোলকাতা : নববর্ষ, ১৩৭৮), পৃ. ১৩২
৫. আবুল আহসান চৌধুরী, সমাজ সমকাল ও লালন সাঁই, কোলকাতা : কথা ছাপা, (১ম প্রকাশ ১৯৯৯), পৃ. ২৫
৬. এস. এম. লুৎফর রহমান, লালন শাহ : জীবন ও গান, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, (১ম প্রকাশ), নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৭৩.
৭. সুধীর চক্রবর্তী, বাউল ফকির কথা, (কলকাতা, মার্চ, ২০০২), পৃ. ৫৭-৫৮
৮. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (তৃতীয় খণ্ড), ২য় পর্ব, ১৯৮১, পৃ.৩৩৭
৯. খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
১০. তপন কুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১১. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
১২. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭
১৩. ঐ, পৃ. ৩১৮
১৪. তৃপ্তি ব্রহ্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
১৫. আবুল আহসান চৌধুরী, লালন শাহ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৩ ও ১৬
১৬. নৃত্যবিদ শ্রীমনি বর্ধন, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য, পৃ. ১৪
১৭. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১৮. সুধীর চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
১৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
২০ সুধীর চক্রবর্তী, বাউল ফকির কথা, কোলকাতা, পৃ. ৮০
২১. শক্তিনাথ ঝা, বস্তুবাদী বাউল, কোলকাতা, ১৯৯৯
২২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
২৩. আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২৪. এস. এম. লুৎফর রহমান, লালন জিজ্ঞাসা, ধারণী সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪, পৃ. ১৮-১৯
২৫. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ১৫
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২৭. খোন্দকার রিয়াজুল হক, মরমি কবি লালন শাহ : জীবন ও সঙ্গীত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ৩০২, ৩২০
২৮. খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৩০. মোহাম্মদ এন্তাজ উদ্দীন, বাঙলার পঞ্চগুরুর ভাবসঙ্গীত, ঢাকা : পড়শী প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৪১
৩১. শক্তিনাথ ঝা, বস্তুবাদী বাউল, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, (কোলকাতা : ১৯৯৯) পৃ. ৪৪৪
৩২. শক্তিনাথ ঝা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬
৩৫. মোহাম্মদ এন্তাজ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৬. শক্তিনাথ ঝা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭
৩৭. আবুল আহসান চৌধুরী, সমাজ সমকাল ও লালন সাঁই, কথাছাপা, (কোলকাতা : ১৯৯৯) পৃ. ২১
৩৮. খোন্দকার বিরাজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০
৩৯. আহমদ শরীফ, বাউলতত্ত্ব, পড়ুয়া, ২০০৩, পৃ. ৫৭
৪০ শক্তিনাথ ঝা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৬০
৪১. প্রাগুক্ত, ৪৬১
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১
৪৩. আহমদ শরীফ, বাউলতত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬
৪৪. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ১ম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ ১৯৯৯, পৃ. ৩৭৮
৪৫ আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২
৪৬. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

সুফি-বৈষ্ণব-বাউল চিন্তা : বাংলা সাহিত্যের প্রসারণ

সুফি, বৈষ্ণব ও বাউল সাধনার প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের নিম্নোক্ত তিনটি ধারা সূচিত হয়।

১. চৈতন্য, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দের প্রভাবে রচিত হয় সুবিশাল বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনচরিতমূলক সাহিত্য।

২. সুফিবাদ, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, যোগ-প্রেম ভক্তি ও মরমি প্রভাবের সমন্বিত প্রেরণায় মধ্যযুগে রচিত হয় পুথি, দোভাষী পুথি; সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় রচিত কাব্যসমূহের অনুবাদ, রোমান্টিক প্রণয়ন উপাখ্যান, আরবি ফার্সি রূপকথা ও কাহিনী কাব্যের ভাষান্তর এবং বিপুল বিশাল মধ্যযুগের পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কাব্য সাহিত্য।

৩. বাউল সাধনার প্রভাবে উদ্ভূত হয় বাউল গান, মুর্শিদি-মারফতি-মাইজভাণ্ডারি গান এবং উদার মানবতাবাদী আধুনিক সাহিত্য।

মধ্যযুগে বাঙলার পির পূজা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পিরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সত্যপির, গাজিপির, মানিকপির, খোয়াজপির, বড়পির, বদর পির, মাদারিপির প্রমুখ। পিরবাদের উৎস সপ্তম অষ্টম শতকের ইরান, ইরাক ও সিরিয়া। ইসলামের সুফিবাদের উদ্ভবের ফলে ধর্মাচরণের আনুষ্ঠিনাকিতা কিঞ্চিৎ শিথিল হয়; স্রষ্টা ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে ভয়-ভীতি দূর হয়; প্রেম এবং ভক্তির প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক 'আশেক' ও 'মাশেক' অর্থাৎ স্রষ্টার সাথে প্রেমাস্পদের সম্পর্ক কল্পিত হয়। যোগ, ভক্তি ও প্রেমসিক্ত ভারতবর্ষের উর্বর ভূমিতে পির-দরবেশ, সুফি-সাধক কর্তৃক বাহিত ইসলামের এই নব্য ধর্মতত্ত্বের মেলবন্ধন সাধিত হয়। সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাঙলায় এই ধর্মতত্ত্ব এত দ্রুত প্রসারিত হয় যে এটা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে সুফিদের এই উদারনৈতিক মানবতাদকে যেন বাঙলা পূর্ব থেকেই হাতছানি দিয়ে আসছিল।

বাঙলার বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া ও নাথপন্থিদের যোগ-তপস্যা, কঠিন আত্মনিগ্রহমূলক বৈরাগ্য এবং তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ পুরুষের অতিলৌকিক ক্ষমতার কল্পকথা প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির মানসে দৃঢ়মূল ছিল। প্রচলিত ধর্ম সংঘের বিরুদ্ধে উদ্ভূত সহজিয়া পন্থা সেকালে শুধু বাঙলায় নয় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করেছিল। সুফি দরবেশদের হালকায়ে জিকির, বাদ্যসহকারে নৃত্য-গীত এবং 'ঘূর্ণায়মান দরবেশ'-এর সঙ্গে নাথসিদ্ধাদর নৃত্যগীতের তুলনা চলে। মীননাথের সম্মুখে গোরখনাথ 'নাটুয়ার' ছদ্মবেশে নৃত্যগীতি করেছিলেন। 'গোপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে' 'কফির ও যোগী' সমার্থক রূপে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। আমাদের লোকমানস নাথপন্থার সঙ্গে সুফিতত্ত্বের এক দার্শনিক যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিল। সুফিদের হালকায়ে জিকির ও ধ্যানমগ্নতায় আত্মার নানা রূপ দর্শনের সঙ্গে বাঙালির নিজস্ব দর্শন সংখ্য-যোগ-তন্ত্রের একটি গভীর মিল আছে। আবার কায়সাধনার যে রীতি সুফিবাদে প্রত্যক্ষ করা যায়, তার সঙ্গেও সিদ্ধাচার্যদের কায়াভাবনার মিল দেখা যায়। সব মিলে দেখা যায় সুফিবাদ বাঙলায় খুঁজে পায় তার সর্বশ্রেষ্ঠ উর্বরভূমি-যে বাঙলা মানবতাবদের এই উদারনৈতিক মতাদর্শকে সুস্বাগত জানায়-এবং বাংলা এই মতবাদকে তার নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার সাধনায় লিপ্ত হয়। আমরা বাঙলা সাহিত্যের যে তিনটি ধারাক্রম নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি তার সবগুলো উপর্যুক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত। বাঙলার যোগ-সাংখ্য, প্রেমভক্তি সুফি ও মরমি দর্শন হাজার বছরের সাহিত্য সাধনার মানবীয় উপাদান হিসেবে প্রযুক্ত হয়।

বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনচরিতমূলক সাহিত্য : বৈষ্ণ পদাবলী চৈতন্য পূর্ব যুগেও ছিল। তবে বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফিবাদের প্রেমাসক্তির ব্যাপক সংবিশ্রণের ফলে সৃষ্ট নব-বৈষ্ণব পদাবলী নতুন চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং তা নানা মাত্রায় বিকশিত ও পল্লবিত হতে থাকে। বিশেষত চৈতন্য দেবের পদাবলী প্রীতিতে এবং তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের পদাবলীর প্রতিঅনুরাগে এ সংগীত-ধারা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রাধাসহ গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দের রাধা প্রথম বারের মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত প্রণয়িনী হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। রহস্যমূলক ধর্মপদ্ধতির অধিকাংশই পরম সত্তার পুরুষ ও স্ত্রী রুপের মূলনীতির উপর অধিষ্ঠিত। হিন্দু-তন্ত্রসমূহ শিব ও শক্তি এবং বৌদ্ধতন্ত্রসমূহে প্রজ্ঞা ও উপায় এগুলির প্রতিনিধি। গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সুমধুর কবিতাগুলি নিশ্চয়ই রাধাকৃষ্ণ ধর্শপদ্ধতিতে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এর উত্তরকালীন পুনরুত্থানের প্রতীক হয়েছিলেন চৈতন্য; যিনি তার নিজের মধ্যে প্রকৃতি সত্তার ধারা এবং কৃষ্ণ উভয় দিকই উপলব্ধি করেছিলেন। এটা লক্ষ করা চিত্তাকর্ষক যে বিদ্যাপতি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতা চৈতন্যকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম থেকে বাঙলায় মধ্যযুগে বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শন ও সাধনার উদ্ভব হয়েছিল। বাউলদের আধ্যাত্ম সাধনায় মিথুন ক্রিয়া ও হটযোগ বৌদ্ধ সহযান থেকে এসেছে। এই বৌদ্ধ সহযানের উৎপত্তি মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম থেকে। 'সহজ অর্থাৎ সাধ্য বা আয়ত্তাধীন। এক কথায় এদের সাধ্যও সহজ সাধনাও সহজ। আবার সহজ মানে সহজ বা সাধারণ নয়। সহজ মানে যা স্বাভাবিক।

প্রথমত, সহজ স্বরূপের উপলব্ধি করে মাহসুখে মগ্ন হতে হবে এ হলো সহজিয়া সাধকদের মূল কথা আর এ জন্যই তারা সহজিয়া। দ্বিতীয়ত, তারা সাধনার জন্য কোনো বক্রপথ অবলম্বন করেন না এবং গ্রহণ করেন সরল সোজাপথ-এজন্যও তারা সহজিয়া। তারা সহজানন্দকেই বলেছেন, 'মহাসুখ' নির্বাণ অর্থাৎ হৃদয়ের আগুন নিভিয়ে ফেলা-নির্বাণই মহাসুখ-মহাসুখই নির্বাণ। সহজিয়াদের সাধনা তান্ত্রিক সাধনা। এই তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির সঙ্গে যোগধর্মের সংযোগ প্রকট। যোগসাধনা নিরীশ্বরবাদী সাধনা; এ সাধন প্রণালীতে দেহ ও মন ছাড়া কোনো উপকরণ প্রয়োজন হয় না। যোগসাধনার মাধ্যমে অসাধ্য সাধন করা নাথ ধর্মেরও মূল লক্ষ্য। নিরীশ্বরবাদী এই নাথ ধর্ম বাঙলায় নিজস্ব আত্মচেতনার ফল। বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব সহজিয়া ও ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে এসেও নাথধর্মের নিরীশ্বরবাদী চরিত্রের কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি।

যোগধর্ম সর্বপ্রথম বৌদ্ধ প্রভাবিত হয় কারণ বৌদ্ধধর্ম ও যোগধর্ম উভয়ই নিরীশ্বরবাদী। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ সহজিয়া থেকে বৈষ্ণব সহজিয়ার উদ্ভব ঘটে। উদ্ভবকালে বৈষ্ণব সহজিয়া ছিল নিরীশ্ববাদী। চৈতন্য দেবের প্রভাবে সহজ সাধনায় ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ ঘটে। পুরানোক্ত বিষ্ণু দেবতা ছিলেন সৌর দেবতা। পরবর্তী পর্যায়ে বিষ্ণু উপাসনার নানামাত্রা আমরা ভারতবর্ষে দেখতে পাই। বিষ্ণু উপাসনাকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি। খ্রিস্টীয় ৪০০-৭০০ শতকের মধ্যে বাঙলায় বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত হয়েছিল। কৃষ্ণ কাহিনী ছিল সে কালের বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। কৃষ্ণের শক্তি হিসেবেই রাধা উদ্ভূত হয়েছিলেন।

চৈতন্যের আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩৩) পূর্বেই ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্ম থেকে পৃথক সত্তা হিসেবে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতির নিজস্ব পরিমণ্ডলে। উৎপত্তির মূলে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ সহজিয়া। এই সঙ্গে যোগযন্ত্র সুফি ও মরমি প্রভাবও ছিল। এটা হলো বাঙলার বৈষ্ণব-যা চৈতন্যের প্রভাবে ব্যাপকভাবে পল্লবিত হয়। পরবর্তীকালে প্রচলিত সহজিয়া বৈষ্ণবে ঈশ্বরের ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনার মূলকথা, 'দেহরূপ' ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সব তত্ত্ব নিহিত। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনার একথাই বৈষ্ণব সহজিয়াদের মূলতত্ত্ব। তাদের মতে এদেহের মধ্যেই সহজ প্রেমরূপে পরম সত্তা বিরাজ করছে। সহজিয়াদের

প্রেমই পরমার্থ সত্য। প্রেমই জীবনের এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্যসব বস্তুর 'সহজস্বরূপ'। যৌগিক পদ্ধতি ও ক্রিয়ার দ্বারা স্বাভাবিক কামকে দমন করে প্রেমে পরিণত করা এবং তখনই মহাসুখ লাভ করা যায় ও সহজানন্দ অনুভব করা যায়-তা-ই পরকীয়া প্রেম ও সহজ সাধনার মূল কথা। আসলে বৌদ্ধধর্মের সহজদর্শন পরিবর্তিত রূপে বৈষ্ণবের সহজধর্মকে নতুন ও ভিন্নতর খাতে প্রভাবিত করে দিয়েছিল, ফলে রাধাকৃষ্ণের গান, পরকীয়া প্রেম দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বৈষ্ণবের মানব প্রেম ও মানব লীলা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, চণ্ডীদাসের "সবার উপরে মানুষ সত্য" ই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। সহজিয়া বৈষ্ণবের কাছে তাই রাধাকৃষ্ণ দেবলোকবাসী কোনো দেব-দেবী নয়; বরং তারা সাধনার মানব-মানবী।

চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা হলো প্রেমানুরাগ, জীবাত্মারূপী রাধার সঙ্গে পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের মিলন-এ হলো প্রেম ধর্মের কথা। কৃষ্ণ স্বয়ং ভাগবান, রাধা তাঁর প্রণয়িনী, অতএব রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন। অতএব রাধাকৃষ্ণ লোক-মানব এবং তাদের লোকলীলা ও লৌকিক কাহিনী বৈষ্ণবের প্রাণবস্তু।[১] বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের উৎসমূলে ছিল মানব মনের স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতায় এবং এ ধর্মের সাথে জুটেছিল মহাযান মতের ভক্তি প্রাবল্য ও সুফি-মরমিবাদের প্রেমাসক্তি। চৈতন্যের আবির্ভাব কেবল ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনেও এক বৈপ্লবিক ঘটনা। চৈতন্যের বৈষ্ণব তত্ত্বকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিরা রচনা করেন পদাবলী গান। বৈষ্ণবদের কীর্তনের জন্য এ গান রচিত হলেও প্রেমমূলক গীতি কবিতা হিসাবেও এর মূল্য অসাধারণ। চৈতন্যদের ঈশ্বররূপে কল্পনা করে ও বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য প্রশংসামূলক জীবনী রচনা বাংলা সাহিত্য ধারার অনন্য বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকৃত। বৈষ্ণব তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের যে নতুন ধারার সৃষ্টি হয় তা বাঙলা সাহিত্যে 'চৈতন্য যুগ' বলে আখ্যায়িত।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের দৃষ্টান্ত কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যের জীবনকাহিনী অবলম্বনে বাঙলায় যে বিপুল পরিমাণ গীত-সাহিত্য রচনা হয় তাই পদাবলী বা বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিত। পদ বলতে বোঝায় গান, গাইবার জন্য যে রচিত তাই পদ। পদ সমষ্টি এই অর্থে পদাবলী কথাট ব্যবহৃত। পদাবলীর রচয়িতারা বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন এবং বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্র পদাবলী রচনার ভিত্তি ছিল বলে একে বৈষ্ণব পদাবলী বলা হয়। কীর্তনে পরিশীলিত সংগীতের রাগরাগিণী কিছুটা অপসৃত হলেও দেশী রাগরাগিণীর প্রধান্য রয়েছে। তবে দেশী রাগরাগিণীর এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিণীর মিশ্রণের ফলে কীর্তনের এক সমন্বিত সাঙ্গীতিকরূপ গড়ে উঠেছে। ফলে বাঙলার সংগীত ধারায় কীর্তন এক বিশিষ্ট ধারা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বলা চলে কীর্তন বাংলা লোকগীতির চারিত্ররূপের কাছাকাছি এক উজ্জ্বলতম সংগীত ধারা।

কীর্তনকে পদাবলী কীর্তনও বলা হয়। কীর্তন বলতে প্রধানত বোঝায় রাধাকৃষ্ণ, ব্রজলীলা ও চৈতন্যের জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত পদ। এ অর্থেই পদাবলী কীর্তন কথাটি ব্যবহৃত হয়। চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে পদাবলীর উদ্ভব ঘটলেও চৈতন্যদেবের প্রভাববেই এর ব্যাপক অনুশীলন ও প্রসার ঘটে। চৈতন্যের সর্বগ্রাসী কৃষ্ণ চেতনা জীবন ও জগতের মধ্যে যে ঐক্য ও ছন্দ আবিষ্কার করে, তা সনাতন ধ্রুপদী ধর্মচেতনার বিরুদ্ধে এক যুগজয়ী বিদ্রোহ। চৈতন্যের ধর্মসাধনার প্রভাবেই বাঙলা সাহিত্যে চরিতাখ্যান, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাস্ত্র গ্রন্থের এক সুবিস্তৃত ধারার জন্ম হয়। একজন যুগন্ধর মানুষের জীবন অবলম্বনপূর্বক কাব্য রচনার কোনো দৃষ্টান্ত এবং চরিতাখ্যান রচনার নজির ইতোপূর্বে ছিল না।[২]

চৈতন্য বৈষ্ণব সহজিয়া মতাবাদের উদ্গাতা। বাঙলা সাহিত্যের তাঁর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর চিন্তাদর্শে অণুপ্রাণিত জীবনচরিতমূলক সাহিত্য; পদাবলী ও নাট্য রচনা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বস্তুত তাঁর জীবন ও চিন্তাদর্শ, প্রেম ও ভক্তির প্রেরণা এদেশের সংস্কৃতির ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চৈতন্য অনুসারী বিভিন্ন সাধকের আত্মগত গুণাবলীও বিস্ময়কর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, রূপ সনাতনের অকুণ্ঠিত শাস্ত্রজ্ঞান, ঐকান্তিক সেবা নিষ্ঠা এবং হরিদাসের অলৌকিক প্রেমোন্মাদনা জনসাধারণের মনে চৈতন্যের আদর্শকে আরো সমুজ্জ্বল হতে সাহায্য করেছে।

জীবনকালেই চৈতন্য অবতার রূপে গৃহীত হয়েছিলেন,-কখনও পুরুষ অবতার, কখনও বা প্রকৃতিস্বরূপ, সমকাল তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছে পুরুষ প্রকৃতির অবতার হিসেবে। চৈতন্যচরিতাকারদের কাছে তাই চৈতন্য বন্দনা ঈশ্বর বন্দনারই নামান্তর। এ ধরনের জীবনী কাব্যে সচরাচর ভক্তের আবেগের সঙ্গে সমকালীন জনমানসের দৃষ্টিভঙ্গিও মিশ্রিত থাকে। চৈতন্য চরিতাখ্যান রচনায়ও তাই ঘটেছে। তার মধ্যে কতকটা অলক্ষ্যেই যেন সমকালের নানা চিত্র প্রবেশ করেছে।

বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস (১৫০৬-৮৯) চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবত (১৫৪৫ থকে ১৫৫৩-৫৫ খ্রি.) রচনা করেন। এটি চৈতন্য জীবনী সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন বাঙলা গ্রন্থ। লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেন ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর বৈষ্ণব গুরুর জীবনাবলম্বনে ১৫২৭-১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর বিরাটকায় গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে দিকে। কবি নানা ছন্দে এ কাব্য রচনা করেন। তাঁর ভাষায় :[৩]

চৈতন্যমঙ্গল গীত ত্রিজগত আনন্দিত
জয়ানন্দ রচে নানা ছন্দে।

বাংলাদেশের জনমনে কীর্তনের প্রভাব ব্যাপক। এদেশের মানুষ করুণ রসের ভক্ত। বৈষ্ণব মহাজনদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধও কম নয়। রাধাকৃষ্ণের

প্রেমভক্তি শেষ পর্যন্ত সর্বজনীন ভক্তিবাদে উন্নীত হয়েছে। সংগীতপ্রিয় জনসাধারণ বৈষ্ণব পদাবলীকে আপন হৃদয়ের সম্পদ বলে গ্রহণ করেছে। পদাবলী কথাটির সঙ্গে কীর্তন কথাটি গভীরভাবে যুক্ত। সে জন্য পদাবলীকে পদাবলী কীর্তনও বলা হয়। তবে কীর্তন বলতে প্রধানত বোঝায় রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও চৈতন্যের জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত পদ। এ অর্থেই পদাবলী কীর্তন কথাটি ব্যবহৃত হয়। সুর গ্রন্থনা, তাল প্রয়োগ ও গায়নবৈশিষ্ট্যে কীর্তন একটি বিশেষ সংগীত শৈলীতে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে ধ্রুপদ ও রাগসংগীত কলার প্রভাব আছে এবং লোকগীতিই প্রভাবও ব্যাপক। কিন্তু সব মিলিয়ে কীর্তন একটি নব-সংগীত পদ্ধতিরূপে গড়ে উঠেছে। সাঙ্গীতিকভাবে কীর্তনকে ভারতবর্ষের সংগীতের ইতিহাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে চিহ্নিত করা যায়। চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব সঙ্গীতান্দোলন সৃষ্টি করেন যার তরঙ্গ বাঙলার নিভৃত গ্রামীণ জীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চৈতন্য প্রসঙ্গে বলেন, "গীতিময় বিগ্রহ। গানেই তিনি উপাসনার মন্ত্র রচনা করলেন, গানেই তিনি দেশকে মাতাইয়া তুলিলেন। বাঙ্গালী গানেই তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। এই গানই বৈষ্ণব পদাবলী।"[৪]

মধ্যযুগের পুথি ও কাব্যসাহিত্য

বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়া, বৈষ্ণ সহজিয়া, সুফিবাদের মরমি ভাবধারায় তাড়িত হয়ে কতিপয় মুসলিম কবি সমন্বিত সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে সাহিত্য সৃষ্টির অনন্য ধারা সূচিত করেন। এই সম্ভাবনাময় সাহিত্য ধারাকে আজ হারানো অধ্যায় বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। বাঙলার সাহত্যের ইতিহাসেও এই রচনাবলির স্থান খুব নগণ্যভাবেই পরিবেশিত হয়েছে-বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিবেচনায় এই সাহিত্যধারার নবমূল্যায়ন জরুরি বলেই আমরা মনে করি।

চৌদ্দ শতকের শুরু থেকে উনিশ শতকের শেষ অবধি এই সাহিত্য ধারার সময়কাল। দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার বেশ ক'জন মুসলমান কবি বাঙলা ভাষায় সুফিবাদ ও যোগতন্ত্রের সমন্বিত রূপে ধর্মীয় ও ঔপখ্যানিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। এ বিষয়ে আমাদের উচ্ছ্বাস এইখানে যে তারা আভিজাত্যের ভাষা ফারসি এবং ধর্মের ভাষা আরবি বাদ দিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও লোকায়ত সংস্কৃতি গঠনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উলামা শ্রেণীর একটি অংশের অযৌক্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সৃষ্টির কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।[৬] এই কবিগোষ্ঠীর অন্যতম কয়েকজনের জীবন ও কর্মের একটি তালিকা প্রণয়ন করা এখানে প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি। মনে রাখতে হবে আজ তাঁরা অপাংতের হলেও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের দান অবিস্মরণীয়।[৪]

চৌদ্দ-পনের শতক : শাহ মুহম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন, চাঁদ কাজি।

ষোল শতক : সাবিরিদ খান, শেখ কবীর, দৌলত উজির বাহ্‌রাম খান, শেখ ফয়জুল্লাহ্, মেখ পরাণ (১৫৫০-১৬১৫), আফজল আলী, সৈয়দ, সুলতান, শেখ চান্দ, সোনাগাজী চৌধুরী, মুহম্মদ কবীর; মুজাম্মিল, হাজি মুহম্মদ, শেখ জাহিদ।

সতের শতক : মুহম্মদ খান, শেখ মুত্তালিব, মীর মুহম্মদ সফী, মুহম্মদ ফসীহ, নজরুল্লাহ খান, আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০), সৈয়দ মর্তুজা, দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮), মরদন, আলাওল (১৬০৭-১৬৮০), কোরেশী মাগন ঠাকুর, আবদুল করিম খোন্দকার, শমশের আলী, মুহম্মদ আকিল, মুহম্মদ আকবর, মঙ্গল চাঁদ, কমর আলী, আবদুন নবী, সেরবাজ চৌধুরী।

আঠারো শতক : মুহম্মদ উজির আলী, হায়াত মাহমুদ, ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা (১৭৩৩-১৮০৭), শুকুর মাহমুদ (১৬৮০-১৭৫০), রহিমুদ্দীন মুনশী, মুহম্মদ রাজা বা মুহম্মদ আলী রাজা, আলী রজা ওরফে কানু ফকির, হাজী শেখ মসুর, শেখ সাদী, নওয়াজিশ খান, পোলাওল বা পরাগল, মুহম্মদ রফিউদ্দীন, মুহম্মদ মুকীম, মুহম্মদ আলী, সৈয়দ নূরউদ্দীন, মুহম্মদ জীবন, সৈয়দ নাসির, বালক ফকির, আরিফ, দানিশ।

উনিশ শতক : তমিজী, মুহম্মদ চুহর, মালে মোহাম্মদ, বাকের আলী চৌধুরী, মুহম্মদ খাতের, মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), দান আলী (১৮৫২-১৯৩৬)।

ষোল শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত সুফি ও বৈষ্ণব ভারধারা তাড়িত সমাজবাদী ও উদারনৈতিক মানবতাবাদী সমন্বয়ী সমাজ চিন্তাদর্শ প্রসূত লোককবিগণ :

রতিরাম দাস, করম শাহ্ (মৃত্যু ১৮১৩), লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০), দুর্বিনশাহ (১৭৯৬-১৯০৭), শীতলাং শাহ (১৮০০-১৮৮৯), পাগলা কানাই (১৮০৯-১৮৮৯), কাঙাল হরিনাথ/ফিকির চাঁদ (১৮৩৩-১৮৯৬), দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১১), রাধারমণ দত্ত (১৮৩৪-১৯১৪), গগন হরকরা (১৮৪০-১৯১০), পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪), ভবপ্রীতানন্দ ওঝা (১৮১৬-১৯৬৭), গোঁসাই রাম লাল (১৮৪৬-১৮৯৪), আলেপ, হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২), কুবির চাঁদ, গোঁসাই গোপাল (১৮৬৯-১৯১২), মোনমোহন দত্ত (১৮৭৭-১৯০৯), রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭), আরজান শাহ (১৮৫-১৯৫৮), বলাই শাহ্ পাঁচু শাহ (১৮২৩-১৯২৮), ভালাই শাহ (১৮৪৫-১৯৪০), জালাল খাঁ (১৮৯৪-১৯৭২), কানাইলাল শীল (১৮৯৫-১৯৭৭), মহিন শাহ (১৯০৩-১৯৯৬), রকিব শাহ (১৯০২-১৯৬৮), কুবির গোঁসাই, যাদুবিন্দু, পদ্মলোচন, আরকুম শাহ, নৈমুদ্দিন, মেছের শাহ, গোরা পাগলা, হরগোবিন্দ, ক্ষেমানন্দ, ভবানন্দ, ঘন শ্যাম, জগবন্ধু, যুগল চাঁদ, ভোলানাথ, খেলা, খুদিরাম, রাধু দাস, গোঁসাই হরি, অধরচন্দ্র স্বামী, কৃষ্ণ দাস, তারিনী দাস, কালা পাগলা, দীন দয়াল, সুধীর, অধর চাঁদ, গোঁসাই শশী, দীন

শরৎ, লাল শশী, গোঁসাই উদয়, রশিদ, ফুলবাস উদ্দীন, জহিরউদ্দিন শাহ, মেহের শাহ, শেখ ভানু, শাহনূর, শেখ মদন, গঙ্গারাম, পাঁচু, চণ্ডী গোঁসাই, ঈশান, বাখের শাহ, এরফান শাহ, মিয়াধন, আতর চাঁদ, শ্রীনাথ, শেখ কিনু, মনাই শেখ, কালাইচাঁদ মিস্ত্রী, দীনু, ঈশান যুগী, বলা, বিশা, জগা, মাথাপটিয়াল বা কাপালি, হাউড়ে গোঁসাই, বাখের সাঁই, আতর চাঁদ, তিনু প্রমুখ জনপ্রিয়। শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯)।

বাঙলা সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রে মুসলমান কবিদের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গুণগতমান ও সংখ্যাধিক্য উভয় ক্ষেত্রেই এ অবদান উল্লেখযোগ্য। ঐতিহ্যমণ্ডিত এ সাহিত্যের নতুন ভাবধারা, বিষয়বস্তু ও ভাষার উপাদান গঠনে বাঙলা সাহিত্যের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে দেয়। মুসলমান কবিরা বাঙলা সাহিত্যে ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্বজনীনতা ও মানবাধিকারের আদর্শ আনয়ন করেন। তারা ধর্মীয় বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। চর্যাপদে বিধৃত 'যোগ ও তন্ত্র দর্শনে' ষোল-সতের শতকের মুসলিম কবিরা ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেন। যে হেয়ালিভরা বক্তব্য চর্যাপদে বিধৃত তা বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন মার্গের বহিঃপ্রকাশ। এর মধ্যে যোগসাধনা সক্রিয়।

ভারতবর্ষের সমাজ থেকে উদ্‌গত যোগ-তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব এদেশে আগত মুসলিম ও অন্যান্য জাতির কেউই অস্বীকার করতে পারে নি-এমনকি আগত সবাই স্বীয় ধর্ম-দর্শনের সাথে যোগকে সমীপরবর্তী বা একীভূত করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য। যোগ সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থের আরবি অনুবাদ মুসলিম সাধক সন্তগণ পরম যত্নে অধ্যয়ন করে যোগ ও তন্ত্র সাধনা গ্রহণ করেছেন-একথাও অনস্বীকার্য। সুতরাং মুসলমান সুফি-সাধকরা কায়াসাধনা গ্রহণ করে থাকবেন এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। এটা বিস্ময়ের কিছু নয়-কেননা দেহ থেকে দেহাতীত সাধনায় উত্তরণ সুফিদেরও কাম্য।

দ্বিরুক্তি হলেও বলতে হয়; সংস্কৃত ভাষায় লেখা অমৃতকুণ্ড শীর্ষক গ্রন্থখানি হিন্দু মরমিবাদ, হিন্দুদের তপস্যা ও যোগতন্ত্রের উপর একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ। হিন্দু মরমিয়া চিন্তাধারা যে মুসলিম সুফিবাদে সঞ্চারিত হয়েছে অমৃতকুণ্ডের বারংবার অনুবাদের দ্বারা তা প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমান কবিরা আরবি ও ফারসি সাহিত্যের রম্য উপাখ্যান থেকে তাদের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এভাবে তারা শিশু প্রায় বাঙলা সাহিত্যকে তাদের বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য ও চিন্তাধারা দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ধর্মীয় কিংবা ইসলামি ঐতিহ্য ছাড়াও মুসলমান কবিরা বাঙলা সাহিত্যে মানবাধিকার ও রম্য উপাদান আমদানি করেন। তাদের কাব্যের প্রধান উপাদান ছিল মর্তের মানুষ, তাদের রোমাঞ্চ, অপূর্ব কার্যাবলি, দুঃসাহসিক কার্যকলাপ, আবেগ, আর্তি, সংস্কার ইত্যাদি। মুসলমান কবিদের নায়ক-নায়িকা কাল্পনিক হলেও তারা দৃশ্যমান জগতের নরনারী এবং তাদের চিন্তাধারা ও কার্যাবলি ছিল স্বাভাবিক মানুষের মতো। বাঙলা সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রীর উপাদান ও রোমাঞ্চকর

প্রেমমূলক উপাখ্যান-মুসলমান কবিদের উল্লেখযোগ্য অবদান। এর বিষয়বস্তু ও ভাবধারা হিন্দু কবিদের ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাঁরা কালক্রমে এগুলোকে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের রচনায় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন। এটা উল্লেখযোগ্য যে শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা বাঙলা সাহিত্যের প্রথম রম্য কাব্য প্রেমের কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন, হানিফা ও কয়রা পরী কাব্যের কবি সাবিরিদ খান, সয়ফুল মুলক কাব্যের প্রণেতা দোনাগাজি ও লাইলী মজনু কাব্যেল প্রবাবশালী কবি দৌলত উজির বাহরাম খান।

বাংলাদেশের মুসলিম বিজয় (১২০৪ খ্রি.) নিসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তার আগের শাসকরা হচ্ছেন মৌর্য-গুপ্ত-শশাঙ্ক-পাল-সেন-বর্মণ। মুসলিম বিজয়ের সূচনা থেকে হোসেন শাহী আমল (১২০৪-১৫৩৮) পর্যন্ত ৩৩৫ বছরের ক্ষমতাসীন বাজন্যগর্বের কৃতি-কৃতিত্বের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ডক্টর আহমদ শরীফ বাংলার সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বা 'বন্ধ্যাযুগ' তত্ত্বের অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বিলুপ্তির কথা তো ঐতিহাসিক সত্য। মুসলমান শাসনকালে বাঙলা সাহিত্যের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ দেশে ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষ এবং ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছিলেন পির-ফকির এবং সুফি-দরবেশরা। উদারমানবতাবাদী সুফি দর্শন বাঙলার নিপীড়িত-নির্যাতিত জনমানবের সাছে আশির্বাণী হয়ে এসেছিল। আর্তজনের প্রতি করুণা, ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন ছিল তাদের মূলধন। বর্ণ বিন্যস্ত ভেদনীতির সমাজের মানুষকে সাম্যের ডাকে প্রলুব্ধ হয়েছিল।

মুসলিম বিজয়ই বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্যের দ্বার উদঘাটন করে। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান আমলকে বাঙলার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল যুগ বলে অভিহিত করেছেন। ডক্টর আহমদ শরীফ উল্লেখ করেছেন, "তুর্কী বিজয়ের ফলেই জনগণ মাতৃভাষা, তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের, তাদের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-যন্ত্রণার, সমস্যা-সম্পদের ও প্রাণের কথার অভিব্যক্তি স্বাধীনভাবে দিতে পারল।"

শাহ্ মুহম্মদ সগীর প্রণীত "ইউসুফ জোলেখা" একটি প্রাচীনতম বাংলা কাব্য। এ কাব্যে রোমান্টিকতার পাশাপাশি ধর্মীয় আবেগও স্থান পেয়েছে। কাহিনীটির মূলসূত্র মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত। কবি 'কিতাব-কোরান' থেকে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করলেও স্বদেশের ভূগোল ও সামাজিকতাই তাঁর বর্ণনায় স্থান করে নিয়েছে। এ গ্রন্থে বাঙলার খ্যাতিমান সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১১ খ্রি.)-এর সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। কবি জয়েনউদ্দীন প্রণীত রসুল বিজয় কাব্যের একটি মাত্র খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ডক্টর আহমদ শরীফের মতে 'রসুল বিজয়' বাংলার সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ। এ গ্রন্থই বাংলা সাহিত্যে চরিত-কথা লেখার সূচনা।

মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যই বৌদ্ধ মত, সুফি মত, বৈষ্ণব মত সর্বোপরি বাউল মত প্রভাবিত। নাথ সাহিত্য, ধর্ম মঙ্গল, সহজিয়া ও যোগতান্ত্রিক সাহিত্য হল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য। যোগতান্ত্রিক সন্ন্যাসী ও বাঙলার সুফিরা বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সমাজ জীবনে চৈতন্যের অবদান ও প্রভাবও অসামান্য। বৃহৎ বঙ্গে ভক্তিবাদের উদ্ভব ও প্রসার, ইসলামের সঙ্গে এর সমন্বয়, সুফি বৈষ্ণবতত্ত্বের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, সুফিতত্ত্বের স্থানীয় বিকাশ বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি পথে এগিয়ে নিয়েছিল। পনের শতকের শেষার্ধ থেকে ষোল শতক বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ-এটা সর্বজনবিদিত; এর কারণ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণায় মুসলমান সুলতান সুবেদারদের অগ্রণী ভূমিকা। বাঙলার বৈষ্ণবতত্ত্বের ঔদার্যতা, চৈত্যের মানববাদ সমন্বিত হয় সুফিবাদের উদারনৈতিক মানবতাবাদের সঙ্গে। এর প্রতিফলন ঘটে তৎকালীন সমাজে এবং সাহিত্যে। ভক্তিবাদের প্রবক্তা চৈতন্যদেব। তিনি বলেন, ঈশ্বর মেলে ভক্তিতে; সে কামার-কুমোর-তাঁতি-ধোপা যে কেউই ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধরা করলে সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে পারে।

ভারতীয় ভক্তিবাদ সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ বলেন, "একে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের বংশধর, তাদের রক্তসংস্কারের ভারতিক প্রভাব বিদ্যমান, তার উপর ইসলামের একটি বিশিষ্ট শাখা-সুফিমতবাদ ভারতে প্রধান্য লাভ করে। সুতরাং মুসলমানদের মনে, ইন্দিয়ের, আত্মার ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভারতিক ভক্তিবাদ তাদের সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল।" ড. শরীফ চৈতন্যদেবকে একজন "চিন্তানায়ক, সমাজনেতা, শাস্ত্র-সংস্কারক ও যুগপুরুষ হিসেবে দেখেছেন।" তাঁকে নিয়ে রচিত 'চরিত-সাহিত্যে' উপযোগিতা, ড. শরীফ অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেছেন। তিনি তাঁর বাঙালা ও বাঙালি (দুই খণ্ডে প্রকাশিত) গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে বাঙালি অজ্ঞাতকুলশীল নয়; তাদের রয়েছে সামাজিক ও ঐতিহাকি পরিচয়; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনি দেখেছেন বাঙালির দর্পণ হিসেবে।

মধ্যযুগের রোমান্টিক কাহিনী কাব্যগুলোর উৎস ফারসি ও আরবি সাহিত্য। ইউসুফ জোলেখা, লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ এ তিনটি প্রণয় কাহিনী ইরানে উদ্ভূত এবং সুফি কবিদের দ্বারা পরিপুষ্ট। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে এগুলো একান্ত মানবিক প্রেমকাব্যে পরিণত লাভ করেছে। মর্সিরা সাহিত্য মূরত কারবালার শোকাবহ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বাঙালি মুসলমানের কাছে এর আবেদনও অপরিসীম। চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিষদদের নিয়ে লেখা চরিতাখ্যানের ন্যায় মুসলমান কবিরাও চরিতসাহিত্য রচনায় পারদর্শিত দেখিয়েছেন। 'নবীবংশ, রসুল বিজয়, জঙ্গনামা, মুক্তলহোসেন, হানিফার লড়াই, কাসাসুল আম্বিয়া, সিফতুল আম্বিয়া, হাতেম তাই, আমীর হামজা প্রভৃতি গ্রন্থ নিঃসন্দেহে চরিত সাহিত্যের মর্যাদায়সিক্ত।

ধর্মসমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত বাঙালির লৌকিক দেবতা 'সত্য' একই সঙ্গে মুসলমানদের সত্যপীর ও হিন্দুদের সত্য-নারায়ণ। 'সত্য'-এর উদ্ভব ষোল শতকে; বিশাল ও পরিপুষ্টি সতের-আঠারো শতকে। উল্লেখিত সময়ে সামাজিক অস্থিরতা ও জনজীবনের নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তির প্রয়াসে সৃষ্টি হয় 'সত্য'। সত্য পীর বা সত্য নারায়ণের পাঁচারীতে ঘোষিত হয়েছে "বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়"। এই সমন্বয়-সমঝোতা বাঙলার সমাজজীবনে উদারনৈতিক সুফি দর্শনের প্রভাবেরই প্রতিফলন। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক কিংবা ধর্মীয় সবদিক থেকেই আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্থ থেকে উনিশ শতকের প্রায় শেস অবধি পর্যন্ত বাঙলায় অবক্ষয় যুগ তথা যুগসন্ধি কাল। এই যুগসন্ধিকালেই আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছ শায়ের ও কবিওয়ালাদের; দোভাষী পুথি ও কবি গানের।

পণ্ডিতরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, দক্ষিণ ভারতের শঙ্কর, ভাস্কর, নিম্বার্ক, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ এবং উত্তর ভারতের রামানন্দ, কবীর, নানাক, দাদু, রামদাস চৈতন্য প্রমুখের বৈষম্যহীন মানবতাবোধ ও বর্ধতত্ত্ব ইসলামের সুফি দর্শনের প্রভাবজাত। মুসলিম সমাজের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা এবং কর্মসূত্রে ইহকালিক ভাগ্য পরিবর্তনের অবাধ সুযোগ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামের প্রচ্ছায়ায় জীবনের নতুন দিগন্ত দেখতে পায়। ঢালাওভাবে ইসলাম গ্রহণের প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার জন্য হিন্দু শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের সংস্কার সাধন করে হিন্দু সমাজকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন চৈতন্য। এই সংস্কার সাধনের প্রধান দিক হচ্ছে সুফি মতের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণ আকৃষ্ট হয়েছিল তার সবকিছুই চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বকৃতি পেয়েছিল। সামা (কীর্তন), যিকর (নামকপ) হাল (দশা), দারিদ্র্য, বিনয়, আর্তের সেবা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, বর্ণহীন সমাজ এমন কি তালাক, নারীর পুনর্বিবাহ প্রভৃতি বাহ্য-আচরণেও সুফি-বৈষ্ণবের মিল প্রভৃতি। এভাবে তৎকালের সমাজে হিন্দুর ধর্মজীবনে দৃঢ়মূল হয় মুসলিম তথা সুফি দর্শনের প্রভাব। সাহিত্যে মুসলমানরা রামায়ণ-মহাভারতের ও মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে হিন্দু-পুরাণ বহুল ব্যবহার করেছিলেন-কাহিনী নির্মাণে ও উপমাদি প্রয়োগে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ যোগতন্ত্রের ও দেবান্তের প্রভাব পড়েছিল সুফি সাধনায় ও বাউল সাধনায়।[৭]

এ সময় মুসলমানদের উদ্যোগে বাঙলা পদ্যে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় ও সুফিবাদ সংক্রান্ত গ্রন্থ সংকলিত হয়। এসব গ্রন্থে আরবি-ফারসি ভাষায় দক্ষতা ও ইসলামি বিষয়াদিতে রচনাকারদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা কোরআন-হাদিস এবং মরমি বিষয়ক গ্রন্থগুলোকে তাদের সংকলনের ভিত্তিরূপে বিবেচনা করেন। সাধারণ বাঙালি পাঠক যাতে সহজে বুঝতে পারে সেজন্য ধর্মীয় বিষয়াদি তারা বাঙলায় লেখেন। সমসাময়িক মুসলিম সমাজে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ধর্মীয় বিষয়াদি কেবল আরবি-ফারসি ভাষায়ই লিখিত হতে পারে। কিছু

সংখ্যক পণ্ডিত ও কবি সামজের এই রক্ষণশীল ধারণা পরিহার করে সাধারণ মানুষের হিতার্থে বাঙলা ভাষায় ধর্মীয় বিষয়সমূহ রচনা করেন। প্রভাবশালী কবি শাহ মুহম্মদ সগীর (গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্ব কালে ১৩৮৯-১৪০৯) এ ভাবধারারই রূপ দান করেছেন। তিনি তার ইউসুফ জুলেখা নামক গ্রন্থে বলেন যে, ধর্মীয় বিষয় বাঙলায় লিখলে অপরাধ হয় এরকম চিন্তা করার কোনো ভিত্তি নেই। তিনি বরং বাঙলায় ধর্মীয় বিষয় লেখা পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। কেননা এর ফলে মুসলমানদের অতীতের মহান ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের নিকট বোধগম্য হবে।

সুলতান নুসরাৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২) কবি আফজল আলী খাঁর ধর্মীয় গ্রন্থ নসিহত নামা বাঙলায় রচনা করেন। এ পুস্তক রচনায় কবি কোরআন ও হাদিস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কবি মুজ্জাম্মেল ও বাঙলা ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থাদি লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। নীতিশাস্ত্র নামক গ্রন্থে কবির এ অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে। কবির আর একটি গ্রন্থ সায়াৎ-নামা সুফিবাদ ও স্থানীয় ভাবধারার উপর লিখিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে লেখা কবি ফয়জুল্লাহর গাজী বিজয়, জয়গুনের চৌতিষা এবং কবি জৈনুদ্দিনের রসূল বিজয় এ গ্রন্থগুলোর খুব বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই, তথাপি এর গুরুত্ব এইখানে যে এগুলো রচিত হয়েছিল প্রাদেশিক ভাষায় যে ভাষা সাধারণ লোকের গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধচারীরা যে সক্রিয় ছিল তার তথ্যসূত্র আমাদের জানা রয়েছে। বাঙলা ভাষাকে অবহেলাকারীর বিরুদ্ধে কবির বক্তব্য তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। নোয়াখালীর সন্দ্বীপে ১৬২০ সালে জন্মগ্রহণকারী আবদুল হাকিমের রচিত নূরনামার চারটি পংক্তি মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম দরদের জন্য প্রবাদতুল্য খ্যাতি পেয়েছে।

> যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
> সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
> দেশী ভাষা বিদ্যা যার মন ন জুয়ায়।
> নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায় ॥

মাতৃভাষার মর্যাদার লড়াই-এ কবির উপর্যুক্ত পংক্তি চারটি বাঙালিকে আজও শক্তি ও সাহস যোগায়। কতটা উত্তেজিত হলে কবি নিজ ভাষা মাতৃভাষা অবজ্ঞাকারীর জন্মের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। এটা কবির অগাধ দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয়। এ কালকে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঊষাকাল বলতে পারি।

মুসলমান কবিরা কেবল খ্যাতনামা মুসলিম বীরদের নিয়েই লেখেন নি-তাঁরা ধর্মীয় গোড়ামিমুক্ত হয়ে সকল জানালা-দরজার অর্গল খুলে দেন। শেখ ফয়জুল্লাহ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথের শিক্ষা ও অলৌকিক কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে

গোরক্ষ বিজয় কাব্য রচনা করেন। গোরক্ষ বিজয় কাব্য বাঙলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়।

দৌতল উজির বাহ্‌রাম খান ষোল শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একজন বিখ্যাত কবি ও বিদ্বনব্যক্তি ছিলেন। তিনি পারস্যের প্রেম কাব্য লায়লী মজনু বাঙলার ভাষায় অনুবাদ করে নিজেকে অমর করে রেখেছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রণয় উপাখ্যান রচনায় বলা যায় তিনি পথিকৃৎ। গ্রন্থটি বাঙলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান রচনা বলে স্বীকৃত। এ অনুবাদকর্মে তিনি অবলীলায় স্থান দিয়েছেন বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে। এখানে লাইলী মজনুর প্রেম কাহিনী, তাদের প্রণয় তাদের ভালোবাসা লৌকিক থেকে অলৌকিকের দরজায় পৌঁছে গেছে। সুবিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবাত্মা-পরমাত্মার যে মিলন সাধনা, যে আকুতি বা সুফিতত্ত্বেও প্রেম আকেশ-মাশেক তত্ত্ব নামে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাঙলার প্রণয়মূলক পাঁচালিতে প্রেম ব্যাকুলতাকে স্থানে স্থানে সুফিতত্ত্বে রঞ্জিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।[৮] আমরা দেখি ফার্সি সাহিত্যের লাইলী মজনু শিরি ফরহাদের যে প্রেম তা বাঙলায় এসে রাধাকৃষ্ণ রূপকে গৃহীত হয়েছে। মূলত এ তত্ত্ব জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমমূলক সম্বন্ধ ব্যক্ত করে। যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য বলেন, "বাঙ্গালায় সুফীভাবাপন্ন কবিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলিতে যাইয়া লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ প্রভৃতি রূপক ব্যবহার না করিয়া বাঙ্গালার জাতীয় রূপক রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গই গ্রহণ করিয়াছেন।[৯]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিদেশীর কাছেও আজ পরম শ্রদ্ধার আদরের ও সম্মানের। যে ভাষার বিকাশে ঈশদ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরতচন্দ্র, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জগদীশ, সত্যেন, অমর্ত্য প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন। আমাদের মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকদের থেকে শুরু করে একেবারে অর্বাচীনকালের কবি-সাহিত্যিককেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে বাংলার সুফি বৈষ্ণব ও বাউল চেতনা। রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে তার জীবনে ও সাহিত্য রচনায় যে বাউলচেতনার প্রভাব পড়েছে তা উল্লেখ করেছেন। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্মে বহুভাবে বাউল-ভাটিয়ালির প্রভাব আমরা লক্ষ করি। আমাদের রাজনৈতিক রূপকারদের মধ্যেও সুফি-বৈষ্ণব বাউলের উদার মানবতাবাদের চেতনার ছোঁয়া লেগেছিল। কাজেই বলা চলে সুফি ও বাউল সাধনার প্রভাব আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী।

তথ্যনির্দেশ

১. সেলিম আল-দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৯৬, পৃ. ৩২
২. এম. এ. রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
৩. সেলিম আল-দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৪. করুণাময় গোস্বামী, সঙ্গীত, কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৮৮৯
৫. মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলাদেশের সংস্কৃতি স্বরূপ, ও সম্ভাবনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪
৬. খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৭. সেলিম আল-দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৯. খোন্দকার রিয়াজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

রবীন্দ্র মানসে বাউল সাধনার প্রভাব

জাত-সম্প্রদায়, ধনি-গরিব, নারি-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্র বাউল দর্শন। কোনো প্রকার অনুমানে তাদের বিশ্বাস নেই, তারা বস্তুনির্ভর— তাদের মানবতাবাদী চেতনার রসদ-উপাদান বস্তুজগত তথা লোকজগত থেকে নেয়া। এক কথায় তারা হলো মানবতন্ত্রী, জীবিত মানুষ নিয়ে তাদের যত কথা-চিন্তা; মৃত্যুলোক নিয়ে তাদের কোনো কথা নেই। এ দর্শন প্রাচীন ভারতের চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনজাত। বাউল দর্শন বাংলার লোকায়ত দর্শন। এটা একান্ত বাংলার। যোগ-তন্ত্র-সাংখ্য, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, সুফি চিন্তার সমন্বয়ের হাজার বছরের বাংলায় লোকায়ত চিন্তার জারক রসে জারিত হয়ে এর উদ্ভব-বিকাশ। মানবতাবাদী এই দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক পরিচয় ঘটেছিল। আমরা এ নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মানসভুবনে বাউল দর্শনের প্রভাব-প্রক্রিয়া-প্রতিফলন কিভাবে কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছিল তা জানার প্রয়াস নিব।

চলনে বলনে, কথা-বার্তায়, বেশ-ভুষা ও লেখা-লেখি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের বাউল হওয়ার শখ ছিল আজন্ম। আঠারো শতকের শেষার্ধে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর জন্মস্থান ভৌগোলিক দিক থেকে বাউল মতের ব্যাপক প্রসারের বলয়ভুক্ত। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে উদ্‌গত নিরাকার এবং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ষোল-সতের শতকে উদ্‌গত বাউল মতবাদের ন্যায় ব্রাহ্ম মতবাদও কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতা বিরোধী প্রাগ্রসর চিন্তার ফসল নিঃসন্দেহ। এরকম একটি সংস্কার মুক্ত পরিবারে রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মে শুধু দীক্ষাই নেন নি ; এর হাল ধরেছিলেন বেশ শক্ত হাতে এবং কিছুকাল ব্রাহ্ম সভার পৌরহীত্যও (১৮৮৪) করেন। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি-প্রবক্তা-ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত তিনি বাউল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত

করেছেন। তাঁর এই প্রণোদনার কারণ খোঁজা আমাদের গবেষণার উপলক্ষ। আমরা দেখি সমাজের অনেক জ্ঞানী-গুণী-শিক্ষিত-ধনী-প্রভাবশালী ব্যক্তি-পরিবার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেও এবং এর প্রচারে-প্রসারে গলদঘর্ম হলেও তার অবক্ষয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি—যা এখন একেবারে ক্ষীয়মান-ম্রিয়মান। অপরদিকে সতের-আঠার শতকে উদ্‌গত বাউল মতবাদ লোকসমাজের প্রতিনিধি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার হয়েছিল আমজনতার মধ্যে; শোষিত-নিপীড়িত-নির্যাতিত-বঞ্চিত-অবহেলিত সাধারণ মানুষ যা গ্রহণ করেছিল তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে অনেক বাঁধা-বিপত্তি-আপত্তি-ভয়ভীতি উপেক্ষা করে—যা আজও বিকাশমান ও সঞ্চরণশীল। বলা চলে বাউল মতের প্রাগ্রসর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই এটা পরিণত হয়েছিল আমজনতার সামাজিক আন্দোলনে। রবীন্দ্রনাথ বারবার সেই জনতার কাতারে মিশে যাবার বা শামিল হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

সতের-ঊনিশ শতকব্যাপী মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ, উচু-নিচু ভেদাভেদ, হিন্দু সমাজের বর্ণভেদনীতি বিশেষত ব্রাহ্মণ্যবাদের পীড়ন বাঙলার সমন্বয়বাদী সমাজের কোলে লালিত লোকধর্মের বিকাশ বেগবান করেছিল। ঔপনিবেশিক ভাঙ্গা-গড়া, ধনী-অভিজাত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও গার্হস্থ্য জীবন সমাজ কাঠামোর এ ত্রিস্তরেই ধর্মধারণা নানামাত্রিক রূপ নিচ্ছিল। লালন শাহর প্রায় সমসাময়িক রাজা রামমোহন রায় অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, গ্রামীণ সমাজের গর্ভে লালিত রামকৃষ্ণ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের নানামাত্রা যোগ করছিলেন। রামমোহন যুক্তিগ্রাহ্যভাবে পৌত্তলিকতার অসারতা ব্যাখ্যা দেন এবং নিরাকার একেশ্বরবাদের প্রচার করেন। তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম একেশ্বরবাদের মৌল প্রতীক। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত অক্ষয়কুমার দত্ত হন উনিশ শতকের বাঙলার নবজাগরণের পথিকৃৎ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রবক্তা। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছেও একসময় ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং তিনি মূর্তিপুজার বিরোধিতা ক'রে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। রামকৃষ্ণ সকল জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন। ঐতিহ্যবোধ, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মার অস্তিত্ব, পরলোক এসব বিচিত্র বিষয় নিয়ে তখন দোদুল্যমান বাংলার সমাজ কাঠামো। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ-খ্রিস্টান পাঠশালায় পঠিত ইতিহাস আমাদের শিক্ষিত সমাজকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং বাঙলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে বাঙলার লোকধর্মের মানবমুখিনতার শক্তি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। কাজেই তাঁরা আমল দিতে চাননি পূর্বসুরি কবীর-নানক-দাদু-রজ্জব-আকবর-দারাশিকো এবং চার্বাক-সাংখ্য যোগ-নাথ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া ও সুফিসাধকদের সঙ্গে বাউল চিন্তার পারম্পর্যতাকে। লালন শাহ'র গানের বাণী এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিবর্তমান সমাজ মনের গর্ভে সৃষ্ট বাংলার লোকধর্মের মৌল দর্শনটি তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বাউল-প্রীতির কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর অনেক গানে তিনি বাউল সুর বসিয়েছেন, বাউলদের ব্যবহৃত শব্দ গ্রহণ করেছেন, নিজেকে 'রবি-বাউল' নামে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হননি। বাঙলার সাধারণ মানুষের সৃষ্টির মধ্যে এক অসাধারণ ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাই একদিকে নিজে যেমন এর নিরলস অনুসন্ধান করেছেন—অন্যদিকে যাঁদের এ কাজে নিয়োজিত দেখেছেন তাঁদেরও দিয়েছেন অকৃপণ উৎসাহের জোগান। 'মৈমনসিংহ গীতিকার আলোচনা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমান ঝুঁলির' ভূমিকা, 'ছেলে ভুলানো ছড়া' মনসুর উদ্দীনের হারামণির ভূমিকা প্রভৃতিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঙলার খাঁটি নিজস্ব সম্পদ খুঁজতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ বাউল-গানের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন এর ভাবরূপ, সুর, ভাষাশৈলী এবং রচনানৈপুণ্যে। কোনো কোনো বাউলের অসাধারণ কবিত্বশক্তি, ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রকাশ, ভাষা ও ছন্দ বৈচিত্র্য তাঁকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বাউল প্রীতির উল্লেখ দেখি ১২৯০ সালের পৌষ মাসে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'বাউল গান' শীর্ষক প্রবন্ধে। কবির বয়স তখন বাইশ বছর। এই সময়ে *'সঙ্গীত-সংগ্রহ বাউলের গাথা'* নামে একটি বই রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে। সেটির সমালোচনা করতে গিয়েই বাউল গান প্রবন্ধের অবতারণা। বাঙলার নিজস্ব সম্পদ এই বাউল গানগুলি রবীন্দ্রনাথকে কী রকম মুগ্ধ করেছিল তাঁর রচনার উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায় :

'তোমরা বাঙ্গালা বাঙ্গালা করিয়া সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সংস্কৃত, ইংরেজি সমস্ত, ওলট পালট করিতেছ, কেবল একবার হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে একটি গান আছে—

আমি কে তাই জানলেম না,
আমি আমি করি কিন্তু আমি আমার
ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি,
কোথা হইতে এলাম আমি তারে কই গণি!

আমাদের ভাব আমাদের ভাষা যদি আয়ত্ব করিতে চাই, তবে বাঙালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।'[১]

রবীন্দ্রনাথ 'অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান' রচয়িতা বাউলদের প্রথম ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন শিলাইদহ অবস্থান কালে; আর এই পর্বটিই তাঁর প্রকৃত গান অনুশীলনের যুগ। কবি বলেন, 'শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সর্বাদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হতো।'

আমরা রবীন্দ্রনাথের লালন প্রীতির প্রথম পরিচয় পাই ১৩১৪ সনের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে বিখ্যাত 'গোরা' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশিত কিস্তিতে বাউল

গানের দুইটি পঙক্তির উদ্ধৃতিতে। উপন্যাসের প্রারম্ভে একটি উদাস ভাবময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এর তুলনায় অন্য কোনো গান নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশি উপযুক্ত মনে হয়নি। পঙক্তি দুটিতে তিনি নায়ক বিনয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এভাবে : 'আলখাল্লা-পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল :

খাঁচার ভিতর অচিন-পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন পাখীর গানটা লিখিয়া লয়, ভোর রাত্রে যেমন শীত শীত করে অথচ গায়ে কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল এ অচেনা পাখীর সুরটা মনের মধ্যে গুন গুন করিতে লাগিল।' আমরা জানি এ পংক্তি দুটির সুরের রেশ শুধু নায়ক বিনয়ের মনেই স্থায়ী গুঞ্জরণের সৃষ্টি করেনি, তা রবীন্দ্রনাথের মনে এমনভাবে মুদ্রিত হয়েছিল যে, 'গোরা' বাদেও আরো দু'টি রচনায় গানটির ভাব-সম্পদকে তিনি অতি উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন।

১৩১৯ সনে প্রকাশিত 'জীবন স্মৃতির গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছেন, 'সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম :

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে
ওগো বিদেশিনী।

ইহার অনেকদিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল:

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।

দেখিলাম, বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখী বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখীর যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কি দিতে পারে।' ১৩৩২ সনে ভারতীয় দার্শনিক সঙ্গের সভাপতির ভাষণে এই পঙক্তি দুটির সঙ্গে শেলীর কবিতার তুলনা করে অজ্ঞাতনামা বাউল কবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : ' সেই অজানা দুরাধিগম্য হইলেও যে সকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং অজ্ঞাতনামা বাঙালী বাউল উভয়েই বুঝিয়েছিলেন। শুধু এই প্রভেদ যে শেলীর ভাষা জনকয়েক শিক্ষিত লোকের জন্য, আর এই বাউল-গান গ্রামের চাষী ও সর্বসাধারণের, যাহারা এই গানের অতি বাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন না'(প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩২, ৫৪২ পৃ.)।

১৩৩২ সনের আশ্বিন থেকে প্রবাসীর 'হারামণি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালনের গান প্রকাশিত হতে থাকে এবং মাঘ মাস পর্যন্ত মোট কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী'তে লালনগীতি সংগ্রহ প্রকাশকালে ১৩২২ সনে রবীন্দ্র মানসিকতার পরিচয় মিলে তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটক রচনার মধ্যে বাউল-চরিত্র সৃষ্টিতে। শুধু তাই নয়, এই নাটকটি কলকাতায় অভিনয়কালে তিনি নিজে 'বাউলের চরিত্রটি অভিনয় করেছিলেন। আরও লক্ষণীয়, এই নাটকখানি দীনেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুরকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'যাহারা ফাল্গুনীর ফাল্গুনদীটিকে বৃদ্ধ কবির চিত্তসরোবর তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের এবং সেই সঙ্গে বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী শ্রীমান দীনেন্দ্রনাথের হস্তে এই নাট্য কাব্যটিকে কবি–বাউলের একতারার মত সমর্পণ করিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের মনে লালনের গান এমনভাবে স্থান করেছিল যে ১৩২২ সনের 'প্রবাসী'তে লালনের গানের কিছু সংগ্রহ প্রকাশের প্রায় বিশ বছর পরে ১৩৪১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ছন্দের প্রকৃতি' নামে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কবি পূর্বে প্রকাশিত ৩টি গান সামান্য সংশোধনসহ উদ্ধৃত করে সেগুলির ভাষা ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছিলেন। প্রবন্ধটি থেকে এখানে অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি করছি : ' প্রাকৃত বাংলার দুয়োরাণীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়াল ঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, সেই 'অশিক্ষিত : লাঞ্ছনাধারীর দল যথাযথ বাংলা ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দেই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর যপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।

আর একটি,

এমন মানব জনম আর কি হবে,
যা কর মন ত্বরায় কর এই ভবে।

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেঁয়ে নয়। ছোটবড় নানাভাবে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে ঘসে বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।'

'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'এই যে বাংলা বাঙ্গালীর দিন-রাত্রির ভাষা এর একটি মস্ত গুণ এ ভাষা প্রাণবান। ... যারা হেড পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়েননি তাদের একটা লেখা তুলে দিই।' কবি এরপর লালনের 'কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই' গানটির কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

'চক্ষু আঁধার দিনের ধোকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়

কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগম ঠাঁই।'

লালনের গানগুলি রবীন্দ্রমানসে এমনভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে কালের দীর্ঘ ব্যবধানেও তা এতটুকু ম্লান করতে পারে নি। কবির শেষ বয়সের রচনা 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে রয়েছে তাঁর অব্যাহত লালন-চর্চার নিদর্শন এবং বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে লালন সঙ্গীতের অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি।

বাউল গান, বাউল ধর্ম এবং লালন সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্য আছে রবীন্দ্রনাথের। বাউলের জীবনদর্শন ও বিশ্বমানবতার সাধনায় আরো অনেক সন্ত-মনীষী–কবি অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বিদ্রোহী কবিখ্যাত নজরুলও বাউল মতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাউলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন :

'আমি ভাই খ্যাপা বাউল
আমার দেউল আমার এই আপন দেহ।'

নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাতে বাউলের দেহতত্ত্ব ও মানবতার জয়গান ঘোষিত হয়েছে :

'তোমাতে রয়েছে সকল কিতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার,
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি কঙ্কালে ?
হাসিতেছে তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে—
বন্ধু বলিনি ঝুট,
এই খানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়েই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন,
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।'

রবীন্দ্রণাথ আদ্যপান্ত বাউল। তাঁর মননের বিকাশ ঘটেছিল বাউলের সহজ মানুষ, মনের মানুষ একথায় মানুষ ভজনার মন্ত্রণায়। বাউলের সহজ সাধনা ও মনের মানুষ ধারণা/তত্ত্ব তাঁকে প্রণোদনা দিয়েছিল। তাইতো কবি গেয়েছেন :

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তাই সকল খানে॥

অথবা

'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি হৃদয় প্রাণে চাই নি।'

প্রথাসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় আচারের অন্তঃসারশূন্যতায় পিতা দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় রবীন্দ্রনাথেরও একদিন সংশয়/দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মনের গহীনে বাসা বেঁধেছিল। তাই

স্বাভাবিকভাবেই বাউলের শাস্ত্রাচারহীন লোকধর্মজাত বিশ্বজনীন মানবপ্রেমের আকাঙ্খাপুষ্ট মানুষের মহামিলনের আহ্বানে তিনি দোলাইত হয়েছিলেন। তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি— 'আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি এমন কথা বলতে পারিনে—অনুশাসন আকারে কোন পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়।' স্বয়ংসিদ্ধ সন্তকবির প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আচারসর্বশতা ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি এ বাণীর তীর্যকতায় কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। এখানে দুই কবিই মহামিলনের সেতু রচনা করেছেন। আচারসর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অন্তঃসত্মশূন্যতার প্রতি তাঁরা ঐক্যমতে পৌছেছেন যেন রেল লাইনের মতো সমান্তরাল— একই লক্ষ্যে একই গন্তব্যে তাদের যাত্রা এবং শেষ পর্যন্ত একই স্টেশনে বা একই গন্তব্যে উভয়ই পৌছেছেন। বাঙলার হাজার বছর লালিত বৌদ্ধ-উর্বর, বৈষ্ণব-উর্বর, সাংখ্যযোগ-উর্বর ও সুফিবাদসিক্ত সমাজমন দুই কবির চিন্তার-মননের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়ে সংযোগ- সেতু রচনা দিয়েছে যেন একবৃন্তে সুবাসিত মানবতার পতাকাবাহী দু'টি ফুল—যার আলোকে মানব সমাজ উদ্ভাসিত।

বাউলদের মনের মানুষ বিষয়ক তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে এক করে দেখেছেন—তা যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ কিনা এ প্রশ্নে বিতর্ক আছে। তবে বাউল সাধনায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধনার যে প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। বাউল গানের ভাষা ও ছন্দ, ভাবের আন্তরিকতা ও গভীরতা, তার সারল্য, ভক্তির ব্যাকুলতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন তাতে বাউল গানের সাহিত্যমূল্য এবং একই সঙ্গে বাউল সাধনায় নিহিত সমাজহিতৈষণার বিষযটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমরা এখানে তাঁর রচনার বিভিন্ন অংশ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি সংযোজন করছি। *শান্তিনিকেতন* নামক বইয়ের 'ছোট বড়' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

সে আরও গেয়েছিল, :

আমার মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে!

তার গানের এই কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ... মানুষ আপনার সব কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি-কাকে অনুভব করছে। সেইজন্য ঐ বাউলের দলই বলছে ... 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়!'

আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা!

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভীমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবনের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ। তিনিই মানুষকে পাগল করে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে :

আমার মনের মানুষ কে রে !
আমি কোথায় পাব তারে !

সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না, তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে ?' কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তা পাওয়া যাবে না, স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া ; আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে পাওয়া।

'আত্মবোধ' প্রবন্ধে তিনি বলেন : 'কয়েক দিন হল পল্লীগ্রামের কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কি আমায় বলতে পার ?' একজন বললে, 'বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না'। আর-একজন বললে, 'বলা যায় বই কি—কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হবে। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়'। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে, সবাইকে শোনাও না কেন ?' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ ? কেউ কি আসছে' ? সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।'

আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল এ তো মিথ্যে বলেনি। আসছে, সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে চলতে হচ্ছে—আর যাবে কোথায়?...

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের

পল্লীগ্রামের বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্য বেরিয়েছে—আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই।...

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোট নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে এই আপনির খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্তহাস্যে বলছে সবাইকেই আসতে হবে এই আপনির খোঁজ করতে। কেননা, এ তো কোনো বিশেষ মতের, বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ সে তারই ডাক।...

হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষায় এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশের পথ চলতে চলতে শোনা যায়—এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয়নি। সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারিগান :

মন মাঝি, তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না !

তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

মানুষের ধর্ম গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ ; জ্ঞানে-কর্মে—ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাহির-বিক্ষিপ্ত আপনা-হারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলাম পথিক ভিখারির মুখে :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলাম :

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পালগলই গেয়েছিল :

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

বাউল সাধনা, বাউল গান ও সুর এবং বাউল শ্রেষ্ঠ লালন রবীন্দ্র মানসে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। বাংলা লোকসাহিত্য এবং লালন চর্চারও সূচনা ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। লালনের প্রথম পরিচয় আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ এই কবির গান ও বাউল সুরে কোথাও যেন তার আত্মিক মিল খুঁজে পান। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির গণ্ডি থেকে যখন কার্যব্যাপদেশে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এবং পাবনার শাহজাদপুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন—পদ্মা ছেড়ে কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর বাঁকে তার বোট চলছে চিরায়ত নিয়মে বৈঠা বেয়ে, লগি ঠেলে, দাড় টেনে বা পাল উড়িয়ে; সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যে কবির চিত্তে শিহরণ জাগে, কবি মুগ্ধ হন। পদাবলীসিক্ত কবির বৈষ্ণবমন—তার উপর নদীর পাড়ে, পাড়ায়, একতারা দোতারার টুংটাং শব্দ, অচিন পাখির হৃদগ্রাহী-চিত্তহরী সুরের গুঞ্জন কবিকে যেন অচিন লোকে নিয়ে যায়, কবির যেন পুনর্জন্ম সাধিব হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে বাউল গান ও বাউল সুরের আত্মিক পরিচয় ঘটে। শিলাইদহের প্রকৃতি, বাউল গান ও কবি লালন শাহর প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতখানি তা আমরা কবির নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে জানতে পারি :

- □ বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল গানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকেলে আধুনিক।'
- □ 'তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরিব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই, তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারে।'
- □ 'পৃথিবী যে কি আশ্চার্য সুন্দরী এবং কি প্রশস্তমান এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এখানে না এলে মনে পড়ে না।'

রবীন্দ্রনাথের ভাবুকচিত্তে শাস্ত্রীয়ধর্ম ও লৌকিক বা লোকধর্মের যে দ্বন্দ্ব সাহিত্য চর্চার সূচনাকাল থেকে চলছিল তার অনেকখানি প্রশমিত করেছিল বাংলার বাউল ও অন্যান্য সহজিয়া দর্শন। গোলাম মুরশিদ লেখেন:[১]

> "পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও বৈদগ্ধ বর্জিত সমাজে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যুগপৎ দুটি পরস্পর বিপ্রতীপ শক্তিকে সম্ভবত প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। প্রথমত বৃহৎ জনতা নানা আনুষ্ঠানিক ধর্মের নামে নানা খণ্ডে বিভক্ত। এই বিভক্ত জনতা আপন-আপন ধর্মের শাস্ত্র সামান্যই জানে, অনেকে আদৌ জানে না। বরঞ্চ এরা শাস্ত্রের নামে যথেষ্ট পরিমাণে অধর্মাচার করে। তা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম তাঁদের দৃষ্টিকে এতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে তাঁরা ধর্মের নামেও

> নিজের ধর্মে বিশ্বাসী ভিন্ন সম্প্রদায়ের অথবা ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। ধর্মে ধর্মে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সে সমাজে সর্বদাই হানাহানি চলছে। দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রীয় ধর্ম না জেনেও সাধারণ মানুষ কখনো কখনো সরলতা, আন্তরিকতা, সহজ ভক্তি ও অন্যান্য মানবিক গুণের এমন পরিচয় প্রদান করেন, যা সহৃদয় মানুষকে স্বভাবতই মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ যে এই মানবিক গুণাবলী দ্বারা বিপুলভাবে অভিভূত হয়েছিলেন— চিঠিপত্র, কাব্য, ছোটোগল্প, নাটক—তাঁর সাহিত্যের নানা স্থানেই তার স্বাক্ষর বিধৃত আছে।"

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যেসব অভিনব অসাধারণ গান লেখেন তার সুরকাঠামোয় বাউল গানের স্পন্দন ও উদ্দীপনা অসামান্য নৈপুণ্যে ব্যবহার করেন। ১৩২২ সালের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘ মাসে প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালনের ২০টি গান প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লালনের ২৯৮টি গানের দুইটি নকল খাতা সংগ্রহ করেছিলেন। সে খাতা দুটি এখন শান্তিনিকেতনে রক্ষিত আছে।[২]

রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে স্বীকার করেছেন যে তাঁর অনেক গানেই তিনি বাউল সুর গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ বলেন, বাংলার নিজস্ব সুর এবং ঢঙে রচিত গুরুদেবের গানের আর একটি নতুন সৃষ্টি প্রকাশ আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাকে আমি বলি রাবীন্দ্রিক কীর্তন বা রাবীন্দ্রিক বাউল। সেই গান আসলে কীর্তন ও পূর্ববঙ্গের বাউলদের সুরের মিশ্রণে উদ্ভূত এক বিশেষ সুরের গান। জীবনের শেষ পর্বে তিনি এই গান বেশি রচনা করেছেন।

লালন শিষ্য গগণ চন্দ্র হরকরা রচিত ও গীত 'আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাব তারে' এই গানের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত অধুনা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানের সুরের প্রভূত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের বাণীতে অনেক বাউল শব্দ এবং উপমা ব্যবহার করেছেন। এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর নিজস্ব সুরে সৃষ্টি। তাঁর আত্মস্থ করার ক্ষমতা অসামান্য। তাই তিনি বাউল সুর গ্রহণ করেছেন। এভাবে নজরুলের অনেক গানেও বাউল সুরের প্রভাব আমরা লক্ষ করি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষই বড়ো, মানুষই শ্রেষ্ঠ। তিনি মানবতাকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদা; আর তাই তিনি বাউল গানের মানবতার বন্দনা, মানবতার আকুতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; সর্বপ্রকার সংস্কার প্রথার বাইরে রূপের মধ্যে অরূপের, সীমার মধ্যে অসীমের প্রতি বাউলদের যে আহবান তাই তাঁর হৃদয়কে আপ্লুত করেছে। বাউলের গান আর সহজ সাধনার ভাব একসময় রবীন্দ্রমানসে নিবিড়ভাবে মিশে গেয়েছিল। বাউল সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের কথা বিভিন্ন সূত্রে উচ্চারিত। মনসুর উদ্দিনের হারামণি গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি আমার অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত, আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।'

কেউ কেউ মনে করেন শিলাইদহে দেখা গগণ হরকরা ও সর্বখেপীর মতো গ্রাম্য সংগীত শিল্পীদের সাহচর্য- তাদের সহজ সাধনার সরল উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর আধ্যাত্মভাবের সঞ্চার করেছিল।[৩] শুধু শিলাইদহে নয়,. বীরভূমের বহু বাউলের গান তিনি শুনেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনের পৌষমেলাতেও বাউল গানের আয়োজন করা হয়েছিল[৪] এছাড়া, আমরা এও জানি যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশি সুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানগুলো 'বাউল' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বাউল গান শোনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ এ গানের দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন।[৫] তাঁর কয়েকটি নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে বউল গান। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে ঔপনিষদীয় আত্মাতত্ত্ব ও বাউল দর্শনের কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেছেন। 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ', 'জীবে জীবে চাইয়া দেখ সবই যে তার অবতার'/ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার।' —এসব বাউল গানের উদ্ধৃতিও তিনি দিয়েছেন 'মানুষের ধর্মে'।'[৬]

১৮৯১ সালে থেকে পূর্ব বাংলায় বসবাস করার কারণে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন বিশ্বকে অবলোকন করেন। এ দেশের মানুষ, তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, সমাজ, অর্থনীতি, নিসর্গ সবই তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। পূর্ববঙ্গের মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে বিপুল যোগাযোগ তাঁর মনকে মুক্ত করেছিল ক্ষুদ্র গণ্ডীর বন্ধন থেকে। পূর্ববঙ্গের সুদূর দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গণে পদার্পণ করে তিনি লোকসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধি বহির্ভূত ধর্মের উর্ধ্বে এক সহজ সরল ভক্তিরসাশ্রিত মানবিক গুণের পরিচয় পেয়েছিলেন। বিশেষ করে, বাউলদের সাধনার মধ্যে 'প্রাণের মানুষ' কিংবা 'মনের মানুষ' খুঁজে বেড়ানোর যে ঐকান্তিক আকুতি তিনি লক্ষ করেছিলেন তা-ই তাঁকে বিপুলভাবে অভিভূত করেছিল। 'সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাউলদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাউল গানে তিনি তখন কেবল একটা গভীর ধর্মীয় তত্ত্বই খুঁজে পাননি, আপনার ভাবের সঙ্গে তার একটা বৃহৎ ঐক্যও আবিষ্কার করেছেন।[৭] পরবর্তীকালে 'পত্রপুট' (১৯৩৬)-এর পনেরো সংখ্যক কবিতায় আমরা দেখি কবি অকপটে সেই কাছে থেকে দেখা চলমান বাউল জীবনের 'মনের মানুষ'—অন্বেষার ছবি আঁকছেন—

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রোদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষ সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।[৮]

বাউলেরা কখনো পাকা দেউলের বদ্ধ প্রাচীরের মধ্যে তাঁদের আরাধ্য 'মনের মানুষ'কে অন্বেষণ করেনি। জাতপাতের ভেদ তথা মানুষে মানুষে বিভেদকে তারা কখনো মেনে নেয়নি। এই বাউলদের মতোই কবি নিজেকে 'মন্ত্রহীন' 'ব্রাত্য' এবং 'জাতিহারা' আখ্যায়িত করে 'ভেদ চিহ্নের তিলক পরা/সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে' 'চিরকালের মানুষের কাছে, সকল মানুষের মানুষ'–এর কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করেছেন।[৯] এ চিরকালের মানুষকে কখনো জাতপাতে ভেদ-বিভেদের গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না। এ মানুষ মুক্ত মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ একজন সামন্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দরদি, সংবেদনশীল ও মানবিক গুণের আকর। পূর্ববাঙলার পল্লীর সাধারণ নিরহঙ্কার মানুষদের তিনি যখন খুব কাছে থেকে দেখলেন; তখন তিনি সত্যিকারই তাদের একজন নিকট আত্মীয়তে পরিণত হলেন। এই হতদরিদ্র মানুষগুলো তাঁর চিন্তার ধারক-বাহকে পরিণত হলো। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন কৃষকদের দারিদ্র্যতাকে, তাদের সহজ-সরল অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনকে। বৌদ্ধ উর্বর ও বৈষ্ণব উর্বর, সুফি-উর্বর সমাজমন থেকে রবীন্দ্রনাথ দু'হাত ভরে মানবিকতার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

আসলে বাউল গান তাঁর অনেক অস্ফুট চিন্তাকে হয়ত পরিস্ফুট হতে সহায়তা করেছে। সুকুমার সেনের মতে, এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা শাস্ত্রের ভূমি ছেড়ে প্রাণের আকাশে উধাও হলো। কবির মনে, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ধর্মের যে দ্বন্দ্ব গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের পরবর্তী সময়ে চলছিল, বাউল ও অন্যান্য সহজিয়া ধর্মের দর্শন সম্ভবত তাঁকে সেই অর্ন্তদ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তাঁর নিজের স্বীকৃতি আছে এ বিষয়ে। শাস্ত্র যখন ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ছিল, তেমন একটা সময়ে তিনি মদন বাউলের গান শোনেন—

ওগো সাঁই, তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
ও তোর ডাক শুনে সাঁই, চলতে না পাই—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।

তখন তাঁর মনে হলো, এ গানে তিনি আপন আত্মার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন। এ গান শুনে এতোদিনের শাস্ত্রীয় ও মানবধর্মের টানাপোড়েনের যেন অবসান হয়। তিনি যেন আপন ভাবনারই সমর্থন খুঁজে পেলেন এ গানের কথায়।

অতঃপর তিনিও এই মানুষের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনের সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। যদিও বারংবার এঁকেবেঁকে তিনি তাঁর পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছেন। তবে এই অগ্রগমনে বাউল দর্শন তাঁকে সহায়তা করেছে। বিনয় ঘোষের মতে, বিশ্বমানবিক ঐক্যের বাণী সেই ধারা থেকেই তাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বাউলের একতারায় বেজে উঠেছে বিশ্বজনমনের এক অশ্রুতপূর্ব ঐকতান এবং তারপর বিশ্বকবি তাঁর নিজের বীণার সহস্র তারে সেই ঐক্যতানের নব নব রূপ রচনা করেছেন। এবার আমরা তাঁর একটা পত্রের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ -এ ইন্দিরা দেবীকে শাহজাদপুর থেকে লেখা চিঠির ভাষা এই :

> 'ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম : স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা-ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত।'

প্রকৃতপক্ষে, এ চিঠিতে বিশ্বজগতের সঙ্গে বিশ্ব সমাজের সঙ্গে, সরলপ্রাণ লোকজীবনের সঙ্গে একাত্মতার আন্তরিক প্রমাণ মেলে, যা ইতঃপূর্বে রচিত রবীন্দ্রসাহিত্যে নেই অথবা একান্ত দুর্লভ।

কেবল নিসর্গ নয়, পূর্ববঙ্গে থাকাকালে মাটির কাছাকাছি বাস যাদের সেই সাধারণ মানুষের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি লাভ করেন, তা-ও বিশেষ উলে-খযোগ্য। তিনি যেন এই সাধারণ মানুষের আত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছেন। বেদেদের জীবনযাত্রা দেখে তিনি লেখেন, 'এই এরা যারা নিতান্তই মাটির সন্তান, যারা নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে, এদের মধ্যেও সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং পরস্পরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা আছে। ...এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারী জানতে ইচ্ছে করে।'

রবীন্দ্রমানস গঠনে নিসর্গ ও মানুষের এ ধরনের অভিজ্ঞতা যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা বলা বাহুল্য।[১০]

আমরা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি নিচ্ছি গীতাঞ্জলির এক নম্বর কবিতা থেকে—

> আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
> চরণ ধূলার তলে।
> সকল অহংকার হে আমার/ডুবাও চোখের জলে।...
> আমারে না যেন করি প্রচার/ আমার আপন কাজে;
> তোমার ইচ্ছা করো হে পূর্ণ / আমার জীবন মাঝে।

'সকল অহংকার' যদি আমি চোখের জলে ডুবাতে পারি অর্থাৎ পরিত্যাগ করতে পারি তাহলে তো আমি মহান মানুষে পরিণত হবো। স্রষ্টা যদি আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন তাহলে তো আমি ধন্য। জীবনে আমি যত সফলই হই না

কেন যত মহৎ কাজই করি না কেন তবু যেন আমি অহংকারী না হই— নিজেকে বড়ো না ভাবি, প্রচার না করি, এই প্রার্থনা আমি রাখছি স্রষ্টার কাছে ; অমিয় শক্তির কাছে, সেই সঙ্গে নিজের কাছেও। এই অহংকার চূর্ণ করেছিলেন সুফি-সাধক-সন্তরা, গৌতমবুদ্ধ-যিশু-মুহম্মদ প্রমুখ মহামানবেরা ও আমাদের বাউল সাধক লালন-হাসন প্রমুখ , কবীর-দাদু-রজ্জব-চৈতন্য।

আমরা গীতাঞ্জলির তিন নম্বর কবিতা থেকে সামান্য পাঠ নিচ্ছি :

কত অজনারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

এই কবিতায় আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ব্যবহৃত বিরল দু'টি শব্দ 'বন্ধু' এবং 'ভাই' পাচ্ছি। মৈত্রী থেকে শব্দ দু'টি এসেছে। ১৭৮৯ সালে সংগঠিত ফরাসি বিপবের মূল কথা ছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। তাঁর মৈত্রী শব্দটি বোধ করি মানুষের সাথে আলিঙ্গনের এক সূত্র। আর ভাই শব্দটি আরো ব্যাপক পরিসরের। বাঙালির সমাজ জীবনে, পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবনে একটি প্রিয় শব্দ ভাই। এই শব্দটি দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেকে এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কাছেও ভাই শব্দটি ছিল অতি প্রিয়। এই অহিংস ও নিরহংকারী মহান রাজনৈতিক রূপকার প্রায়শই ভাই শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। তাঁর কাছে ভাই শব্দটি ছিল সর্বজনীন। কেবল বাঙালি নয়; বিশ্বের সব মানুষই যেন তাঁর ভাই। মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকেই তাঁর আন্তরিক উচ্চারণ ভাই। রবীন্দ্রনাথও এখানে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস থেকে এই ভাই শব্দটি উচ্চারণ করেছেন।

আমরা তৃতীয় উদ্ধৃতিটি নিচ্ছি গীতাঞ্জলির ৪ নম্বর কবিতা থেকে :

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

এই গানে কবি অমিয় শক্তির কাছে প্রার্থনা করছেন কোনো কিছু প্রাপ্তির জন্য নয়। আমি যেন কোনো কঠিন বিপদেও ভয় না পাই, সামনে এগিয়ে যেতে পারি

হে স্রষ্টা আমাকে সেই শক্তি সেই সাহস দিও। সংসারে বড় রকমের ক্ষতি হলেও বা নিজের শত-বঞ্চনা/ক্ষতি সত্ত্বেও মনকে যেন শক্ত করে বাধতে পারি কেবল এই প্রার্থনা আমার।

আমরা ৫ নম্বর গানেও ঠিক একই রকমের আবেদন শুনতে পাই কবির কণ্ঠে। 'অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।/ নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,/ সুন্দর করো হে।/জাগ্রত করো, উদ্যত করো,/নির্ভয় করো হে।/মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।/ অন্তর মম বিকশিত করো,/অন্তরতর হে।'

কবি এ গানে তার অন্তরকে, মনকে নির্ভয়-নিঃসংশয়-নির্মল-সুন্দর করার জন্য সেই একই শক্তির কাছে প্রার্থনা করেছেন। লালন তার একটি বিখ্যাত গানে বলেছেন, 'মন না মুড়িয়ে মাথা মুড়ালে, তাই কি আর রতন মেলে'। রতন বা ভালো বা সুন্দর তখনই মিলবে যখন আগে তোমার মনকে নির্মল-সুন্দর করতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে সর্বদাই একটা সুন্দর-সত্য-মঙ্গল চিন্তা লুকায়িত থাকতো। প্রায়শই তার এই সুন্দর, মাঙ্গলিক মনোবাঞ্ছা তাঁর গানে/কবিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেত। এখানে কবি গেয়েছেন :

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণি
অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।

রবীন্দ্রনাথের মনের বীণা ছিল মনের গহীন কোণে। সেটাই মাঝে মাঝে বেজে উঠত। এইসব ক্ষেত্রে তার রচনার মর্মমূলে বাসা বেধেছিল উপনিষদ ও সুফি-বৈষ্ণদের মানবীয় তত্ত্বের উপাদান।

বাংলার লৌকিক চিন্তাদর্শের জীবনবেদ বাউল সাধনা। হাজার বছরের জীবনাচার ও মানবীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ী চিন্তার মর্মবাণী নিয়ে বাউল মতের উদ্ভব ও বিকাশ। এই মত পদ্ধতির বীজ পোতা হয় ভারতবর্ষের স্বীয় মাটিতে উদ্ভাবিত যোগতন্ত্রে, এর অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে বৌদ্ধ সহজিয়ার মানবীয় উর্বরতায় এবং এর বাল্য-কৈশোর- যৌবনত্ব- পীঢ়ত্ব অতিবাহিত হয় বাঙলার বৈষ্ণব সহজিয়ায় ও সুফি-মরমিবাদের আবহে। উদারনৈতিক মানবতা ও বিশ্ব মানবমৈত্রীর অনুষঙ্গটি বাঙলার একান্ত নিজস্ব যা মানবপ্রেমিক চণ্ডীদাস থেকে শ্রীচৈতন্য হয়ে লালন-রবীন্দ্রনাথে পরিপূর্তি ঘটে। আরো কতিপয় বাঙালি মনীষীর মধ্যে বিশেষ করে এখানে উল্লেখ করতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের নাম। মানবতাবাদের এই সুবাতাস বাঙলার রাজনৈতিক রূপকারদের মধ্যেও লেগেছিল। নেতাজী সুভাষ বসু ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বিশ্বমানবতাবাদের আকাশে এঁরা এক একটি আলোকবর্তিকা; নক্ষত্রমণ্ডলীর এক এক সদস্য। বস্তুত, বাঙালি সমাজে তথা বিশ্ব সমাজে মানবতাবাদী চেতনা স্ফূরণের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস-লালন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল একই সাজুয্যে গ্রথিত।

আর একটি গানে কবি বলছেন :

দয়া দিয়ে হবে গো মোর/জীবন ধুতে—
নইলে কি আর পারব তোমার/চরণ ছুঁতে
তোমায় দিতে পূজার জলি/ বেরিয়ে পড়ে সকল কালি,
পরাণ আমার পারি নে তাই/পায়ে থুতে।

কবি আত্মনিবেদনের এক অপূর্ব অনুভূতি এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। সত্যিকারেই যখন আমি পূজা দেবার জন্য মনস্থির করি তখন মনের যত গ্লানি-কুৎসিত দিক ভেসে উঠে; আর সে কারণেই আমার প্রকৃত আত্মনিবেদন হয় না। কাজেই দয়া দিয়ে জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, আর তা না করা পর্যন্ত চরণ ছোঁয়া সম্ভব নয়। একটি মাঙ্গলিক আকাঙ্ক্ষা থেকে কবি নিজেকে স্বচ্ছ করার, সুন্দর করার সাধনায় রত। ব্যক্তিগত মরমিচিন্তার উপাদান নিচের গানটিতে রয়েছে যা বাউল থেকে কিছুটা ভিন্ন ধারার।

এই করেছ ভালো, নিঠুর/এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর/তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে/গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে/ দেয় না কিছুই আলো।

স্রষ্টার বা ঈশ্বরের প্রেমকে পেতে হলে সেটা যে সহজে পাওয়া যাবে না বা পাওয়া যে সহজ কথা নয় এ কথা এ গানের মর্মমূলে রয়েছে। ধূপ যেমন না জ্বালালে তার গন্ধ ছড়ায় না, তেমনি দহন ছাড়া, মনে আগুন জ্বালানো ছাড়া মন শুদ্ধ হবে না।

মরণ নিয়ে কবির যে চিন্তা, যে দর্শন তা পরিপূর্ণভাবে নিচের গান দুটিতে ফুটে উঠেছে। মরণকে কবি ভয় পান না এবং মরণের জন্য তিনি সদা প্রস্তুত।

১. মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কি ধন দিবে উহারে।
ভরা আমার পরাণ খানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।...

২. ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ আমার মরণ, তুমি কহ আমারে কথা
সারা জনম তোমার লাগি/প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই দুঃখ সুখের ব্যথা।

মরণ দুয়ারে আসলে তাকে তো কিছু একটা দিতে হবে। জীবন কি মরণেই শেষ! জীবনের যে কর্ম, যে সঞ্চয়, যে অর্জন, যে কীর্তি সেইটা মরণকে আমি দিব

কিন্তু সেটি তো আমার জীবনে থাকা চাই। মরণেই তো জীবনে শেষ পরিপূর্ণতা। লালন গেয়েছেন :

এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে ॥

মানুষতত্ত্বে লালনের প্রগাঢ় ভক্তি। দরগা, ভূতপ্রেত ইত্যাদিতে তিনি বিশ্বাস করেন না– সজ্ঞানে সে মানুষের সাধনা করে। কারণ দুর্লভ মানব-জনম, এই মানব জনম সার্থক হয় মানুষ্যতত্ত্বে আস্থা থাকলে। যেহেতু মানব জন্ম আর হবে না, তাই পৃথিবীতে দ্রুত কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, অর্জন করতে হবে, যা মরণের পরও থেকে যাবে।

লালন সব সময় হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। লালসা যে সব অনিষ্টের মূল লালনের গানে সে কথা বারংবার এসেছে। তিনি লেখেন : লাটের গুরু হয়, লালস মহাশয়/ডুরি দাওরে লালন লোভ-লালসে।' গার্হস্থ্য জীবনেব বাস্তব চিত্র, দরিদ্র মানুষের জীবন সংগ্রামের নানান দিক বিশেষ করে ভাত-কাপড়ের অভাব, আধপেট খাওয়া বা না খেয়ে থাকা, না খেয়ে থাকলে পেটের যে যন্ত্রণা এসব বিষয় লালনের কাছে হর-হামেশাই ছিল দৃশ্যমান। আমরা লালনের এক গানে একই সঙ্গে পাই নিজেকে চেনা বা জানার আগ্রহ/আকাঙ্ক্ষার মতো এক সর্বজনীন দার্শনিক প্রশ্ন এবং পেটের দায়ের প্রশ্ন। যেমন :

আপন খবর নাই আপনারে
বেড়াও পরের খবর করে
মনরে আপনারে চিনলে পরে
পরকে চেনা যায় তখন ॥...

যার সাথে এই দেশে এলি
তারে আজ কোথায় হারালি
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, পেট শাখালি
তাই লয়ে পাগল লালন ॥[১১]

ষোল শতকের সন্ত এলাহাবাদের অধিবাসী কবীর (১৫২৪-১৫৯২) এক গানে গেয়েছেন :

জীবন ও মৃত্যুকে স্মরণ কর
সেখানে তাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই
সেখানে ডান হাত ও বাম হাত অভিন্ন
কবীর বলেন জ্ঞানী সেখানে বাক শূন্য;
কেননা বেদ বা গ্রন্থে কখনো সত্যকে পাওয়া যায়না।

কবীরের এ দোহাটির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের। কবীর ছিলেন হিন্দু-মুসলমান দু'ই সম্প্রদায়ের মিলনের অগ্রদূত। কবীর দুই ধর্মের বিভেদের দিক পরিহার করে

সযত্নে মধ্য পথের অনুসরণ করেন। কবীর সুফি দর্শনের মানবতাবাদী উপাদানের দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাংলার সুফি, বাংলার বৈষ্ণব ও বাউল মতের মানবতাবদী উপাদানের দ্বারা আমাদের আলোচ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ও লালন বিপুলভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাই বলা চলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবীরের ভক্ত ও লালনের অনুসারী।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
অথবা
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাইতো আমি এসিছি এই ভবে।
এই ধরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।

এই গান দু'টি লালনের একাধিক গানের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এর ভাব-ভাষা এবং মর্মবস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারলে আমরা বুঝতে পারব লালনের প্রভাব তাঁর লেখায় কতটা প্রকট। লালন গেয়েছেন :

১. আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আমি জনম ভরে একদিন দেখলাম না রে।

২. আমি আর সেই অচিন একজন
এক জয়গাতেই থাকি দুইজন
ফাঁকে থাকি লক্ষ যোজন
পারিনা চিনিতে।

৩. চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি।
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায়
ঐ খেদে ঝুরে আঁখি।[১২]

উদ্ধৃত এসব পংক্তি দুই মহান কবির চিন্তার-ভাবের মেলবন্ধন সৃষ্টি করে সন্দেহ নেই। তবু বাউল বা লালনের গানের কথা-ভাব-সুর ও মর্মার্থ অন্য কথা বলে। লালনের প্রতিটি গান প্রশ্ন-উত্তর পর্বে বিভক্ত। তাঁর গানের কথার ভঙ্গি নাটকীয় ও ভাব বস্তুধর্মী। লালনের গানে গুরুবাদ-দেহবাদ ও মানবতাবাদ আরো প্রত্যক্ষ। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-জাত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে লালন অর্কেস্ট্রাবাদন সঙ্গত করতে প্রয়াসী। অর্থাৎ লালনের গান অনেক বেশি জীবনধর্মী-বাস্তবমুখী-জীবনানুগ। রবীন্দ্রনাথের গানে বিপুল মাত্রায় ঈশ্বর বন্দনা, মরমি ভাবনা ও গীতিময়তার মধ্য দিয়ে মানব-মহিমার ও মানবপ্রেমের আহ্বান প্রকাশিত হয়েছে

এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার শব্দ ব্যবহারে যাদুকরের মতন পরগম্ভতা দেখিয়েছেন।

লালন বলেছেন, 'আত্মা আর পরমাত্মা ভিন্ন ভেদ জেন না'। বাউল দুদ্দু শাহ লালনেরই প্রিয় শিষ্য বলেছেন, 'আত্মা কোনো অলৌকিক বস্তু নয়'। বাউল হবার কারণ হিসেবে দুদ্দু শাহ বলেছেন,

তাই তো বাউল হইনু ভাই
বেদের ভেদ বিভেদের আরতো
দাবী দাওয়া নাই।

বেদ যে মানুষে মানুষে বিভেদ করে সে দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য বাউল হয়েছি। অর্থাৎ বাউল জাতধর্মের ঊর্ধ্বে। এই বাউলের সাথে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতার মাত্রাটাকে আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। বাংলার বাউল একটা স্কুল এবং বিশ্বমানতাবাদের আকর এই বাউল চিন্তার মধ্যে সর্বজনী.ন মানবতাবাদের বহু উপাদান নিহিত। এই স্কুলের গুরুমহাশয় বা প্রধান পণ্ডিত লালন শাহ ফকির। আবার এই স্কুলেরই অন্যতম ছাত্র কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুতরাং আমরা এক সমৃদ্ধ ভাষার, সংস্কৃতির ও চিন্তার এক মহান জাতি বাঙালি জাতি।

বাউলেরা কখনো পাকা দেউলের বদ্ধ প্রাচীরের মধ্যে তাঁদের আরাধ্য 'মনের মানুষ'কে অন্বেষণ করে নি। জাতপাতের ভেদ তথা মানুষে মানুষে বিভেদকে তারা কখনো মেনে নেয়নি। এই বাউলদের মতোই কবি নিজেকে 'মন্ত্রহীন' 'ব্রাত্য' এবং 'জাতিহারা' আখ্যায়িত করে 'ভেদ চিহ্নের তিলক পরা/সংকীর্ণতার ঐদ্ধত্য থেকে' 'চিরকালের মানুষের কাছে, সকল মানুষের মানুষ'-এর কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করেছেন।[১৩] এ চিরকালের মানুষকে কখনো জাতপাতের ভেদ-বিভেদে গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না। এ মানুষ মুক্ত মানুষ।

রবীন্দ্র মানসে বাউল সাধনার প্রভাব ও প্রতিফলনের কথা বলতে যেয়ে অধিকাংশ গবেষকই বাউলের 'মনের মানুষ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বকে এক করে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন, 'বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ-চন্দ্র-তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion of Man বক্তৃতাগুলিতে।' বাউলদের 'বাড়ির কাছের আরশি নগর'-এ যে 'পড়শী'র বাস, যাকে একদিনের তরে না দেখতে পাওয়ার অতলস্পর্শী আর্তিতে বিগলিত বাউলমন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর্যামী'-র মিল আছে বৈকি। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অন্য এক মানুষ লুকায়িত রয়েছেন যিনি 'মনের মানুষ', যিনি প্রেমময় কল্যাণস্বরূপ আনন্দ স্বরূপ। সেই মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্যেই বাউলদের আকুতি।'[১৪] আমরা এ একই আকুতি লক্ষ করবো রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের 'অন্ত

র্যামী' ও 'জীবনদেবতা' কবিতায়।[১৫] লালনের 'মানুষ তত্ত্বের' চিন্তা খানিকটা দেশকাল সাপেক্ষ। লালন ও তাঁর মতো অন্যান্য বাউল সাধকগণ 'মনের মানুষ' নামে যে মরমি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতেন, তাকে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধর্মতত্ত্বের ঈশ্বর বা ঐ জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে মেলানো যায় না। এই 'মনের মানুষ' বাংলাদেশের উনিশ শতকের সন্ধিলগ্নে গ্রাম বাঙলার ধর্মনিরপেক্ষ লোকমানসের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। অন্নদাশঙ্কর রায়-এর মতে, বাউল-রবীন্দ্রনাথে মানুষতত্ত্বে মিল আছে বটে, কিন্তু মানুষ বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝেছেন তা মিস্টিক পর্যায়ের, এসোবেটিক পর্যায়ের নয়।[১৬] বাউলের 'অলখমানুষ' থাকে সকল মানুষের অন্তরে। রবীন্দ্রনাথেরও 'প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে'। তাঁর এই যে স্বকীয় উপলব্ধি-এর সঙ্গে বাউল ভাবনার মিল আছে। কাজেই এ কথা বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের সঙ্গে বাউলদের 'মনের মানুষ'-এর সাজুয্য লক্ষণীয় ভাবেই বিদ্যমান।[১৭]

বাউলদের 'অধরা সাঁই' আর রবীন্দ্রনাথের 'অরূপরতন' কিংবা 'জীবনদেবতা' সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[১৮] 'জীবনদেবতা' 'মানুষ সুন্দরী' কিংবা 'বিশ্ববিমোহনী বিদেশিনী' আর 'মনের মানুষ' কখনো কখনো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, 'সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম–

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।

ইহার অনেকদিন পরে বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।[১৯]

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়—মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বাউল মনের আরো পরিচয় মিলে 'নৈবদ্য' 'স্মরণ' 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি কাব্যে। 'খেয়া' নামক রচনাটি 'আমার নাইবা হল পারে যাওয়া' গানের সমকালে রচিত।[২০] কবিতাটির কয়টি পঙক্তি এখানে উদ্ধৃতি করা যাক—

আমার নাইবা হল পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চলতে তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।

কম কিছু মোর থাকে হেথা
পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা,
আমার সেই খানেতেই কল্পলতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া।[২১]

কবি উদ্ধৃত কবিতাটির শেরোনামের নিচে লিখেছেন 'বাউলের সুর'।[২২] কবিতা হিসেবে রচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গান এবং তা বাউল সুরে রচিত। তত্ত্বগত দিক দিয়েও এটি বাউল গানের অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান থেকে বহু উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায়, যা খুব সহজেই তত্ত্বগত দিক দিয়ে তো বটেই, শব্দ ব্যবহারেও তা বাউল আবহকেই ফুটিয়ে তোলে। যে মানবদেহ বাউল সাধনার কেন্দ্রবিন্দু সেই দেহতাত্ত্বিক চেতনাও রবীন্দ্রনাথে দুর্লক্ষ নয়। 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে/কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে।'—লালনের এ গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার' গানটির তুলনামূলক বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের দেহতাত্ত্বিক আধ্যাত্ম চেতনার প্রমাণ মিলবে। এ ছাড়া, 'তার অন্ত নাই গো অন্ত নাই' , 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে' 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে' প্রভৃতি গান রচিত হয়েছে বাউলদের দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানের ধাঁচে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' 'পাগলা হাওয়ার বাদলা দিনে' 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে' 'আমারে ডাক দিল কে' 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে' ইত্যাদি গানের সুরও বাউল সুর। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাউল গানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকালে আধুনিক। হাল আমলের কলেজ পাস করা বিদ্বানরা সেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরেজি পড়ুয়া বাউলের গান আছে, দেখেছি তা, অস্পৃশ্য। আমার অনেক গান বাউল ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টা করিনি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র–বাউলের রচনা।[২৩]

বাউল সম্প্রদায়ের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিভেদ এবং জাতপাতের ব্যবধান কখনোই গুরুত্ব পায়নি। মানুষকেই তারা দেবতা জ্ঞান করেন। বাউল-বৈষ্ণব-সুফি মত অনুযায়ী বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজ করেন।[২৪]

বাউল গানে রবীন্দ্রনাথ আপন আত্মার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তাই বাউল দর্শনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সখ্য গড়ে উঠেছিল।[২৫] 'মেষ সপ্তক' কাব্যের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় এ সখ্যের অকপট প্রকাশ ঘটেছে এভাবে—

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়াল
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার ক্ষ্যাপা সুরে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অটল-অনড় প্রাচীরের বাইরে বাউলের যে মুক্তিধর্ম, মানবদেহ-মন্দির-আশ্রিত পরমের যে সাধনা তাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তাই একজন বাউলের মতোই তিনি নিজের অন্তরের মধ্যেই আত্মার আত্মীয়কে সন্ধান করতে চেয়েছেন।

নির্বাচিত লোককবি ও সংগীত

ভূমিকা

বাংলার হাজার বছর লালিত উদারনৈতিক সমাজে উদগত লোকধর্মের নির্যাসে সিক্ত মানবতাবাদী চেতনা কালে কালে বহু লোককবির জন্ম দিয়েছে। এঁদের মধ্যে লালন, দুদ্দু শাহ, দুর্বিন শাহ, পাগলা কানাই, শাহ্ আবদুল করিম প্রমুখের গানের মর্মবাণীতে ধরা পড়েছে সমাজের বাস্তব সমস্যা। সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, ধর্মান্ধতাসহ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিও এসব লোককবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ এর চরম বিরোধী লোকধর্ম। আর সেই লোকধর্মের জারক রসে জারিত আমাদের লোককবিকুল। 'শোনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' চণ্ডীদাসের এই অমিয় বাণী অথবা নানাবরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত, অজ্ঞাত লোককবির এই বাণী নিয়েই আমরা আমাদের লোক কবিকুলের মানসভূবনের খবর জানতে পারি। পনের শতকের বাঙলায় 'কলিযুগ সর্বযুগসার', শ্রীচৈতন্য ভক্তরা যখন একথা বলেন তখন বোঝা যায় লোকসমাজেও যুগচেতনায় একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তারা অবলীলায় শ্রেণী সমাজের তৈরি কঠোর ধর্মবিধান ও আচার-নিয়মকে অমান্য করছে। এই যে অমান্য করার সাহস এটা কিন্তু এক দিনের নয়, এটার রয়েছে বহুদিনের ঐতিহ্য। ভারতের আদিম মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলোর প্রকৃতিবাদ ও যাদুধর্মের মধ্যে বস্তুবাদের জন্ম হবার কথা অনেকে বিবেচনা করেছেন। প্রাচীন ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। ইহজীবন বিমুখ বা আধ্যাতিকতায় মগ্ন থাকলে এসব কিছুতেই সম্ভব হতো না। চার্বাকরা সম্পূর্ণ ইহবাদী। যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে বিবর্তিত হয়ে নাথমত, অবধূত মার্গ, সহজিয়া ধর্ম এবং পরিশেষে বাউল মতের

উদ্ভব ঘটে। এ মতগুলোতে বর্ণাশ্রমের কোনো স্থান নেই। মমতাজুর রহমান তরফদার বাঙালির ধর্মজীবন আলোচনায় বলেন, 'বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম থেকেই বোধ হয় মধ্যযুগের বাংলায় বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শন ও সাধনার উদ্ভব ঘটেছিল।' আমরা একথা অবলীলায় বলতে পারি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বাউল চিন্তার অনেক খানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাউলদের মিথুনক্রিয়ার সঙ্গেও বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মিল আছে। বাউলদের ইহবাদী চেতনার ভিত্তি বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম।

বক্ষমান গ্রন্থের নির্বাচিত লোককবিদের সময়কাল আঠার থেকে বিশ শতক অবধি। লালনের জন্ম ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০) এক দশকের মধ্যে। তার গানের মর্মবাণীতে ধরা পড়েছিল বাস্তব সমস্যা। খাজনাদায়গ্রস্ত কৃষকের পক্ষ যখন পেটের খোরাক জোগাড় করা ছিল কঠিন। লালনের এক গানে আমরা পাই :

সিরাজ সাঁই কয় পেট শাখালি
তাই লয়ে লালন পাগল।

সমাজের নানা অসঙ্গতি তাঁর গানে ধরা পড়েছিল। সমাজের সেই সব বিচ্যুতি দূর করতে তিনি নিজস্ব এক অনন্য দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন তাঁর গানে। লালন প্রশ্ন তুলেছেন ধর্ম গ্রন্থসমূহ অপৌরষ্য কিনা। আবার একই গানে তিনি প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান টেনেছেন :

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন খোদা পাঠায় ॥
এক এক দেশে এক এক বাণী, পাঠান কি সাঁই গুণমণি।
মানুষের রচনা জানি লালন ফকির কয় ॥

লালন ছিলেন বস্তুবাদী চিন্তার অধিকারী। তিনি স্পষ্টই বলেছেন লালন বস্তুবিখারী। অর্থাৎ যা সত্য, যথার্থ এবং যা চোখে দেখা যায় বা প্রকৃতপক্ষেই যা ঘটে। প্রাচীন ভারতের চার্বাক এবং বাংলার বাউল সবসময় প্রত্যক্ষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

লোক কবি পাগলা কানাই মানুষে মানুষে বিভিন্নতা বা জাতবিভাজন একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বলেন : 'কেউ বলে দুর্গা হরি। কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরী /তবু পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়।' সর্বজনীন মানবতাবাদের প্রবক্তা পাঞ্জু শাহ'র মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব-কলহমুক্ত অসম্প্রদায়িক সমাজ চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। কোনো শাস্ত্রানুসারে স্বর্গলভ্য নয়–সুতরাং পাঞ্জুর নির্দেশ : 'দেহ চিনে সাঁই ধর/পার পাবা পারাপায়।'

বাউল সমাজের কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের মহাবাণী হলো বর্তমান মানি, অনুমান মানি না। প্রত্যক্ষ মানি, অদেখা মানি না। লালন বলেন, 'শুনতে নাই আন্দাজী কথা বর্তমান জান হেথা'। দুদ্দু শাহ বলেন, 'পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে, চক্ষু না দেয় অনুমানে'। সহজতত্ত্ব প্রকাশে মনুলাল মিশ্র বলেছেন যে, তাদের সত্য ধর্মে অনুমানের স্থান নেই, তারা বর্তমান পন্থী।

দেহেই ব্রহ্ম আছেন, তাকে দেখা যায়;
তথাপি রাজের হল না সে জ্ঞান তাই ভাবে অনুমান
পরের কথা শুনবে কেনে পেলে বর্তমান। (রাজের পদ)

বহু কালব্যাপী মানুষের খণ্ডিত উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতার সমন্বিত ফল দেহসাধনা তত্ত্ব। দশ ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব পৃথিবীর দেহ সাধকদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।। দুদ্দু বলেছেন, 'দেহ ছাড়া জ্ঞান থাকে নাই', 'আকার ছাড়া সাকার না রয় আকারেতে সাকার রয়', কিংবা 'বস্তুকেই আত্মা বলা যায়। আত্মা কোনো আলৌকিক বস্তু নয়'।

প্রাচীন ভারতের অশোক, পরে আকবর, আরো পরে আকবরের প্রোপৌত্র দারাশিকো প্রমুখ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন। জাতিভেদ বিরোধী ছিলেন বৌদ্ধ, জৈন, বস্তুবাদী আজিবিক, আদিম জনজাতিগণ, লৌকিক তন্ত্র। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন জাতিভেদ অগ্রাহ্য করেছে। বাঙলার কর্তাভজা,সাহেবধনী, খুশি বিশ্বাসী, মতুয়া, সহজিয়া বৈষ্ণব প্রভৃতি লোকায়ত গোষ্ঠী জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন চালিয়েছেন। আব, আতস, খাক, বাদ এবং রজঃবীজ, মূল বস্তুর সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত হয় মানবদেহ, প্রত্যেকটি মানব শিশু একই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় মাতৃজঠর থেকে জন্ম লাভ করে, বাতাস দ্বারা জীবন নির্বাহ করে, খাদ্য দ্বারা বড় হয় পুষ্ট হয়, বেঁচে থেকে সুখ, শান্তি এবং আনন্দ ভোগ করতে চায়। প্রকৃতি-প্রতিবেশ, জলবায়ু ও পিতামাতার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বাহ্যিকভাবে বর্ণ, উচ্চতা অবয়বগত পার্থক্য হয় মানুষে মানুষে। তাই বাউল কবি পাঞ্জু শাহর কণ্ঠে শুনি :

জেতের বড়াই কি/ ইহকাল পরকাল জেতে করে কি।
মনে বলে অগ্নি জ্বেলে দেব রে জেতের মুখি ॥

ইরানের সুফিমত ও ভারতের বেদান্ততত্ত্ব বাঙলার মাটিতে বাউলবাণীতে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছে। সুফি-বৈষ্ণবদের মত গানের মাধ্যমেই বাউলদের সাধন–ভজন চলে :

'বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।'

বাউল সাধনার মর্মকথা বাউল কবির ভাষায় এরূপ :

'সখি গো, জন্ম মৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁহার সঙ্গে প্রেম গো চাই।'
'উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।'

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এ উক্তির প্রকাশ ঘটেছে বাউলদের চিন্তাভাবনায়; এর প্রকাশ ঘটেছে বাউলদের শাস্ত্র বিমুখতায়, তাদের গুরুবাদে এবং চারিচন্দ্রভেদ সাধনায়। বাউলদের শাস্ত্রবিমুখতার দিকটি তলিয়ে

দেখলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, বাউলদের নিকট তত্ত্বের জন্য মানুষ নয়। তাদের মতে মানুষ কোনো তত্ত্ব বা শাস্ত্রের অধীন নয়। শাস্ত্র কখনও মানুষের উপর স্থান পেতে পারে না। শাস্ত্র মানা যেমন মানুষের উচিত নয়; তেমনি শাস্ত্র প্রণয়ন করাও মানুষের কাজ নয়। মানুষ সাধনার দ্বারা নিজেকে জানবে এবং এই নিজেকে জানা ও উপলব্ধি করার মাধ্যমে প্রকৃত আত্মার সন্ধান পাবে। বাউল পদ্মলোচন বলেন যে, মানুষের হৃদয়বিহারী গোঁসাই স্বয়ং পুরাণের বাইরের একটি নতুন পথের খবর মানুষকে দেন :

ও সে বেদের কারণ ওলট-পালট করে
নতুন পথের খবর দিয়েছেন মোদেরে।
জীবে লাগিয়ে ধান্দা করিল বান্দা
বস্তা-বন্দী বেদ-পুরাণের।

তাহলে মানুষ মানুষকে পথ দেখাতে পারে। বাউলদের গুরুবাদে এ বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ জ্ঞান করা বাউল মানে না। তাই ত তাদের গানে পাই, জগত বেড়ে জাতির কথা/ লোকে গৌরব করে, যথাতথা/ লালন বলে জাতির ফাতা/ ডুবাইছি সাধ-বাজরে। অথবা প্রশ্ন : যখন তুমি ভবে এলে/ তখন তুমি কি জাত ছিলে/ কি জাত হবা যাবার কালে/ সেই কথা কেনো বল না'।

মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সাম্যের বাণী, মানবহিতৈষণার বাণী বাউলরা বিগত কয়েক শতক ধরে প্রচার করছে, তাদের জীবনাচারও উদার মানবতাবাদের অনুষঙ্গী। এ কারণেই বাঙলার মানুষ আজও ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শান্তি ও বিরোধহীন অবস্থায় একত্রে বসবাস করার আশা পোষণ করে এবং সাধারণ মানুষের মনে এখনও ঔদার্যভাব লক্ষ্য করা যায়। মানবতাবাদের যে বীজ তারা বপন করেছে, আমাদের লোকসমাজকে এবং লোকধর্মকে যে উজ্জ্বলতা দান করেছে, তার আলোকবর্তিকা আমাদের লৌকিক ঐতিহ্যে যে দীর্ঘকাল বিরাজ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাউল ছিল ইন্দ্রিয় দমন বিরোধী। আবার নির্বিচার ইন্দ্রিয় চর্চায় আসে ক্ষয়, মৃত্যু জরা। তাই দেহমিলন তত্ত্বের গুপ্তবিদ্যা সে শিক্ষা করে। গান ও অন্যান্য কলার চর্চা বাউলের পরম আনন্দ। মানসিক সুখ তার প্রার্থিত। দুদ্দু বলেছেন আত্মসুখ ব্যভিচার। অন্যকে সুখ দেয়া; অন্যকে সুখের অংশ দেয়া বাস্তবে বাউল অনুশীলন করে। নরনারীর স্বাধীন মিলনের সে সমর্থক, আনন্দই মনুষ্য জন্মের স্বাধীন অধিকার। নারী বাউল পন্থায় পূজার্হা। তার সেবা, সুখবিধান জীবনের কর্তব্য বলে বাউল মনে করে। ভারতীয় দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যগুলো বাউল দর্শনে অভিব্যক্ত হয়েছে। বেদ, পরলোক, ঈশ্বর জাতিভেদ এসবই বাউল মতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। লালন নিজেকে 'বস্তু ভিখারী' বলেছেন। বাউল পুরোহিত,

অনুমান অগ্রাহ্য করে। পূর্ব-পুনর্জন্ম, পরলোক, পাপ-পুণ্যের দর্শনে সে অবিশ্বাসী। সাধক দুদ্দু শাহ্ বলেন,

বস্তুবাদী বাউল আদ্য কেহ কেহ হয়
না করে অনুমান ভজন করে না মুক্তির অন্বেষণ
জীবনই সত্য নিরূপণ দীন দুদ্দু জানায়।

কখনও আবার প্রতিবিপ্লবী চিত্র লোকগীতির বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। লোকসংস্কৃতি সমাজের গভীরে অবস্থিত জীবন-সংগ্রামের বিম্বিত রূপ। এর মধ্যে রয়েছে শ্রেণী চেতনা ও দ্বান্দ্বিকতার বিশেষ রূপ। গোর্কির ভাষায়, 'The true history of the toiling people can not be learnt without a knowledge of the folklore.' রুশ লোকসংস্কৃতিবিদ শেকোলোভ লোকসংস্কৃতির মধ্যে বিশেষভাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন— 'Folklore has been and continuous to be a reflection and weapon of class conflict.'

গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের লৌকিক ভাষায় এই সংস্কৃতির বিকাশ। লোকগীতির ক্ষেত্রও এক। দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা যখন তাদের মনকে অশান্ত করে তোলে তখনই তাদের মুখের ভাষায় সহজ স্বচ্ছন্দ্য সুরে লোকগীতি সৃষ্টি হয় এবং সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তা এক নতুন মাত্রা পায়। হিন্দুধর্ম যখন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কবলে পড়ে নাভিশ্বাস ফেলেছে, যখন হিন্দুধর্মের যুক্ত চরিত্র লুপ্তপ্রায় এবং বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ, তখন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা; জাতের বেড়াজাল ডিঙিয়ে মানবধর্মের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশের প্রবল ইচ্ছা। অন্যদিকে মুসলমান সমাজেও সেই একই অবস্থা। ঠিক এই সময়ে এই সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রতি আঘাত হেনে দুদ্দ শাহের কণ্ঠে ভেসে ওঠে:

বলিহারি এক জাত এই ব্রাহ্মণ ভবে
ব্রহ্মত্বে খোঁজ নাহি দেখি ক্রিংহ্রিং দিয়ে ঠকায় সবে।
সার করছে টিকি আর পৈতে
জাতের বড়াই করে খেতে আর শুতে
মুখের সেরা শুকনো ট্যারা সাধু কে আখ্যা দেবে।

উনিশ শতকে সমাজজীবনে জাতপাত এবং ধর্মের নামে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যা সমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা কিন্তু গ্রামীণ মানুষ বুঝতে পেরেছিল এবং তার প্রতিবাদ তারা গানের মাধ্যমে করেছিল। আঠারো ও উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে আমাদের অবশ্যই লোকবিদদের সমাজ চিন্তার খবর জানতে হবে।

আমাদের লোগীতিগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ সংগতের মধ্যে রূপকের আড়ালে লুকিয়ে আছে বস্তুতান্ত্রিকতা অর্থাৎ জীবনযন্ত্রণা, জীবনের সংঘাত ও প্রতিবাদ। যেমন :

রাজেশ্বর রাজা যিনি/ চোরের সেও শিরোমণি
নালিশ করবো আমি/ কোনখানে কার নিকটে
গেল ধনমান আমার/ খালি ঘর দেখি জমার
লালন কয় খাজনারও দায়/ কখন যেন যায় লুটে।

আমরা এখানে দেখতে পাই বস্তুবাদী জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। বল্লাল সেনের সময়ে কৌলিন্য প্রথা কড়াকাড়িভাবে আরোপের বিষয়ে দুদ্দু শাহ বলেন :

বল্লাল সেন শয়তানী দাগায়
গোত্রজাত সৃষ্টি করে যায়
বেদান্তে আছে কোথায়, আমরা দিখি নাই।
জাতি আর সম্প্রদায় মিলে।

শেণীসমাজের দারিদ্র্যের গর্ভেই লোকগীতির জন্ম। অর্থনৈতিক নিষ্পেণের ফলে গ্রামীণ মানুষের মনে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে এক ধরনের দ্রোহ সৃষ্টি হয়। যেমন : 'ভাইরে দেশে আছে দুইডা জাত/একটা থাকে রাজপাটেতে,/আরেকজনের দুঃখেতে প্রান ফাটে/ও ভাই চিনির লাইগা পথ্য হয়না/কেউবা খায় মিছরির পাক।' এখানে দ্বান্দ্বিক চিন্তাচেতনার বিকাশ এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের রূপটি ফুটে উঠেছে। দুর্বিন শাহ এক গানে গেয়েছেন :

নামাজ আমার হইল না আদায়
নামাজ আমি পড়তে পারলাম না, দারুণ খান্নাছের দায় ॥
ফজরের নামাজের কালে, ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে
জোহর গেল আইতে-যাইতে, আছর গেল কামের দায় ॥
মাগরিবের নামাজের কালে, গিয়াছিলাম গোয়ালঘরে
গাভী রইল হাওরেতে, বাছুর আমার বান্ধা নায় ॥
এশার নামাজ কালে, বিবি বলে চাউল ফুরাইছে
ছেলে মেয়ের কান্দন শুনে কান্দে পাগল দুর্বিন শায় ॥

লোকদর্শন-লোকধর্ম-লোককবি যেন এক পরিপূরক শব্দগুচ্ছ, যেন একে অপরের সহদর। আমাদের অন্যন্যবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লোকধর্মই মুক্তিকামী বাঙালির মৌল প্রেরণার সার। এ লোকধর্মজাত দর্শন তাকে মানবতাবাদী হবার, ভাল মানুষ হবার প্রেরণা যুগিয়েছে। বাংলার লোকদর্শনে সমন্বয় ও মানবতাবাদের আকর উপাদান রয়েছে। এই উপাদানের যোগান্দার বাংলার নদী, বাংলার ভূগোল, বন-জঙ্গল, এবং অসংখ্য নৃ-জাতি ও ট্রাইবের সম্মিলনে গড়ে উঠা লোকসমাজ। তাই এখানে জন্ম গৌতম বুদ্ধের, শীলভদ্র-অতীশ দীপঙ্করের, মাহত্মা লালন-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুভাস-মুজিবের, অমর্ত্য সেনের। হাজার বছরে গড়ে উঠা সমন্বয়বাদের ও মানবতাবাদের উপাদান আজও জনমনে সমানভাবে প্রবাহিত। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদ, মোল্লাবাদ তথা মৌলবাদ বারবার চাপানোর চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থতার গ্লানি তাকে নিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের লোককবিরা বৌদ্ধউর্বর-সুফিউর্বর-বৈষ্ণবউর্বর সমাজমনের জারক রসে জারিত হয়ে মিলনের

গান, সাম্যের গান, সমন্বয়ের গান রচনা করেছেন এবং তা গ্রাম-গ্রামান্তরে পরিবেশন করেছেন। আমাদের এখন কাজ হাজার বছরের সমাজ জীবন থেকে জীবনমুখী-সাম্যমুখী উপাদান খুঁজে বের করে তা ঐতিহ্য হিসেবে সামনে নিয়ে আসা।

আজ পৃথিবীর প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী দেশই তাদের অতীত ঐতিহ্য, গণজীবনের অতীত ঘটনা ও অতীত গণআন্দোলনের ইতিহাস উদ্ধার করছে—সেই সঙ্গে গণআন্দোলনের বিশেষ হাতিয়ার লোককবি, চারণ কবিদের দান স্বীকার করে ইতিহাস পর্যায়ে জাতির সামনে তুলে ধরছে। আজ আমাদেরও দায়িত্ব হবে বাংলার মাটিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশার মানুষের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের সে কাহিনীকে আমাদের ঐতিহ্য হিসেবে সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে জাতির সামনে তুলে ধরা; সেই সঙ্গে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত লোককবিদের স্বীকৃতি দেয়াও আমাদের কর্তব্য। কোনো দেশ বা জাতির প্রাণস্পন্দন তার লোকসমাজ। আর এই লোকসমাজই লোককবির মানস গঠনের পরিমণ্ডল। আমরা লোককবির মানসভুবনে সর্বদাই ক্রিয়াশীল দেখি সাম্যবোধ, ভ্রাতৃবোধ এবং উদারনৈতিক মানবতাবাদের স্ফূরণ। আমরা যদি গবেষণার মাধ্যমে এগুলো যোগাড় করে শিক্ষার সব পর্যায়ে এর বিস্তার ঘটাতে সমর্থ হই তাহলে অদূরভবিষ্যতে হিংসা-দ্বেষহীন প্রেম–ভক্তিপূর্ণ, শোষণমুক্ত এক সার্বজনীন সমাজ গঠনে আমরা সমর্থ হবো। সেই দিন তরান্বিত হোক এই-ই হোক আমাদের সবার কাম্য। আর এই কামনা থেকে কতিপয় বিখ্যাত লোককবির গান এখানে পরিবেশন করা হলো।

লালন

১

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়।
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন্ খোদা পাঠায় ॥
এক যুগে যা পাঠায় কালাম
আর যুগে তা হয় কেনো হারাম
দেশে দেশে এমনি তামাম
ভিন্ন দেখা যায়॥
যদি একই খোদার হয় রচনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না
মানুষের সকল রচনা
তাইতে ভিন্ন হয়॥
এক এক দেশে এক এক বাণী
পাঠান কি সাঁই গুণমণি
মানুষের রচনা জানি
লালন ফকির কয়॥

২

না হলে মন সরলা, কি ধন মেলে কোথা ধু'ড়ে।
হাতে হাতে বেড়াও কেবল তৌবা প'ড়ে॥
মুখে যে পড়ে কালাম, তারই সুনাম
হুজরি বাড়ে।
যার মন খাঁটি নয়, বাঁধলে কি হয়,
বনে কুঁড়ে ॥
মক্কা যাবি ধাক্কা খাবি
মন না মুড়ে।
হাজি নাম পাড়াবি লোক জানাবি
জগৎ জুড়ে ॥
মন যার হয়েছে খাটি, মুখে যদি
গলদ পড়ে।
খোদা তারে নারাজ নয় রে
লালন ভেড়ে ॥

৩

সত্য বল্ সুপথে চল্ ওরে আমার মন।
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবে না মানুষের দরশন॥
খরিদ্‌দার মহাজন যে জন
ও তার বাট্‌খারাতে কম
তারে কসুর করবে যম,
গদিয়ান মহাজন যে জন
বসে কেনে প্রেম-রতন॥
পরের দ্রব্য পরের নারী
হরণ করো না
পারে যেতে পারবে না,
(তোমার) ততোবার হবে জনম॥
লালন ফকির আসলে মিথ্যে
ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে,
সই হলো না এক মন দিতে
আসলেতে প'ল কম॥

৪

সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে, জাতির কি রূপ দেখলাম না দুই নজরে॥
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কিসে রে ॥
কেউ মালা কেউ তসবী গলে
তাইতে কি জাত্ ভিন্ন বলে
আসা কিংবা যাবার কালে
জাতির চিহ্ন রয় কারে॥
জগত বেড়ে জাতির কথা
লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন বলে জাতির ফাতা
ডুবাইছি সাধু-বাজারে॥

৫

জাত গেল জাত গেল ব'লে একি আজব কারখানা।
সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সব দেখি তানা-নানা॥
যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কি জাত ছিলে
কি জাত হবা যাবার কালে
সেই কথা কেনো বল না॥
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, চামার, মুচি
এক জলে সকলেই শুচি
দেখে শুনে হয় না রুচি
যমে তো কাকেও থোবে না ॥
গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায়
তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়
লালন বলে জাত কারে কয়
এই ভ্রম তো গেলা না ॥

রবীন্দ্রনাথ

৬

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন-মাঝে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরানে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

৭

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয় নি সে গান গাওয়া—
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার
বাঁধে নাই সে কথা,
সুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা
আজো ফোটে নাই সে ফুল, শুধু
বহেছে এক হাওয়া।

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ড়াণে ড়াণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন
করে আসা-যাওয়া।

শুধু আসন পাতা হল আমার
সারাটি দিন ধ'রে—
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকব কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয় নি আমার পাওয়া।

৮

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে।

চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি।

৯

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।

মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
দুঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।

১০

ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুনতে কি পাস দূরের থেকে
পারের বাঁশি উঠছে বাজি।
তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেকবে এবার ঘাটে এসে।
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে
দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি

যেন আমার লাগছে মনে,
মন্দমধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার
আঁধার বেয়ে আসছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি
কিছু এনেছিলেম তুলি,
যেগুলি তার নবীন আছে
এই বেলা নে সাজিয়ে সাজি।

শাহ্ নজির

১১

করবে কি হে 'জাইতে'র বিচার এসব ফেলে যেতে হবে্
তোমার সকলি যে থাক্‌বে পড়ে, 'হু' হক নামটি সঙ্গে যাবে ॥
দেখ ভাই হিন্দু-মুসলমান
ভাবছ সবে ভিন্ন ভিন্ন
এসব ঘুচবে সে দিন
তোমায় যে দিন
দীন ইসলাম তলব দিবে।
গড়েছে এক কারিগরে
স্ত্রী আর পুরুষেরে
দুনিয়ার কারবারের তরে
শেষে আদিতে আদি মিশিবে।

কিন্তু ছাপাতে যে উপাধি হয়
জাত সে জাতিতে রয়
উপাধি নামমাত্র হয়
সেই এক জাতিতে মিশতে হবে।
লা হসে (?) আকবর করে খানা
হুসেনী তফসীর খুলে দেখ না
'হারবেল আরদ' আপনার চেনা
তবে চিন্‌বে আপন রবে।
কোয়াকার হতে এক নমুনা
ঐ নমুনা হতে এক নিশানা
নিশানা কেবল আপনার চেনা
তাহাতে সে ধরা দিবে।
দেখ না এই জাতি কুল
সকলেরি আছে ভুল
আখেরেতে সেই জাতি কুল
জাতিতে জাতি মিশিবে
শাহ্ নজিরের চরণ তলে
আই এদল ইসলাম ভেবে বলে
যেন মায়াতে মন নাই ভুলে
আখেরে ড়াণিকার শ্রীচরণ দিবে।

রশিদ

১২

কই কই কই, কই সে জনে।
কে জানে সে জানে ॥
খুঁজি তারে স্থানে স্থানে, বনে-উপবনে
মসজিদ ও মন্দিরে আমি তারে খুঁজে পাইনে
কেহই বলে না কোথায় সে জনে
যদি জান কেউ বলে দেও
যাই তার অন্বেষণে।
বায়ু কি অনলে, জলে কিংবা স্থলে
থাক সে কি আকাশে—কিংবা সে পাতালে

তারে দেখিতে মন ব্যাকুল, অকুল সাগরে ভাসি
তাহারই কারণে।
আমি যার লাগি ঘুরি সদা সে তো মনে করে না
রশিদ বলে তারে চেনা গেল না
তার কি বা রূপ কেহই বলে না।

জহর

১৩

প্রেম রসিক হবো কেমনে।
করে মানা কাম ছাড়ে না মদনে ॥
মদন করে তৌসিলদারী এই দেহের মাঝার
মদন তো দুষ্ট ভারি তারে দেও তৌসিলদারী
করে হাকিম মুন্সীগিরি গোপনে।
চোর দিয়ে সব করায় চুরি একি কারখানা
আমি সে ভাব জিজ্ঞাসিলে বলে মুই জানিনা।
চোরে বা চুরি করে, সাধু সব পালায় ওরে
সাধু থাকে কোন্ শহরে গোপনে।
অধীন জহর কেঁদে বলে, 'ফকির সাঁয়ের পায়
স্বামীতে মারিলে নালিশ করিব কার ঠাঁয়
তুমি মোর প্রাণপতি, কি দিয়ে রাখবো মতি
কেমনে হবো সতী চরণে।

আছের

১৪

হঠাৎ নালিশ হয় কি মতে।
দিন শমন জারী হাতে হাতে॥
আমার উকিল যারা ছিল, তারা সব চলে গেল
আমার জামিন কেউ না হইল, আমায় ঘিরে নিলো দণ্ডকেতে ॥
তোমার বধূ যারা ছিল, আমার পোশাক কেড়ে নিল
আমায় জেলখানার পোশাক পরাল, আমায় রাখলো অন্ধকার গারদেতে

তারা সবে চলে গেল, মনকির নকির দু'জন এলো
আমার ডানে বামে দাঁড়াইলো, আমার জবানবন্দী নেয় হরেক বাতে ॥
বছর এসে যেদিন খুলবে তালা, দেখতে পাবি ও মন ভোলা
অধীন আছের বলে সাঁই রব্বানা, আমার আপিলের দিন কেয়ামতে ॥

দুর্বিন শাহ

১৫

ও আমার কৃষক-চাষী ভাই
বেঁকা লাঙ্গল মোদের সম্বল, চল মাঠে চল, হাল বাইতে যাই

কৃষক-চাষী ভাই, টিকিয়া জ্বালাও তামাক ভর
বসে বসে খাই, মোরা বসে বসে খাই
যাইয়া মাঠে নেশার চোটে, লাঙ্গল চালাই ॥

কৃষক-চাষী ভাই, ধান, ভুট্টা, গেহু, আটা
আরও মাসকালাই, ভাই রে আরও মাসকালাই
এসব শস্য-বীজ বুনিয়া, জীবন বাঁচাই ॥

কৃষক-চাষী ভাই, ছেলে-বৃদ্ধ-যুবক চল
সবে মিলে যাই, চল সবে মিলে যাই
দুর্বিন শাহের নিবেদন, সবারে জানাই॥

১৬

নামাজ আমার হইল না আদায়
নামাজ আমি পড়তে পারলাম না, দারুণ খান্নাছের দায় ॥

ফজরের নামাজের কালে, ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে
জোহর গেল আইতে-যাইতে, আছর গেল কামের দায় ॥

মাগরিবের নামাজের কালে, গিয়াছিলাম গোয়ালঘরে
গাভী রইল হাওরেতে, বাছুর আমার বান্ধা নায় ॥

এশার নামাজ কালে, বিবি বলে চাউল ফুরাইছে
ছেলে মেয়ের কান্দন শুনে কান্দে পাগল দুর্বিন শায়

হাসন রাজা

১৭

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে
কান্দে হাসন রাজার মন মনিয়া রে ॥

মায়ে বাপে বন্দী কইলা, খুশির মাঝারে
লালে ধলায় বন্দী হইলাম, পিঞ্জিরার মাঝারে ॥

উড়িয়া যায় রে ময়না পাখি, পিঞ্জিরায় হইল বন্দি
মায়ে বাপে লাগাইলা, মায়া জালের আন্দি ॥

পিঞ্জিরায় সামাইয়া ময়নায় ছটফট করে
মজবুত পিঞ্জিরা ময়নায়, ভাঙ্গিতে না পারে ॥

উড়িয়া যাইব শুয়া পক্ষী, পড়িয়া রইব কায়া
কিসের দেশ কিস্সের খেশ, কিসের দয়া মায়া ॥

ময়নাকে পালিতে আছি দুধ কলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়নায় না চাইব ফিরিয়া ॥

হাসন রাজায় ডাকব তখন ময়না আয়রে আয়
এমন নিষ্ঠুর ময়নায়, আর কি ফিরিয়া চায় ॥

১৮

লোকে বলে লোকে বলে রে, ঘরবাড়ি ভালা নয় আমার
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার ॥

ভালা করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকব আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকা চুল আমার ॥

এই ভাবিয়া হাসন রাজায় ঘর দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে ॥

হাসন রাজায় বুঝতো যদি বাঁচব কতদিন
দালান কোঠা বানাইত করিয়া রঙিন ॥

দানহ্ান

১৯

মন ছাড়লে না তর দুনিয়া খেলা
গেল বেলা ॥

যতই খেলা খেল ভবে, খেলা কি তর সঙ্গে যাবে
সব খেলা ভেঙে নিবে তাই কি মন হইছ ভুলা ॥

ভবে যার জন্যেতে মন আসা হল, বল শুনিরে তার কি হল শয়নেতে
রাত্র গেল দিন হইলে কামের জ্বালা ॥

দীনহীনে করছ কি ছন্দি, মায়াতে রহিলে বন্দি
ছাড় মনের ছন্দি ফন্দি অন্তরে দিও নামের মালা ॥

২০

মন তুই যাবিরে আপন কীর্তি কইরে মন তুই যাবিরে
হয় না মানুষের সঙ্গ আর কি মানুষ পাবিরে ॥

হয়ে পঞ্চ ভূতাশ্রিত, শিখিলে পশুর চরিত্র
কামক্রোধে অবিরত মন তুই ভুইলে রইলে ॥

মানুষাকৃতি মানব জীবন, গেলরে মন তর অকারণ
আর হবে না এমন জীবন এমন সহজ প্রেম না পারিবে ॥

সর্বোত্তম নর লিলা দেখলিনারে মন পাগেলা
দীনহীন করিসনে হেলা আর মানুষ না হবিরে ॥

শাহ আবদুল করিম

২১

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটু গান গাইতাম ॥

বর্ষা যখন হইত গাজির গাইন আইত
রঙ্গে-চঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম
বাউলা গান ঘাঁটু গান আনন্দের তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ॥
হিন্দু বাড়িন্ত যাত্রা গান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম
কে হবে মেম্বার কে হবে গ্রামসরকার
আমরা কি তার খবর লইতাম ॥

বিবাদ ঘটিলে পঞ্চাইতের বলে
গরিব কাঙালে বিচার পাইতাম
মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল বড়লোক হইতাম ॥

করিব ভাবনা সেদিন আর পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম ॥

২২

মানুষ হয়ে তালাশ করলে মানুষ পায়
নইলে মানুষ মিলে না রে বিফলে জনম যায় ॥

মানুষের ভক্ত যারা আত্মসুখ বোঝে না তারা
দমের ঘরে দেয় পাহারা মনমানুষ ধরবার আশায় ॥

যে মানুষ পরশরতন সেই মানুষ গোপনের গোপন
দেয় না ধরা থাকতে জীবন, পথে গেলে পথ ভোলায় ॥

মানুষে মানুষ আছে পাপীতাপী সবার কাছে
ফাঁদ পেতে চাঁদ যে ধরেছে চাঁদ দেখে অমাবস্যায় ॥
মানুষ আছে বিশ্বজোড়া সহজে সে দেয় না ধরা
আবদুল করিম বুদ্ধি হারা ঘর থুইয়া বাইরে ঘুরায় ॥

রাধারমণ দত্ত

২৩

যাবে যদি মন সহজ ভাবের দেশে
অধর মানুষ বিরাজ করে সহর রসে ॥

হিংসা নিন্দা খুটিনাটি কৈতবাদি ময়লামাটি ছেড়ে হও খাঁটি
ত্যেজে গরল হও রে সরল রিপু ইন্দ্রিয় নেও বশে ॥

সহজ রসে অধর ধরা সহজের ফুল জিতে মরা হইলে হয় সারা
দেহতরী শ্রদ্ধা পালে অনুরাগে বাতাসে ॥

সহজরস আনন্দ চিন্ময় সহজ ভাবে নারী প্রেমের উদয় সাধলে সিদ্ধ হয়
রাধারমণ বলে মন রে রইলে কার আশে ॥

২৪

দিন তো গেল রে মনা ভাই অবুঝারে বুঝাইতে
সারাদিন কর হাতের কাম
সন্ধ্যা হইলে লইও শ্রী গুরুর নাম
নামটি লইও রে পরম যতনে রে ॥

লাভ করিতে বাণিজ্যে আইলাম
লাভ না করিরে তরী রাইখেছিলাম
তরী মাইল রে লিলুয়া বাতাসে রে ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
জনম গেল কামিনী রাইয়ের কুলেরে ॥

শফিকুন্নুর

২৫

দাও মোরে হৃদয়ে শক্তি
গাইতে গুণগান
অনন্ত অসীম প্রভু তুমি দয়াবান ॥

জীবনতরী ভাসাইলাম
তোমার নামটি লইয়া
কৃপাগুণে দিও আমায়
কিনারা লাগাইয়া
আছি তোমার পন্থ চাইয়া
হইও মেহেরবান ॥

খেলিছ এ বিশ্বলয়ে
বহুরূপী সেজে
তুমি তো লুকিয়ে আছো
মানুষেরই মাঝে
তবু কেন পাই না খুঁজে
তোমারই সন্ধান ॥
কাছে যদি থাকো দয়াল
ভয় কি আর অন্তরে
কৃপাগুণে তরী আমার
লাগিবে কিনারে
কেন্দে কয় শফিকুন্নুরে
ঘুচাইও নিদান ॥

২৬

আর কতদিন থাকবে বলো
ওরে পাগল মন আমার
গোণার দিন ফুরাইয়া গেলো
চোখে দেখবে অন্ধকার ॥

যেদিন পাখি যাবে উড়ে
শূন্য পিঞ্জর রবে পড়ে

ডাকলে পাখি চায় না ফিরে
দয়ামায়া নাইরে তার ॥

মন তুমি হও হুশিয়ার
পাখি ধরার করো যোগাড়
নিরলে বসিয়া একবার
কথা কও সঙ্গে তাহার ॥

পাখি ধরার সন্ধান আছে
যাও চলে মুর্শিদের কাছে
নইলে বিপদ আসবে পাছে
শফিকুন্নুর হও হুশিয়ার ॥

আরকুম শাহ

২৭

মনমাঝি তোর সঙ্গে চোরা, না দেয় ধরা, খাকের নৌকায় রং বেপারি
মনমাঝি তোর নৌকায় সোনা, চোরের জানা, ফিরে চুরায় গিরদয়াই চড়ি
হুশিয়ার কর তোর পরিওল ভাইরে জাগিয়া রহিত ঘড়ি ॥

মনমাঝি তোর মাঝি দাড়ি, নৌকায় চড়ি, বইছে আপনার কাজ
ওরে বিকিকিনি লাভ লুছকানি নাই তারার সেই গরজ ॥

মনমাঝি তুই বনিজ দেশে, থাকিও হুসে, চোরা দোষী তোমার জন্য
সে কলঙ্কী হইছে, বেসাত গেছে, সেই কথা ভুলিও না মনে ॥

মনমাঝি তোর মহাজন, দিছে ধন, আছে সব খাতায় ধরা
পাগল আরকুম বলে দেশে গেলে শেষকালে যাইবায় মারা ॥

২৮

উদ্ধারিয়া লও প্রাণনাথ, ঠেকিয়াছি বিষম দায়
ঘোর বাতাসে অকুল নদীতে নাও ধরা না যায় ॥

মহাজনের বেসাত ভরা পাল নাই গেরাবি ছাড়া
পাতালের ফানুস টুঠা ভাঙা দাড় কুড়া
ওরে, আগা পিছা মারে ঢেউয়ে মুই অভাগীর কি উপায় ॥

প্রেমের বেপারি যারা, দিবানিশি বাইছে তারা
ওকি বাদাম তুলিয়া দিছে পালবাড়ির দারায়
ওরে, বাতাস ধরিয়াছে পালে মুর্শিদের উছিল্লায় ॥

মাঝি আমার বুদ্ধি হারা, না জানে বেপারের ধারা
খরিদ বিকির ভাও জানে না জিতা মরা
ওরে, নায়ে বসি মহাজনের পুঞ্জি খাইলে সমুদয় ॥

পাগল আরকুমে বলে, প্রেম নদীর জল উজান চলে
বাইছে যারা গেছে তারা নদীর সেকুলে
ওরে, রংপুরের বাজারে তার খরিদ বিকি হয় সদায় ॥

আবদুর রহমান

২৯

বর্তমানে ভালো নয় মানুষের মন
মানবতা হারাইয়া
পাগল হয়ে খোঁজে ধন ॥

ছেড়ে দিয়া গলাগলি
ভাইয়ে ভাইয়ে দলাদলি
স্বার্থ নিয়া ঠেলাঠেলি
ভালোবাসা বিসর্জন ॥

জ্ঞান একটু ভালো হলে
মিশে যায় বাটপারের দলে
খুব কলকৌশলে চলে
বুঝা যায় সাধু একজন ॥

নিজের বালো নিজে বুঝে
অন্যের ভালো নাহি খোঁজে
বলতে গেলে মরি লাজে
মন্দ বলবে অনেকজন ॥

রহমান বলে হলেম স্বাধীন
আজো রইলাম পরাধীন
দূর হলো না দুর্গতির দিন
চলছে আবার আগ্রাসন ॥

৩০

হাতের কাছে শোষক আছে
এদের করতে হবে দমন
শোষিতের দল হওরে সবল
সইবে কত আর জ্বালাতন ॥
শোষিত বঞ্চিত যারা
সাবধান হয়ে যাবে তোরা
তোদের হাতে পড়বে ধরা
শোষকেরা রয় যতজন ॥
শোষক স্বর্গসুখে থাকে
মোদের নাহি রাখে
ডাকিয়া নেয় ফাঁকে ফাঁকে
স্বার্থ হবে যখন ॥

আবদুর রহমান বলে এবার
ফাঁকা ডাকে ভুলিস না আর
সুদখোর ঘুষখোর মজুতদার
কেউ আমাদের নয়রে আপন ॥

জানেল

৩১

সমাজি সব কয় আপোষে 'জানেল' কোন্ তরিকে রয়।
জ্ঞানীগণের বিধান পথে, দেখি মানুষ জগৎময় ॥
সুন্নী লোকে তরিক মানে, শিয়া লোকে বল কি জানে
লা মোজাহাব কোন্ তরিকে, কাদিয়ানির মতে কি লয় ॥
রামের ভক্তি স্বর্গ পাবে, কৃষ্ণ ভক্ত কোথায় যাবে
দুইজন যদি স্বর্গে যাবে, এখন কেন বিবাদ হয় ॥
বিধান পথের নাইকো শেষ, লীলা পথের লীলা অশেষ
যে তরিকে কাঁটা নাই রে, চল ঐ পথে সদায় ॥

পাঞ্জু শাহ্

৩২

শোনরে মন রসনা যদি কর প্রেমের বাসনা
ভক্তি মূল্যে না কিনিলে, অমূল্য প্রেম পাবে না ॥
সাধু শাস্ত্রে গেল জানা, প্রেম প্রাপ্তির উপায় ভক্তি
ভক্তি চেনা গেলা না,
কিরূপ ভক্তি কি আকৃতি, জানলে হয় উপাসনা ॥
শুনি ভক্তি এই পদার্থ, অহং না থাকিলে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড শুনিত,
কি জন্য অহং আশ্চর্য করে তার প্রবঞ্চনা।
ভক্তি কোথায় হয় উৎপত্তি, ঊর্ধ্ব কি হয় অধঃগতি
কোথায় বারামখানা।
ভক্তি সৃষ্টিকর্তা যেজন, সেবা হয় কেমন জনা ॥
ভক্তি চিনে কর সাধ্য ভক্তি দেশে সাঁই এসে, প্রেমের সে হয় বাধ্য,
হীরু চাঁদ কয় অধীন পাঞ্জু, মানব দেহে দেখ না ॥

৩৩

জাতির বড়াই কি ইহকাল জাতি করে কি,
আমার মনে বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জাতের মুখি।
এক জাতের বোঝা লয়ে, চিরকাল কাটালাম মানী মানুষ হয়ে,

মানের গৌরব কুলের গৌরব, ধন্ধবাজী সব দেখি ॥
লোকে পেটের দায়ে দেশান্তরী হয়, হিন্দু-মুসলমানের বোঝা
মাথায় করে রয়,
কার বা জাতি কেবা দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কি
জেতে অন্ন নাহি দিবে, রোগে না ছাড়িবে,
পাপ করিলে কোম্পানি সব জাত ধরে লয়ে যাবে,
মৃত্যু হলে যাবে চলে, জাতির উপায় হবে কি ॥
মন ডাক আল্লাহ্, কুলের গৌরব ফেলে,
অকুলের কূল মালেক আলস্নাহ বলে, তাইরি লেহ চিনে,
পাঞ্জু ত বলে যত করলাম সকলি ফাঁকি জুকি ॥

কুবির

৩৪

ঐ ঘাটে মানুষ ডুবে ভেসে যাচ্ছে রে।
কত সাধু মহাজন যাচ্ছে মারা, ত্রিপিনীর ক্রিরোধারে।
মদন রাজার ঘাট ভাল নয়, খেওয়া দিচ্ছে দিন দয়াময় ॥
গুরু এসে পার করে নেয়, মুর্শিদ এসে হাইল ধরে ॥
সেই ঘাটে লোনা পানি, কুমীরের কানাকানি
ডেঙ্গায় মানুষ খায় ধরে ॥
বালুচরে কুম্ভীরের ঘিস, সমজায়ে দেখলে হয় পথের উদ্দিশ।
সেই কুম্ভীরের দাঁতেতে বিষ, কামড়ালে যাবি মরে ॥
চরণ ধরে কুবির বলে যাবি আজ ঘাটের কুলে,
দাড়ি মালস্না ছেড়ে, প্রাণ হারাবি সরোবরে ॥

নিতাই

৩৫

মানুষ গুরু মানুষই শিষ্য দৃশ্য হয় সুখেতে ॥
মানুষ পিতা মানুষ মাতা, মানুষ ভগ্নি মানুষ ভ্রাত
পুত্র মিত্র দ্বারা সুত, গাঁথা প্রেম সূত্রেতে ॥
মানুষই মানুষকে মারে, মানুষে মানুষকে ধরে,

মানুষে মানুষ সারে, সারে অসারেতে ॥
মানুষ ডোবে মানুষ ভাসে, মানুষ কাঁদে মানুষ হাসে
মানুষ যায় মানুষ আসে, কেবল কর্ম প্রকাশিতে ॥
যদি মানুষ হতে খোঁজ, তবে মানুষ মানুষ ভজ
নিতাই বলে নিত্য পূজা, এই মানুষের চরণেতে ॥

জালাল চাঁদ

৩৬

খোদা নাইক কোনখানে
জনম ভরে দেখলাম খুঁজে পাইনে কিছু মানুষ বিনে।
মক্কা আর মদিনাতে আজমীর আর বোগদাদে
সেখানে নাইক খোদা দেখেছি জেনে শুনে
কত লোক তার গিয়াছিল জিয়ারত কারণে
কত আল্লার শিরনী তৈয়ার হল খায়না মানুষ বিনে।
শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবনে নবদ্বীপ আর কাশীধামে
সেখানে নাইক খোদায় শুধু মানুষ বিনে
নবদ্বীপ এক ভোগ সাজালে মুক্তি খোদায় জেনে
তার কত প্রসাদ তৈয়ার হল খায়না দেখ মানুষ বিনে।
অধীন জালাল চাঁদ বলে, দেখনা মন দলিল খুলে
খালাকা আদম ছরাত লিখেছে কোরানে
মানুষ রূপে আলম্নার বারাম, আলমে তা জানে
তারা নিজের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সত্য কথা বলবে কেনে

মনসুর

৩৭

আমি তো আসল বিলাতি, আমি নয় কোন অন্য জাতি।
বিলাত সেই গঞ্জজাতে, ছিলাম আমি জাতে জাতে
আসি আহাদত সেফাতে ভুলি এস্কে মাতি।
সুমিষ্ট নিয়ামত খেতে, বিলাত হতে আসি ভারতে।
আসি সুয়েজ খালের পথে, আফগানে করে স্থিতি।

পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর, সেথায় এসে সে শহর
ফলে ফুলে শোভে শহর, করেছিলাম তাই বসতি।
লাহোর হতে আসি বোম্বাইতে, ভরপুর দেখি কলকারখানাতে
রইলাম দালানে নীচের তলাতে, মনের তলায় হয় না শান্তি
বোম্বাই হতে আসি দিল্লীতে, বাদশাহর জোমা মস্‌জিদের উপর কোটাতে।
ঝাড় লণ্ঠন কত বাহার দেখতে, জ্বলছে আলো দিবারাতি
তিথি যোগে কর্ম ফাঁসে, দিল্লী হতে জোয়ারে ভেসে,
ধাক্কায় ধাক্কায় মাসে মাসে কলকাতা এসে হই নব কান্তি
তথা হতে এসে ঢাকায় পেলাম এই রাজ্য পাট,
এই দেহ ভারতে হয়েছি লাট,
মনসুর কয়, 'ঝড় ঝঞ্ঝাট প্রজা শাসনের পান্তি ॥'

৩৮

আমি কে চিন্‌বি যদি, জ্বাল ঘরে জ্ঞানের বাতি।
ঘরে আলো হবে আঁধার যাবে, দেখবি স্পষ্ট স্বরূপ জ্যোতি ॥
ব্যঞ্জনবর্ণ দেহের মাঝে, স্বরবর্ণ কে বিরাজে।
একই পরমাত্মা এই যে এই দেহে স্থিতি
আমি ভিন্ন নাই আর অন্য, আমি ভিন্ন নাই রে গতি।
ভেবে দেখ সোহং সত্য, মাঝেতে অহংও সত্য।
জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ জ্ঞানে ব্রহ্ম প্রাপ্তি ॥
সহস্র দলের 'পর পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর।
স্বয়ং আমি আমার, হের কেন অন্যমতি ॥
মনসুর কয়, 'আদ্য চন্দ্র-বিন্দু আমি যুক্ত রই দিবারাতি।'

শিতালং শাহ

৩৯

অজ্ঞান মন, খুয়াইলায় মহাজনের ধন
এবে কি লইয়া গমন ?
মনারে, আনিলায় মানিকের ভরা বেপারের কারণ
ভবের বাজারে আসি খুয়াইলায় ধন।
হাউছ, হিরছ, শুভ, লোভ ডাকাইত চারিজন
হুসাই, বুধাই, পারাদারে, করিয়া নিধন।

মনারে, চারি ডাকাইত মিলি করিল লুণ্ঠন
রাজপন্থে বসি এবে জুড়িছ কান্দন।
পানা কর মাবুদ আলম্না, ঠেকছি বিপাকে এখন
কলিমার সাথে যেন হয় মোর মরণ।
শিতালং ফকির কান্দে ভাবি নিরঞ্জন
ছিরাত সংকটে পানা কর জানি অবোধ জন ॥

৪০

অপূর্ব কাহিনী মদিনা সুবর্ণের কারখানা
সুবর্ণে জড়িত পুরী সুবর্ণের অংগিনা।
মদিনার নিবাসী লোক পুরুষ কি জাননা
স্থানে স্থানে আরম্ভিল ইলম্নালম্নাহু জপনা।
মিথ্যুকে না আছে লোক নিবাসিত মদিনা
কুকর্মেতে মতি নাই সত্যকর্মে ভাবনা।
পাছান পাছেতে কেহ করিতেছে সাধনা।
তছবি তামিদ নামে সদায়েতে ভাবনা
তাহলিল তাকরিয়ে হয় প্রেমভাবে দেওয়ানা।
শিতালং ফকিরে কয় না পুরিল কল্পনা
রওজা মোবারক মোর জিয়ারত হইল না ॥

মহিন শাহ্

৪১

গৌর এলো ছেঁউড়িয়াতে লালন-অবতার ॥
এলো মহা-ভাবের ভাব লইয়া ভাবে ভাবে সব একাকার
মানুষ-রূপে পাক মালেক সাঁই
নাইকো কোন জেতের বালাই
মানুষ ভজবি মানুষ হবি
মানুষ-গুরু নিষ্ঠা হয় যার ॥

সুখ-বসন্ত মধুমাসে
রসের মানুষ রসে ভাসে
রস-আস্বাদন করবি যে জন
কুল-কলঙ্কের বড়াই ছাড় ॥

মূল ছাড়িয়া স্থূলের বিচার
মন তোমার এ কেমন ব্যাভার
মঙ্গল শাহ্ কয় তাই নাহি নয়
সহজ সুভাব মহিন তোমার ॥

৪২

দেল-দরিয়ায় ভাসে রসের তরী ॥
তরীর কেবা চড়নদার
কেবা হয় কাণ্ডার
সাধুর দ্বারে জানিতে তাই বাঞ্ছা করি ॥
গয়া, গঙ্গা, মধুর বৃন্দাবন
তিন ঘাটে পাহারা তিনজন
চড়ে মন-পবনের নায়, কেবা ঘাটে ঘাটে নেয়
সদা বসে এই ভাবনা ভেবে মরি ॥

উলহিয়াত, রবুবিয়াত, আবুদিয়াতে
ত্রিভুবন এলাম ঘুরিয়া কে ছিল সাথে
যবে ছিলাম অচেতন, এসে কে করে চেতন
অন্ধকারে আলো দিল সে কোন্ নূরী ॥

যদি হ'ত এ ভেদ নিরূপণ
গুরু-অন্ত হইত মোর মন
নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব জেনে, মজিয়া চরণে
মধুরে করিত মহিন দাসীগিরি ॥

খোদা বকশ শাহ

৪৩

মানুষ ভজন করবো বলে মনেতে করি বাসনা ॥
বনফুলে পুঁজি মানুষ, মনফুল তো ফুটিল না ॥
মানব-লীলা সব লীলার সার শুনেছি তাই শ্রবণে,
কিরূপে ভজিবো মানুষ তাহার সন্ধান জানিনে,

সেবা কিংবা ভক্তি দিলে
তাই কি মানুষ-ভজা বলে,
চন্দন প্রদীপ আর বনফুলে কিসে হয় মানুষের ভজনা ॥
মানুষে মনহুঁশ কামনা করি বল কেমনে,
ফুল তুলিতে বেলা গেল, মালা গাঁথবো কখনে
মম মনসুতা নাইকো ভাল
কেমনে মালা গাঁথবো বল,
গাঁথতে গাঁথতে গেল কণ্ঠে পরাব কখন ॥
ত্রিলোকের মনহরা রূপ নরবপু তাহার স্বরূপ,
পুঁজিলে কি মেলে মানুষ, গঙ্গাজল তুলসী দিলে ধূপ,
উচ্চ করে আসন দিলে
তাই কি মানুষ-ভজা বলে,
শুকচাঁদ সাঁই মোর কিসে মেলে দীন বকশর সদা এই ভাবনা ॥

৪৪

জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি কি নিবা সঙ্গে করে ॥
সাদা কিবা কালো বরণ, জাত দেখছো কি এক নজরে ॥
হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি এই জেনেছে জাতির জান,
লম্বা কি সে গোল আকৃতি কি করেছ তার প্রমাণ,
অদৃশ্য যা যায় না দেখা,
কিসে হয় তার লেখাজোখা,
জাত-জুয়াড়ি খেলছে যারা কি প্রমাণ করিল তারে ॥
জগন্নাথে দেখ যেয়ে জাতির আছে কি বিচার,
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, চামার-মুচি সবে দেখি একাকার,
চণ্ডালের অন্ন ব্রাহ্মণ খেল
তাইরি প্রভু দেখা দিল,
শাস্ত্রমতে শোনা গেল জাতি থাকে কি প্রকারে ॥
মক্কা-মন্দির গির্জা ঘরে জাতির আছে কি প্রমাণ,
আরফাতের মাঠে জাত বলে কে কারে শুধান,
ঐশী প্রেমে হয়ে মত্ত,
সবে ভাবে একাত্ম,
ছোট মনের কাজ নয়তো জাত-অজাত যে সঙ্গ করে ॥
আসবার সময় কি জাত ছিলে কি জাত হবা মলে,
ছেঁউড়িয়ার সাঁই দরবেশ লালন এই কথা পদে বলে,

খোদা বকশ বলে আমার নাই জাত,
দরবেশ শুকচাঁদ শাহ দেখিয়েছে পথ,
নাইকো মোটে বাদ-বিসম্বাদ আছি পবনকে একসঙ্গে করে ॥

রকীব শাহ

৪৫

আপনা ছাড়া নাইরে কিছু দুঃখে-সুখে আপনা
সই দেখনা।
আপনার লাগিয়া কেনো হওনা দেওয়ান ॥
আপনারি ঘরে আছে মাবুদ নিরঞ্জন আর
পাক-পাঞ্জাতন হায়
আপনারে না চিনিলে দোয়া কবুল হইবে না ॥
কুরআন হাদিসে আছে, মুর্শিদের খেদমত
কর পাইবায় রহমত—
হাশরেতে নফসি নফসি কেউ কারো সঙ্গী হইবে না ॥
হাশরের ময়দানে জান, ভাই বন্ধু বাপ
কান্দি হইবে বেতার হায়
নিজের কান্দনে সবাই কারুর দিকে চাইবে না ॥
শাহা আবদুর রকীব বলে যত ঈমানদার শুন
নিবেদন আমার হায়
মারিফত বন্দেগি করো চাও যদি ভাই রাব্বানা ॥

৪৬

না দেখিলে উনাদুনা দেখলে জ্বলে তিন দুনা,
অন্তরে বাহিরে জ্বলে সহিতে পারিনা ॥

প্রেমের বাতাস আসি লাগিয়া মোর গায়
সোনার অঙ্গখানি ছায়
হেলিয়া ঢুলিয়া পড়ি পোড়া চরণ চলেনা ॥
বন্ধুয়ার রূপখানি, নুরানি আয়না
দেখলে প্রাণে সহেনা
সোনা বন্ধুর মধুর বচন শুনলে জ্বলে তিন দুনা ॥

প্রেম করিয়া বন্ধুর সহিত, নামিয়াছি জলে
শাহা আবদুর রকীব বলে শুনিও না কেউ
লাগছে প্রেমের ঢেউ
ঢেউয়ের তালে তালে চলবো আমি কারো কথা শুনব না

মোকসেদ আলী সাঁই

৪৭

নূর অংশ মোর এই দেহেতে
কোন খানে আছে
শুনি নূরেতে নূর মিশাইয়া

দেশের সকল অঙ্গ আমার
আপন আপন নামে প্রচার
নূর নামে কোন বস্তু গো তার
কোথায় মিশেছে ॥

কেউ বলে নূর দীপ্তকারময়
দীপ্ত হয়েই সর্ব্বদা রয়
নূরেতেই নূরের আশ্রয়
আমার আঁধার যায় কিসে ॥

এইবার যদি নূর না চিনি
জন্ম মৃত্যু কেবল হয়রানি
বল মুর্শিদ গুণমণি
মকছেদের ঘোর যাক ঘুঁচে ॥

৪৮

ভজন পুজন সাধ্য সাধন
যার যেমন মন তেমনি হয়
ঘরে পায় কেউ দূরের খবর
কেউ বা দেশ বিদেশে ধায় ॥

গুরু দ্বারে জানলিনে মন
কিসে হবে ভজন সাধন
অচেনা আন্দাজী জাজন
পৌঁছেনাক ঠিকানায় ॥

সত্য প্রেমিক যে জনা হয়
পথের সন্ধান ঠিক জেনে নেয়
ভিয়ান যোগে পাক সে নামায়
হারায় না ধন খানা ডোবায় ॥

কেউ বলে ভাই অটল ভাল
ত্যাজেছে কেউ টলাটল
যোগান্তরে সব বিফল
ার শুধু কলঙ্ক রয় ॥

পাগলা কানাই

৪৯

দু'হাত তুলে দয়া মাগে
পাগলা কানাই মিস্‌কিনে
দেরে মুর্শিদ দেখা দে একবার ॥

তোরি দেখা পাবার তরে
অধম পাগল কেন্দে মরে
কত যে পাপ করছে কানাই
নাহি কো তাহার সমান ॥

আমার আমার কইরা সদাই
ফতুর হইছে পাগলা কানাই
এখন সব খোয়াইয়া চারিদিকে
দেখি যে ঘোর অন্ধকার ॥

কসম লাগি হে দরদী
তোরি দেখা না পাই যদি
এ ছাড় জীবন পাগলা কানাই
রাখবে না কিছুতে আর ॥

৫০

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ
সকলেরি এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয়
এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায়।
কারো গায়ে শালের কোর্তা কারো গায়ে ছিট
দুই ভাইরে দেখতে ফিট্।
কেবল জবানীতে ছোট বড় বোবা বাচাল চেনা যায়
কেউ বলে দুর্গা হরি,
কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি
তবু পানি খেতে যায় এক দরিয়ায়
মালা পৈতা একজন ধরে, কেহ বা সুন্নাত করে
তবে ভাই ভাইয়ে মারামারি
করে যাচ্ছিস কেন সব গোল্লায়।

৫১

শোন ওরে পাগল মন
কেবা পর কেবা আপন
পারের জন্য ঝুরে মন
তুমি কি কারণ।

সাঁই বিনে নাই গতি
দুঃখে সুখে যে জন হয় সাথী
সকলেরই আহার জোগায় জগৎপতি
মউত কালে যাহার নামে রে
মন পাবারে মুকতি।
যে তারে না চিনে

খুঁজলে পাবি না ত্রিভুবনে
ভক্তির সাথে দেখ রে জানে প্রাণে
যে তারে চিনতে পারে
আছে তার বোখের কোনে॥

বিজয় সরকার

৫২

জাতি বলতে কি বুঝলে পণ্ডিত মশাই
দেখি জগতে এক মানব জাতি
দুই ভাগে বিভক্ত তাই ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষৈত্র বৈশ্য শুদ্র কেহ বৃহৎ কেহ ক্ষুদ্র
আবরণে ইতর ভদ্র গুন কর্ম অনুযায়ী
কেহ ওঠে বহু উচ্চে কেহ পড়ে অনেক নীচে
গুনের মাত্র জাতি আছে গুনীর কোন জাতি নাই ॥

আর্য সন্তানের জাতি ভেদ সমাজে আনিলো বিভেদ
উপনিষদ দর্শন কি বেদ জাতি ভেদের কথা নাই
জাতি ভেদ মেনে হিন্দুদল দিনের দিন গেলো রসাতল
জাতাজাতির এই যাঁতাকলে কেমনে এড়ায়ে ভাই ॥

জন্মে যতো ঘটে দুর্নাম কর্মে বাড়ে মানুষের দাম
জাবালার পুত্র সত্যকাম পিতার ঠিক ঠিকানা নাই
বলিষ্ঠ গনিতাত্মজ পরাশর চণ্ডাল রক্তজ
মেছুনির পুত্র জারজ বেদের কর্তা জ্যাস গোঁসাই ॥

হিন্দুর এই হিংসা বিদ্বেষে বিষম বিষে
জাতির জীবন বাঁচবে কী সে বসে বসে ভাবি তাই
ঠুনকো জাতি চরাচরে আজ হয় না কাল ভাঙ্গবে পরে
পাগল বিজয় বলে বিষাদ ভবে
জাতি ভেদের মুখে ছাই ॥

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার

৫৩

এই মানব জীবন ভাই
এই আছে আর—এই নাই
যেমন পদ্মপত্রে জল টলে সদাই
তেমনি দেখিতে দেখিতে নাই।
আজ গেল আমার
পরে যাবে কেহ
অনিত্য এই মানবদেহ
তবে কেন অহংকারে বল মত্ত সদাই

যদি যেতে হবে জান নিশ্চয়
তবে বৃথা কেন হারাও সময়
বিত্ত অন্তের উপায়
কর এখন সত্য আশ্রয়
সময় যা যাবার, তা গেছে চলে
আর হারাও কেন মায়ায় ভুলে
এখন কাতর হয়ে
ডাক দীন বন্ধো বলে ॥

পরান ফকির

৫৪

তুমি কোনবা দেশে রইলারে দয়াল চান
তোমায় না দেখলে বাঁচেনা আমার প্রাণ ॥
দয়াল তোমার লাগিয়া যোগিনী সাজিবো
আমি সঁইপা দিব আমার মন প্রাণ ॥

দয়াল তোমার লাগিয়া দেশে না বৈদেশে
আমি পাইতাছি পিরিতে ফাঁদ ॥

যেমন শিমুইলের বাতাসে উড়েরে
দয়াল সেই রকম উড়াইলা আমার প্রাণ

জসীমউদ্‌দীন

৫৫

ও সুজন বন্ধুরে
আমার যাবার বেলায় নয়ন জলখানি
যদি তোমার মনে না লয়
আমি না যেন জানি ॥

বন্ধুরে, আমার ব্যথার মালারে বন্ধু
বন্ধু যদি গলে লাগে
তবু তাহা নারে কইও
বন্ধু এই অভাগার আগেরে ॥

বন্ধুরে, ভালো লাগে বইলারে আমি
বন্ধু চাই যে মুখের পানে
যদিও তুমি না চাও ইহা
বন্ধু লোকে না যেন জানেরে ॥

ভবা পাগলা

৫৬

আমি মানুষ খুঁজি
আমি মানুষ খুঁজি, আমি মানুষ খুঁজি
তেমন মানুষ পেলে আমি
তার চরণে মাথা গুঁজি ॥

মানুষ আছে কোটি কোটি
তেমন মানুষ আছে ক'টি
ফুলের মত হাসি লয়ে নিত্য ওঠে ফুটি
কটিতে নাই তার মায়ার শিকল
সবার কথায় রাজি ॥

মানব কুলে জনমিয়া মানুষ হলাম না
পরিচয় ভুল হল গো, কথা শিখলাম না
হরি কথা কৃষ্ণ কথা, মুখে আসে না
মায়ার ছড়া গল্পগুজব এই হল মোর পুঁজি ॥

ভবা বহু কথা কয়
পাখির মত খাঁচায় পোষা এই তো পরিচয়
মিছরি, চিনি, লাড্ডু মণ্ডা একি খাওয়া হয় ?
ছোলা দানা, খেয়ে খেয়ে
ট্যা ট্যা শব্দ ভোজের বাজি ॥

জামাল শাহ্

৫৭

অন্ধকারে মায়া ধরে বেড়াস কেন ঘুরে ঘুরে
জীবন প্রদীপ কখন নিভে যায় ফস কইরে।

দু'দিন পরে দেখবিরে নিশ্চয়
জীবন প্রদীপ নিভে যাবে
যাবে সমুদয়
আসবে যেদিন কালের ঝটকা
আটকাবি কি প্রকারে।।
জীবন প্রদীপ নিভে যাবে ফস কইরে।

আর দু'দিন পরে দেখবিরে নিশ্চয়
জীবন প্রদীপ নিভে যাবে
যাবে সমুদয়
এখন থাকতে আলা
নিয়েই বেলা
আসল কাজ তুই নে সেরে।
জীবন প্রদীপ নিভে যাবে ফস কইরে।

ওগো সাঁই আরফাত শাহ্ কয়
জামালরে তুই
মরলি রে তুই কেবল ঘুরে ঘুরে
জীবন প্রদীপ নিভে যাবে ফস কইরে।

৫৮

গৌর কি আইন আনিলেন নদীয়ায়
এ তো জীবের সম্ভব নয়
আন্‌কা আচার আন্‌কা বিচার
দেখে শুনে লাগে ভয়॥

ধর্মাধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাইক তাতে
প্রেমের পূর্ণ গায়
জেতের বোল রাখল না সে তো
করল একাকারময়॥

শুদ্ধ অশুদ্ধ নাই জ্ঞান
সাতবার খেয়ে একবার স্নান
করে সদায়
অসাধ্যকে সাধ্য করে জীবে যা না ছোঁয় ঘৃণায়॥

যবন ছিল দবির খাস তারে প্রভু পদাস্র ফাঁস
করল গৌর রাই
লালন বলছে মমিন বংশে
জামালকে বৈরাগ্য দেয়॥

মনমোহন

৫৯

আমার মনপাখি মিশিতে চায় গিয়ে এসব পাখির দলে
এসব পাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে বেড়ায় বন-জঙ্গলে॥

কত করে করি মানা পাখির এ বাসা ছেড় না
সে আমার কথা শোনে না তার সঙ্গে পাখি না বলে॥

শিকলি কেটে ময়না টিয়া এসব পাখির দলে গিয়া
আবোল তাবোল বোল বলিয়া হারা হতে যায় সে বনে॥

আহা রে জংলা পাখি কেন আমায় দিলি ফাঁকি
মনমোহনের মনআঁখি কেমনে রাখি উল্টা করে॥

করিম শাহ

৬০

এসো ব্যথার ব্যথিত ওগো তুমি আমার সাঁই
তোমার মতো ব্যথার ব্যথি ব্রহ্মাণ্ডে কেহ নাই।
দয়ার দরদী হয়ে লুকাইলে কোন শহরে
অধম রাহা পানে চেয়ে বঞ্চিত সদাই ॥
তুমি মুছারে দয়া করিলে
নূর তাজেলা দেখাইলে।
দেখা দিয়ে লুকাইলে
এই কি তোমার দয়া হয় ॥
দীনবন্ধু জগৎ কর্তা
ভুলনা এই অধমের কথা
দরবেশ নিমাই চাঁদ মোর পরম পিতা
অধম করিম ভাবছে তাই ॥

মহেন্দ্র গোঁসাই

৬১

তোর জন্যে যে হলাম পাগলপারা সাধের একতারা ॥
তোর একতারে কি ঝংকার যানে ভাবুক যারা
তার যায় জাতিকূল তবু হয় সে বাউল
তোর সাথী হয় যারা ॥
তোর কর্ণমূলে এক কাঠের কাঠি
আঁকড়ে ধরা বাঁশ
নাভিমূলে তার ঢুকানো

নিচে লাউযের বস
ঘুরেতে বাসা বানছে পঞ্চরস
তার নিচে এক কড়ি কাঠিতে
তাতে সুর জোয়ারে ভরা ॥

উদারা মুদারা তারা
তোর একতারেতে পাই
মনের সাথে তারটি বেঁধে
সুর পঞ্চমে গাই
ভাবের বলিহারি যায়
যারা ভাব নগরে গিয়েছে ভাই
দোতারে তত্ত্ব পেল তারা ॥

একটি তারের সঙ্গে যে জন করল সম্বন্ধ
এই জীবনের মত তার মিটেছে ধন্ধ
পেয়েছে সে পরম আনন্দ
তাই দীন মহেন্দ্র জ্ঞানে অন্ধ
সে নিজেই দিশে হারা ॥

উজল শাহ

৬২

প্রেম করেছে সাঁই রব্বানা
তাদের সহজ প্রেমের নাই তুলনা।
প্রেমেতে মগ্ন সদা মহম্মদা
খোদ খোদা আশেক জন ॥

আলা নবী আদম ছবি
করলো প্রেমের দাবি এই তিন জনা।
একেতে আছে এই তিন
জেনো না ভিন।
চিহ্ন গেলে হবে ফানা ॥

যেমন কুপ জল আর গঙ্গা জলে
মিরাজ যে মিলন হলো এই দু'জনা।
এসকে ছাদেকি প্রেমে
ফাতেমাকে মা বলেছেন সাঁই রব্বানা,
যে জন প্রেমের মানুষ মহাপুরুয
দেখলে বেহুস মন রসনা।
জহরের এই মুনাযাত নফিয়েস রাত
উজল শাঁইজি ঘোর রে ঘোনা ॥

যাদুবিন্দু

৬৩

আমার কাদা মাখা সার হ'লো।
ধর্মমাছ ধরব ব'লে নামলাম জলে,
ভক্তি-জাল ছিঁড়ে গেল।

কুসঙ্গে সঙ্গ নিলাম,
কুক্ষণে জাল নামালাম,
বিল ঘুণে যদি পাই চাঁদা পুঁট
লোভ-চিলে লয়ে গেলো।।

আর মাছ ধরায়
আর ধর্ম সে সত্য সে
ধর্ম বিলে তু রসিক ভাসবি জলে
একটি জাল ফেলে
তারাই মাছ ধরল ভাল
হিংসা নিন্দা ঘুচবি দীন
এ একটি কতগুলো।

মাছ ধরায় ডাক পড়েছে
পাঁচটি ভূত নেমে গেছে

ভয়ে পাণ চমকে গেছে
আরো বাকি জন ষোল
যাদুবিন্দু চরণ ভুলে
হয়েছে এলোমেলো।

লাল মিয়া

৬৪

কোন ঘাটে পার হবে রুহু
এ দেহ ত্যাগ করার পর
কোন ঘাটে গিয়ে মারী হয়ে
করবেন পার॥
মানবদেহে কয়জন রুহু
কয়জন নেয়ে কয়জন গুরু
সেই গুরু কোন রুহু হয়ে
ভব নদী হবে পার॥
কোথায় রুহু পড়ে ছিল॥।
কোন রুহু হন ফানাফিল॥
পার জাহেরা নাম রাসুলুল॥।
বাতেনেতে শিনা তার॥
কোথায় রুহু করে স্থিতি
কোন রুহু হন পদাহুতি
লাল মিয়া কয় মায়ায় বন্দী
ভবনদী হবে পার॥

দুদ্দু শাহ

৬৫

এ দেশের মুসলমানে বড়াই করে,
আমরা বাদশাই জাতির খান্দান রে॥

সহস্র বৎসর পূর্বে ভাই
মুসলমানের গন্ধ দেখি নাই,
যত অনার্য শুদ্র ওরাই,
ধর্ম ভারত হয় রে॥
তারাই ছৈয়দ খোনকার
বলিয়া কওলয় এবার,
দুঃখে মরি রে বারবার,
দশা এদের হেরি রে॥

করে চৌকিদারী পেয়াদাগিরী
দ্বারে দ্বারে ফেরে ঘুরি,
দুদ্দু তাই তো কয় ফুকারি,
বড়াই ভাল নহে রে॥

৬৬

কার কেমন গুণ জানা যাবে আখেরে
কোথায় কে কি করে ফেরে॥

ছাইচাপা থাকে না অগ্নি,
আগুন বস্তু এমনি,
মনুষ্যত্ব সত্য তেমনি,
বের হয় স্ফুরে॥

ফলে বৃক্ষের পরিচয়
এই কথা সকলে কয়,
যে যা দেয় সেই তো পায়
এই সংসারে॥

মনে মনে মনকলা খাই,
করো না রে আত্ম বড়াই,
দুদ্দু বলে আমি তেমনই ভাই,
ঘুরে ফিরে॥

৬৭

কলি বলে কেন কলিকালকে দোষা হয়।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যত্ব উপজয়॥

সেকালে আদমগণ,
জানতো না কোথায় কোন্ জন,
তাইতে তো এতো অমিলন,
ধর্ম, শাস্ত্র, সমাজে হয়॥

কোন দেশে কাহার বাস,
কোথা ধর্ম কোথায় প্রকাশ,
এ কালে জেনে এসব,
মনুষজাতি জ্ঞানবুদ্ধি পায়॥

বেদ বাইবেল কোরান ত্রিপিটক,
গ্রন্থসাহেব কনফুসির মত,
দুদ্দু বলে জানে তো এসব,
একালের সকল জনায়॥

ফুলবাসউদ্দীন

৬৮

দেখে তোমার কাজ গুলো।
যায় নাকো সাঁই দয়াল বলা॥
তোমার দয়াল নামের এমনি গুণ, পান্তা ভাতে মেলে না নুন,
কেউ খায় মৃত মাখন, কার কন্ধে দেও ঝোলা॥
কার নাহি জোটে খেটে-খুটে, পড়ে থাকে ছেঁড়া চটে
দিবারাতি নানান কষ্টে, শোক অনলে হয় কয়লা॥
কেউ সুখ-সাগরে ডুব দিয়া রয়, কার কেঁদে কেঁদে জনম যায়
ফুলবাসউদ্দিন ভাবে সদাই, 'কার নামে জপি মালা॥'

৬৯

বর্তমানে দেখাও মুরশীদ, অনুমানে মান্‌ব কেনে,
যেমন মহাম্মদ দেখেছিল, তেমনি দেখাও দীনহীনে॥
বার লাখ তের হাজার, তিন শত পঁচিশ প্রচার।
তাহার মধ্যে কেবা অধর, আমি খুঁজে পাইনি ধ্যানে জ্ঞানে॥
আর এক মোকামেতে শুনা , নয় লাখ ফকির আনাগোনা,
কোথায় সে খাদেম রব্বানা, যার নাম জারী 'কুল-আরফিনে'
হায় পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে, আমায় দেখাও দেখি তারে,
কোন ছুরতে কি আকার ধরে, চেয়ে আছে কোন দিক পানে।
অজুদ মাঝে যা দেখালে, খোদ কুদরতে আছে মিলে।
খোদ্ মানুষকে দেখব বলে, ফুলবাস চেয়ে আছে চরণ পানে॥

নসরুদ্দীন

৭০

সাঁই আজব লীলা 'আন্‌কা ফল।'
আমি দেখে হারাই বুদ্ধি বল॥
ডিম্ব রূপে শূন্যকারে, ভেসেছিল পরওয়ারে
দিবা রাতি নাই সেখানে, কিসেতে হল উজ্জ্বল॥
কোন বাতিতে সেই জায়গায় করেছিল দীপ্তকার
নাহি ছিল আসমান জমিন, কেবল মাত্র ছিল জল॥
ডিম ভাসে জলের উপর, জল ছিল কিসের 'পর
ডিম নয় কো খোলা, ছিল তালা, ডিমের মধ্যে কোন্ বাজনা॥
ফুলবাস বলে ভাবি দেলে, কয় না খুলে এ সকল
বুদ্ধি মোটা ভক্তি চটা, নসরুদ্দীন বাধায় গোল॥

৭১

কাছে আছে সে যখন।
ভজন সাধন করব কি কারণ॥
থাকতে কাছে পড়ি পাকে, তখন আল্লা বলে কারে ডাকে
কোথায় হতে এসে তাকে, মুস্কিলে করে আসান॥

কাছে যদি থাকে আল্লা কি উদ্দেশে জপ মালা
টিপটিপি রোজ দু'বেলা, এগুলো কি মনের ভ্রম॥
গরু কি বকরী ঘোড়া কি ভেড়া
গাধা কি মানুষ যোয়ান কি বুড়া
গোল কি চেপটা কাহার আড়া, খাড়া পড়া কার মতন॥
বাতুনেতে আছে আল্লা, লাল কি গোরা কালা কি ধলা
নসরদ্দী ভাবে আল্লা, পেলাম না তোর দরশন।

৭২

দেহের কেবা মরে কে অমর।
দরবেশ হও কও দেহের খবর॥
আব-আতশ-খাক-বাতে যখন, করেছে এই দেহের পত্তন
তাহার মাঝে কোন্ মহাজন, তিন তারে নিচ্ছে খবর॥
এক বিন্দু মনি হতে, দেহের গঠন হল তাইতে
এহার দোষী মনি কোন জায়গাতে
গঠন কেমন রঙ কি তার॥
কেহ যাবে স্বর্গে চলে, কাকে কে নরকে দিলে
নসর বলে বল খুলে, করে দেও সূক্ষ্ম বিচার॥

সাব্বির আহমেদ চৌধুরী

৭৩

আকাশ আমার ঘরের ছাউনি
পৃথিবী আমার ঘর
সারা দুনিয়ার সকল মানুষ
কেউ নয় মোর পর॥

করিনা বিচার জাতি ধর্মের
কোন ভেদাভেদ ভাষা বর্ণের
সবাই মানুষ এই পরিচয়
হৃদয় নিরন্তর॥

মানব সমাজে আমি যে এক
অংশ মানবতার
আমাতে রয়েছে সকলের তরে
দয়া মায়া স্রষ্টার।
অতিপিরীত ব্যথিতের ব্যাথা
জাগায় মরমে সদা ব্যকুলতা
অপরের সুখে পাই আমি সুখ
দুঃখে কাঁদে অন্তর॥